৮

ফিচার সংকলন

উন্নয়নের নব দিগন্ত

তথ্য অধিদফতর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

উন্নয়নের নব দিগন্ত

ফিচার সংকলন-২

উন্নয়নের নব দিগন্ত

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

উন্নয়নের নব দিগন্ত
ফিচার সংকলন-২

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২২
স্বত্ব © তথ্য অধিদফতর
প্রধান সম্পাদক
মো. শাহেনুর মিয়া, প্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদক
ইয়াকুব আলী, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদনা পরিষদ
পরীক্ষিৎ চৌধুরী, সিনিয়র তথ্য অফিসার
এ এম ইমদাদুল ইসলাম, সিনিয়র তথ্য অফিসার

সম্পাদনা সহকারী
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সেলিনা আক্তার
মো. জামিন মিয়া
মো. মাহবুব সরকার
মো. রোকনুজ্জামান
মো. রেদোয়ান আল করিম

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স
মো. কামরুজ্জামান

মুদ্রণ
মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Unnoyoner Nobo Diganta, a collection of articles
Published by Press Information Department (PID), Ministry of Information and Broadcasting, Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000,
Phone : 55100811, 55100138, Email : piddhaka@gmail.com
Price : TK. 600.00

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভূমিকা

তথ্য অধিদফতর গণমাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রচারের দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রচার কাজের অংশ হিসেবে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি তথ্য অধিদফতর সংবাদপত্র ও অনলাইন গণমাধ্যমে নিয়মিতভাবে ফিচার ও আর্টিকেল প্রকাশ করে থাকে। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোনো ফিচার, আর্টিকেল বা লেখা গ্রন্থাকারে একসাথে প্রকাশনা হিসাবে না থাকলে এটি কালের আবর্তে হারিয়ে যায়। একসময় এসকল লেখা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের ভাবনা থেকেই তথ্য অধিদফতরের এ প্রয়াস। ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২২ সময়কালে অধিদফতর দেড় শতাধিক ফিচার ও আর্টিকেল প্রচার-প্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্য হতে ৪৫টি ফিচার ও আর্টিকেল বাছাই করে ***উন্নয়নের নব দিগন্ত*** শীর্ষক সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব ফিচার-আর্টিকেলের লেখকগণের অনেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

স্বাধীনতার পর নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ আমাদের বড়ো অর্জন। স্বপ্নের পদ্মা সেতুসহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) লক্ষ্যসমূহ ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর রচিত ফিচার-আর্টিকেল এবারের সংকলনে অগ্রাধিকার পেয়েছে। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের নানা দিক, মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, মানবাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জ্বালানি নিরাপত্তা, জনপ্রশাসন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, নারী ও শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রকাশিত ফিচার এবারের সংকলনে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, লেখাগুলো উপরে বর্ণিত সময়কালে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এসব বিষয় নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য সংকলনটি সহায়ক হবে। এছাড়া সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে চান এমন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের আশা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার মহোদয়ের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় আমাদের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্পাদনা পরিষদসহ সংকলনটি প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

উন্নয়নের নব দিগন্ত (জানুয়ারি ২০২২-জুন ২০২২)

স্মৃতির পাতায় শপথ দিবস ॥ ১৩
তোফায়েল আহমেদ

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প ও বাস্তবতা ॥ ২০
খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

একুশের অবদান : ঘরে-বাইরে ॥ ৩০
আহমদ রফিক

১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বনাম আটকে পড়া বাঙালি ॥ ৩৭
জাফর ওয়াজেদ

ডায়রিয়া : কারণ ও করণীয় ॥ ৫৬
ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ

পদ্মা সেতু আমাদের জাতীয় সক্ষমতার প্রতীক ॥ ৬৩
ড. আতিউর রহমান

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ ॥ ৬৯
ড. শাহনাজ আরেফিন (এনডিসি)

পদ্মা মহাসেতু : জাতীয় প্রত্যয়, শৌর্য এবং অগ্রযাত্রার সোপান ॥ ৭৩
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

কোভিড-১৯ বিশ্বমারি মোকাবিলায় টিকা ও বাংলাদেশ ॥ ৭৭
মুশতাক হোসেন

জনবান্ধব জনপ্রশাসন ॥ ৮২
মো. ফিরোজ মিয়া

যে কারণে ইতিহাসে অমর তিনি ॥ ৮৬
মুহাম্মদ শামসুল হক

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং আমাদের করণীয় ॥ ৯১
প্রকৌশলী জুলকার নাইন

ওমিক্রনে ভয় নয়, সচেতনতা জরুরি ॥ ৯৫
অধ্যাপক ডা. মো. সারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে পদ্মা সেতু ॥ ৯৮
ইয়াকুব আলী

The role of media in implementing the national integrity strategy. ॥ **১০২**
Md. Abdul Jalil

মেঘের আড়ালে সূর্যের হাসি ॥ ১০৭
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

Green Financing Boom ॥ **১১২**
A H M Masum Billah

হজের গুরুত্ব ও করণীয় ॥ ১১৫
মুফতি মাওলানা রুহুল আমিন

ডিজিটাল টাকা ওড়ে ॥ ১১৮
মোস্তাফা মাসুদ

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ॥ ১২১
ড. মাহিন খান

বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত বাংলাদেশ ॥ ১২৪
ড. আজাদ শাহরিয়ার

গুজব থেকে সচেতন হই ॥ ১২৭
ইমদাদ ইসলাম

সাম্প্রতিক ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের উপায় ॥ ১৩১
ডা. সিরাজুম মুনিরা

গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার : বিশ্বে অনন্য নজির ॥ ১৩৬
ফারিহা হোসেন

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ॥ ১৪০
লে. ক. (অব.) মহসীন আলী

বঙ্গবন্ধু এক সম্মোহনী নেতা ॥ ১৪৪
পাশা মোস্তফা কামাল

ডলফিন সংরক্ষণে সরকারের উদ্যোগের সাথে প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা ॥ ১৪৮
দীপংকর বর

সুন্দরবনের ঐতিহ্য রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য ॥ ১৫২
মোতাহার হোসেন

দারিদ্র্যমোচনে উত্তরাঞ্চলের সমতল ভূমিতে চা চাষ ॥ ১৫৫
মো. জাহাঙ্গীর আলম

আমরাই গড়ব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ॥ ১৫৯
সাঈদ হাসান

দেশে ক্যান্সার চিকিৎসায় সরকারের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ ॥ ১৬৩
মো. মাইদুল ইসলাম প্রধান

বেবি ব্লুজ ॥ ১৬৭
ডা. সুমাইয়া বিনতে ঋতু

বর্তমান সরকারের সাফল্য ॥ ১৭২
জাহিদুল ইসলাম ফারুক

পুষ্টি বৈষম্য ॥ ১৭৫
ডা. তাসনুভা আহমেদ খান

জনসংখ্যা উন্নয়নে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ ॥ ১৭৯
সেলিনা আক্তার

পরিকল্পিত ঢাকার জন্য ড্যাপ ॥ ১৮৬
রেজাউল করিম সিদ্দিকী

শ্যাডো প্যানডেমিক ॥ ১৮৮
মুনিয়া খান

ডিজিটাল সংযুক্তি ডিজিটাল বাংলাদেশ : বিনির্মাণের অন্যতম ভিত্তি ॥ ১৯২
ম. শেফায়েত হোসেন

প্লাস্টিকদূষণ : লাগাম টানার এখনই সময় ॥ ১৯৭
মোছা. সাবিহা আক্তার লাকী

অদৃশ্য সম্পদ দৃশ্যমান প্রভাব : ভূগর্ভস্থ পানি ॥ ২০২
মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

শ্রমিকের কল্যাণে একুশ বছর পেরিয়ে শ্রম অধিদপ্তর ॥ ২০৭
মো. আকতারুল ইসলাম

স্টেম (stem) শিক্ষা ২০৪১-এর রূপকল্প উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণকে গতিশীল করবে ॥ ২১২
মো. রেজুয়ান খান

ভূমি ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন ॥ ২১৬
এম জসীম উদ্দিন

মা ও শিশু মৃত্যুরোধে অভূতপূর্ব অর্জন বাংলাদেশের ॥ ২২০
তন্ময় সরকার

স্মৃতির পাতায় শপথ দিবস

তোফায়েল আহমেদ

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়েছে। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান তুলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করে আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বে মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। আর আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে মর্যাদাশালী ও উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ভালো আছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। রাষ্ট্র ক্রমেই জনকল্যাণমুখী হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্ববহ। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনে বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আর '৬৯-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সংগ্রামী ছাত্র-জনতা দেশব্যাপী তুমুল গণ-আন্দোলন সংঘটিত করে দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার 'ভোটাধিকার' অর্জন এবং সকল রাজবন্দিসহ প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারামুক্ত করে। সত্যিকার অর্থেই '৫২-এর রক্তধারা '৬৯-এর রক্তস্রোতে মিশে '৭১-এ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উন্মেষ ঘটায়। বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এ এক ঐতিহাসিক পরম্পরা।

৬৯-এর ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাকসু' কার্যালয়ে আমার সভাপতিত্বে চার ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাকসুর ভিপি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও মুখপাত্রের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। আমি যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১০ জন ছাত্রনেতার–ছাত্রলীগ সভাপতি প্রয়াত আব্দুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী; ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) সভাপতি প্রয়াত সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা; ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সাধারণ

সম্পাদক মাহবুবউল্লাহ এবং এনএসএফের একাংশের সভাপতি প্রয়াত ইব্রাহিম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মুন্সী; ডাকসু ভিপি হিসেবে আমি (তোফায়েল আহমেদ) ও জিএস নাজিম কামরান চৌধুরীর উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ছয় দফাকে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনসমেত ১১ দফার ৩ নম্বর দফায় অন্তর্ভুক্ত করে ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয়। বাস্তবত ১১ দফা ছিল ছয় দফারই সম্প্রসারিত রূপ। যাতে ধাবিত ছিল বাংলার মানুষের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

ঊনসত্তরের ২৪ জানুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা ১১ দফার প্রতি ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীসহ বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলাম। এরই প্রতিফলন দেখতে পাই আমাদের ঘোষণার স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবায়নে। আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম, গুলিস্তানে–এখন যেখানে মহানগর নাট্যমঞ্চ তার পাশের পার্কটির নাম হবে শহিদ মতিউরের নামে, 'মতিউর পার্ক'; যেটি ছিল আইয়ুব গেট, সেটির নামকরণ শহিদ আসাদের নামে, 'আসাদ গেট'; আর দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে ঘোষিত আইয়ুবনগরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, বাংলার কৃষক দরদি নেতা শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজুলল হকের নামে, 'শেরেবাংলা নগর'। মুক্তিকামী বিক্ষুব্ধ জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নামগুলো পাল্টে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। পরম শ্রদ্ধাভরে ওই স্থানগুলোতে শহিদদের নামে নামাংকিত ফলক স্থাপন করা হয়। ২৪ জানুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের সর্বত্র গণবিক্ষোভ এমন ছিল যে, স্বৈরশাসক ভীত হয়ে ২৫, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখে। ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র গণবিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান বেতার ভাষণে রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারাগারে রেখে এবং ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হবে না পরিষ্কার জানিয়ে আমরা আইয়ুব খানের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করি। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশরক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১১ দফা দাবির ২ নম্বর দফাটি ছিল, 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টনসহ' 'প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।' এই দাবির একাংশ মেনে নিয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক-

এর ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের ওপর আরোপিত বাজেয়াপ্ত আদেশ এবং দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। '৬৯-এর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে এলএফও (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) জারি করে 'প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার' প্রদান ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে শহিদ আসাদ-মতিউর-মকবুল-রুস্তম-আলমগীর-সার্জেন্ট জহুরুল হক-ড. শামসুজ্জোহাসহ সকল শহিদের রক্তের শপথ নিয়ে বলেছিলাম, 'এই রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না।' শহিদের আত্মদান বৃথা যায়নি। পরবর্তী ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। তাঁদের আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতায় আন্দোলন আরও বেগবান হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন এবং এদিনেই গণ-আন্দোলন ১ দফায় রূপান্তরিত হয়। এদিন পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে 'শপথ দিবস' পালিত হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১০ জন ছাত্রনেতা লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে 'জীবনের বিনিময়ে ১১ দফা দাবি আদায়ের শপথ গ্রহণ' করেন। জনসভা তো নয় যেন বিশাল জনসমুদ্র! চারদিক কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তিলধারণের ঠাঁই নেই। সেদিনের সুবিশাল ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান সংগ্রামী জনতাকে ধারণ করতে পারেনি। কাজ বন্ধ রেখে দাবি আদায়ে কারখানার শ্রমিক, মেহনতি কৃষক, নৌকার মাঝি, জেলে, কামার, কুমার ও তাঁতি, ছাত্র, অফিসের কেরানি, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী–সকলেই জনসভায় ছুটে এসেছে প্রাণের টানে। মানুষ ঠাঁই নিয়েছে স্টেডিয়ামের দোতলা-তিনতলার বারান্দায়, কার্নিশে। যে যেখানে পেরেছে স্থান করে নিয়েছে। গণতরঙ্গে উত্তাল বিশাল সেই জনসভায় আগত জনসাধারণ ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাদের মুখে ছিল স্বাধিকারের দৃপ্ত স্লোগান, আর চোখ-মুখ ছিল দুর্জয় সংকল্পে অটল। সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যপট এখনো আমার স্মৃতিতে অম্লান। দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যার উল্লেখ করে, ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবি ব্যাখ্যা করে, ছাত্রদের রাজনীতি করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে, আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক প্রশ্নে ছাত্রসমাজের অভিমত ব্যাখ্যা করে ১০ জন ছাত্রনেতার প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, 'অবিলম্বে আইয়ুব খানের পদত্যাগ, বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল, রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে 'এক মাথা এক ভোট' দাবি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে গণপরিষদ গঠন।' সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক এবং সভার সভাপতি হিসেবে পিনপতন নীরবতার মধ্যে একটানা ৪৫ মিনিট বক্তৃতা করি। সেদিনের বক্তৃতায় "প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য ছাত্র-জনতার

কতিপয় দাবি আদায়ে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের আহ্বান জানাই। ছাত্র-জনতার সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের পত্রিকা 'ইত্তেফাক'কে আমরা ছিনিয়ে এনেছি। দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগ বন্ধ করেছি। মোজাফফর, আলতাফ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারাগার হতে মুক্ত করেছি। অপরাপর রাজবন্দিদেরও আমরা মুক্ত করব। এ দেশের যে প্রিয় নেতা জন্মের পর হতে বাংলার মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন, সেই শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ছাত্র-জনতার দাবি যদি পূরণ না করা হয়, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির যদি মুক্তি দেওয়া না হয়, তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। সমগ্র পাকিস্তানে জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন বাঙালি। অতএব আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। স্বৈরশাসক আইয়ুব খান রচিত 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার' গ্রন্থটি বাংলার কোনো ঘরে যেন না থাকে। রাজনীতির অর্থ যদি হয় শ্রমিক-কৃষকের অধিকার নস্যাৎ করা, জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করা, ছাত্রসমাজ সেই রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাজনীতির অর্থ যদি হয়, দেশের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নতুন সমাজ গঠন করা–ছাত্রসমাজ সেই রাজনীতি অবশ্যই করবে। ছাত্রদের ১১ দফা এই দৃষ্টিতেই প্রণীত হয়েছে এবং এই ১১ দফা কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তির সনদ। আমরা শিল্পপতি-জমিদারের ছেলে নই, আমরা কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তের সন্তান। আমাদের মাতাপিতার যদি অধিক ট্যাক্স দিতে হয়, তাঁরা যদি পাটের ন্যায্য মূল্য না পান তাহলে আমাদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাত্রদের পড়াশোনার সাথে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিচ্ছিন্ন নয়। পূর্ব বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। পিতার কল্যাণের রাজনীতিই তাদের ধর্ম। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনে বিষ ছড়ানোর জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানো হচ্ছে। মিল মালিকদের হুঁশিয়ার করে বলছি, নিজেদের ভাগ্য গড়ার সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই তাঁরা যেন শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা করেন। যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা আর নিজেদের ফরিয়াদ জানাতে ছাত্রদের কাছে ধর্ণা দিতে বাধ্য না হন। অন্যথায় দেশের ছাত্রসমাজ তাঁদের ক্ষমা করবে না।" বক্তৃতার শেষে সমবেত জনতার তুমুল গর্জনের সাথে বজ্রকণ্ঠে স্লোগান তুলি–'শপথ নিলাম শপথ নিলাম মুজিব তোমায় মুক্ত করব; শপথ নিলাম শপথ নিলাম মাগো তোমায় মুক্ত করব।' ভাবতে আজ কত ভালো লাগে ঐতিহাসিক শপথ দিবসের এই স্লোগানের দুটি লক্ষ্যই সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি। সোনার বাংলার ৩৯ জন সোনার সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে '৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করে, '৭০-এর ঐতিহাসিক

নির্বাচনে ছয় দফা ও ১১ দফার পক্ষে গণরায় নিয়ে, ’৭১-এর মহত্তর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষাধিক মানুষের সুমহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃ ভূমিকে হানাদারমুক্ত করে সেদিনের সেই শপথবাক্য আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছি। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘ডাক’-এর (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি) আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালন ও পল্টনের জনসভায় জনতার দাবির মুখে প্রিয় নেতার ছবি বুকে ঝুলিয়ে বক্তৃতা করি। সেদিনের জনসভায় সংগ্রামী জনতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আপনারা কি প্রিয় নেতা শেখ মুজিব ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক চান আপনারা কি প্রিয় নেতা শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি চান’ জনতা সমস্বরে বলেছিল, ‘না, চাই না।’ তখন বঙ্গবন্ধুর প্যারোলে মুক্তির কথা প্রচার করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি সর্বব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণ-আন্দোলন সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করে ৯ ফেব্রুয়ারি এক মোহনায় শামিল করেছিল। সেদিন পল্টনের জনসভা শেষে সংগ্রামী ছাত্র-জনতার বিক্ষুব্ধ মিছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানে যাই এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাকে শান্ত করে ইকবাল হলে (বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ফিরিয়ে আনি। স্বৈরশাসকের শত উসকানি সত্ত্বেও আমরা নৈরাজ্যের পথে যাইনি। নিয়মতান্ত্রিকভাবেই আন্দোলন করেছি। নিজেদের মধ্যে মত ও পথের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেদিন ১১ দফা দাবি আদায়ের প্রশ্নে ছিলাম ঐক্যবদ্ধ। দলীয় আদর্শ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকলেও আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক ছিল চমৎকার। এক টেবিলে বসেই আহার করতাম। বিপদে-আপদে একে অপরের খবর নিতাম এবং হৃদ্যতাপূর্ণ এই সম্পর্কই ছিল আমাদের আন্দোলনের ভিত্তি। ’৬৯-এর গণ-আন্দোলনে আমাদের সংগ্রামী ভূমিকা, কর্মসূচি পালনে নিষ্ঠা, সততা ও জনদরদি আবেদন মানুষের হৃদয়ে এতটাই সাড়া জাগিয়েছিল যে বাংলার মানুষ আমাদের মাথায় তুলে নিয়েছিল। ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জ্বল সোনালি দিনগুলোর দিকে যখন ফিরে তাকাই, তখন ফেলে আসা সংগ্রামী দিনগুলোর জ্যোর্তিময় বৈপ্লবিক বহিঃপ্রকাশ অনন্যসাধারণ মনে হয়!

আজ সেই সোনালি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় কী করে এটা সম্ভব হলো? তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বিচার চলছে। ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য’ অর্থাৎ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলে যে মামলাকে অভিহিত

করা হয়েছিল, সেই মামলার বিচার চলছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন ফাঁসির মঞ্চে। আমরা জাগ্রত ছাত্রসমাজ শুধু ঐক্যবদ্ধ হইনি, গোটা জাতিকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা যখন পল্টনে মিটিং করি, তখন সচিবালয়ের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিস বন্ধ করে এই পল্টনের জনসভায় ছুটে আসতেন। সেদিনের জনসভাগুলো শুধু পল্টন ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকত না, আশপাশের এলাকাসহ সমগ্র মতিঝিল, শাপলা চত্বর থাকত কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই দিনগুলোতে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা সর্বব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিলাম; শপথ দিবসের সেই জনসমুদ্রে লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে মরণপণ শপথ নিয়েছিলাম; ১৪ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে রাজনৈতিক দলসমূহের জোট 'ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি' তথা 'ডাক'-এর মানুষ নুরুল আমিনকে প্রত্যাখ্যান করে মঞ্চে আমাদেরকে তুলে নিলে যে বক্তৃতা আমরা করেছিলাম, যে ম্যান্ডেট আমরা নিয়েছিলাম, সেই ম্যান্ডেট আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছি। সেদিন ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে রাত্রিবেলা সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করে আবার কারফিউ জারি করা হয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে–যিনি নিজের বুক পেতে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার ছাত্রদের গুলি করার আগে আমার বুকে গুলি চালাতে হবে', তখনই তাঁর বুকে প্রথমে গুলি পরে বেয়নেট চালিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যার প্রতিবাদে সমগ্র দেশ গণজাগরণ-গণবিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এবং অমর একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক দিনে পল্টন ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে যখন প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশর্ত মুক্তিদানের আলটিমেটাম দিয়েছিলাম, যার পরিপ্রেক্ষিতে ২২ ফেব্রুয়ারি প্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে স্বৈরশাসক বাধ্য হয়েছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি আমরা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণসংবর্ধনা প্রদান করি। আমি সৌভাগ্যবান মানুষ যে সেই সভায় সভাপতিত্ব করার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। সভার সভাপতি হিসেবে সবার শেষে বক্তৃতা দেওয়ার কথা; কিন্তু ১০ লক্ষাধিক লোকের সম্মতি নিয়ে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর আগেই বক্তৃতা করেছিলাম।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেছিলাম, যে নেতা জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, সেই নেতাকে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলাম। ১০ লক্ষাধিক লোক ২০ লক্ষাধিক হাত উত্তোলন করে আমাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছিল 'জয় বঙ্গবন্ধু'। ৯ ফেব্রুয়ারির পর আমাদের জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি,

আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন, ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকীসহ যাঁরা কারাগারে বন্দি ছিলেন তাঁরা সকলেই এবং পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে মণি সিংহ, মতিয়া চৌধুরীসহ সকল রাজবন্দি মুক্তিলাভ করেন। আগরতলা মামলায় ৩৫ জন আসামি ছিলেন। তন্মধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হক শহিদ হন। আর বাকি ৩৪ জনকে নিঃশর্ত মুক্তিদানে স্বৈরশাসক বাধ্য হয়। তখন কারাগার রাজবন্দিশূন্য। ৯ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন আর ১১ দফার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেদিন আন্দোলন এক দফায় চলে যায়। প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করেই আমরা ঘরে ফিরেছি।

স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে আরও শপথ দিবসের কথা। যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল '৭০-এর নির্বাচনের পর '৭১-এর ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে। নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সাথে সেদিন আমারও শপথ গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা শপথ নিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, 'ছয় দফা আজ আমার না, ছয় দফা আজ আওয়ামী লীগের না; এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ছয় দফা জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ যদি ছয় দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে এবং আমি যদি করি আমাকেও।' আবার আমরা শপথ নিয়েছিলাম '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের দেরাদুনে। মুজিব বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক হিসেবে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের পাহাড়ের ওপর সাত হাজার ফুট উচ্চতায় ট্রেনিং শেষে রণাঙ্গনে পাঠানোর প্রাক্কালে শপথ গ্রহণ করাতাম এই বলে যে 'প্রিয় নেতা, তুমি কোথায় আছো, কেমন আছো জানি না! যত দিন আমরা প্রিয় মাতৃভূমি তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশকে হানাদারমুক্ত করতে না পারব, তত দিন আমরা মায়ের কোলে ফিরে যাব না।'

প্রতিবছর এই দিনগুলো জাতীয় জীবনে ফিরে আসে। আনন্দের বিষয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রতিটি মিটিংয়ে—আমি তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে যেতাম—যখন বক্তৃতা করতেন, সেই '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের কথাগুলো বলতেন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বক্তৃতায়ও তিনি '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। আমার লাইব্রেরি রুমে বসে যখন '৬৯ ও '৭১-এর সেই সোনালি দিনগুলোর ছবি ও পত্রিকার পাতাজুড়ে প্রতিবেদনগুলো দেখি, তখন আনন্দে বুক ভরে যায় এই ভেবে যে একদিন আমরা গৌরবোজ্জ্বল এই দিনগুলো সৃষ্টি করেছিলাম।

লেখক : আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য ও সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং ডাকসু'র সাবেক ভিপি

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প ও বাস্তবতা

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফর করেন। ১৯৯৭ সালের ওই সফরে তিনি পদ্মা ও রূপসা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের প্রস্তাব করেন। জাপান সরকার দুটি সেতুর নির্মাণে সহায়তা করতে রাজি হয়। যেহেতু পদ্মা অনেক খরস্রোতা বিশাল নদী, তাই জাপান পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা শুরু করে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রূপসা নদীর ওপর পূর্বেই সেতু নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০০১ সালে সমীক্ষার তথ্য দেওয়া হয়। জাপানের সমীক্ষায় মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতু নির্মাণের স্থান নির্বাচন করা হয়। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪ জুলাই ২০০১ সালে মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতু নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় গৃহীত যমুনা নদীর ওপর নির্মিত সেতুর (বঙ্গবন্ধু সেতু) পর দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় স্বপ্ন দেখা শুরু করে পদ্মা সেতুর।

পদ্মা সেতু নির্মাণের এই সূত্রপাতের পর প্রথমে Pre-Feasibility এবং পরবর্তীতে JICA-র অর্থায়নে Feasibility সম্পন্ন হলে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ বাস্তব রূপ ধারণ করে। JICA এই সেতু নির্মাণে Lead Partner হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং আর্থিক ঋণ প্রদানের প্রস্তাব করে, সাথে যুক্ত হয় ADB ও IDB। পরবর্তীতে World Bank-ও সংযুক্ত হয়।

২০১০-১২ সময়ে ADB-র ঋণে সেতুর Detail Design ও Estimate-র জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান AECOM MAUNSELL-কে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে World Bank-এর কিছু আপত্তি-অভিযোগ উপস্থাপনের কারণে বাংলাদেশের সাথে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে World Bank-এর প্রস্তাবনায় বাংলাদেশ আপত্তি-অভিযোগ তদন্ত করে ও এর যৌক্তিক ভিত্তি নেই বলে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান করে। বিষয়টি World Bank সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ না করে প্রকল্পে প্রতিশ্রুত ১.২ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়। সেই সঙ্গে JICA, ADB ও IDB তাদের ঋণ সহায়তা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে।

স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়ায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয় ব্যক্ত করে নিজস্ব অর্থে এই সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। দেশের বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নেতৃবৃন্দের একটি বড়ো অংশ এত বড়ো ও জটিল প্রকল্প World Bankসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে মত পোষণ করেন। অনেকে আরও মতামত দেন যে যেভাবেই হোক World Bank-কে এই প্রকল্পে অর্থায়নে রাজি করানোর বিষয়ে বাংলাদেশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দেন যে এই সেতু বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নির্মাণ করা হবে এতে কোনো ব্যত্যয় করা হবে না। কারণ বাংলাদেশের তৎকালীন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনুপাতে পদ্মা সেতুর জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রতি মাসে যে বিল পরিশোধ করতে হতো (সর্বোচ্চ ৫০ মিলিয়ন ডলার) তা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে কোনো শঙ্কার সম্মুখীন করার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ এ বিষয়ে অনেকেই অকারণে আশঙ্কার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা দেশ ও জাতির মধ্যে বিদ্যুতের মতো জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তোলে। সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হয়ে স্বর তোলে–পদ্মা সেতু আমাদের, আমাদের অর্থেই তা নির্মাণ হবে। এই পদ্মা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে সমগ্র জাতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পেছনে একতাবদ্ধ হয়। সেতু নির্মাণ এবং দেশ ও জাতির মর্যাদাবোধ একই সূত্রে গ্রথিত হয়।

বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় এই মতও পোষণ করা হয় যে নিজস্ব অর্থে এই সেতুর নির্মাণকাজের ব্যয় নির্বাহ করা হলে যে ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে, তা আমাদের আমদানির স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করবে এবং দেশের উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু কোনো ভয়-ভীতি বা নেতিবাচক মতামতই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে দমাতে পারেনি বরং তিনি দৃঢ়ভাবেই সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন।

তবে এজাতীয় ব্যাপক ও জটিল নির্মাণকাজকে প্রথমেই আর্থিক ও ডিজাইন হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। পদ্মা সেতুও তার ব্যতিক্রম নয়। সে কারণেই ২০০৭, ২০১২, ২০১৬ ও ২০১৮-তে পদ্মা সেতু নির্মাণে Design ও Estimate পরিবর্তিত হয়েছে।

Padma Multipurpose Bridge Projec :

Comparison of 2007 DPP, 1st Revised D"P and 2nd Revised DPP

Original DPP	1st Revised	2nd Revised
• মূল্য-১০,১৬১.৭৫ কোটি টাকা • অনুমোদনের সময়- আগস্ট ২০০৭ • Based on Feasibility Studz Report by JICA in ২০০৩-২০০৫. • সেতুর দৈর্ঘ্য-৫.৫৮ কিমি (৩টি স্প্যানে Navigation Clearance সহ)। • Exchange Rate১ USD- ৬৯.১০ টাকা। • DPP will be revised after Detail Design. • Keeping provision for future Railway single broad gauge. • Scour Depth (-) ৩৭.৬m. • ৯১৮.১ Hector Land to be Acquised (Cost-528.00 Crore).	• মূল্য-২০,৫০৭.২০ কোটি টাকা • অনুমোদনের সময়- জানুয়ারি, ২০১১ • সেতুর দৈর্ঘ্য-৬.১৫ কিমি • Exchange Rate ১ USD - ৬৯.০০ টাকা। • রেলসহ দ্বিতল সেতু। • Scour Depth (-) ৬২ m. • ১১২৪.৭৭ Hector Land to be acquised (Cost-944.72 Crore). • Extradose-এর পরিবর্তে দ্বিতল সেতু। • Increased Railway loading (double stack Container). • Increased Seismic Loading • Provision for Gasand Electricity. • ৩টির স্থলে সব স্প্যানে Navigation Clearance থাকায় সেতুর উচ্চতা বৃদ্ধি। • সংযোগ সড়কের উচ্চতা বৃদ্ধি।	• মূল্য-২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা • অনুমোদনের সময়- জানুয়ারি ২০১৬। • অতিরিক্ত ১.৩ কিমি নদীশাসন। • Exchange Rate1 USD- ৭৮.০০ টাকা। • ১৫৩০.৫৪ Hector Land to be acquised (Cost-১২৯৮.৭৩ Crore). • প্রথম সংশোধনীতে আনুমানিক মূল্যের স্থলে Open Tender-এ প্রাপ্ত সংযোগ সড়ক, নদীশাসন, মূল সেতু ও Consultancy দরে উচ্চ সংশোধন। • নতুন আইটেম সংযোজন-ESST I Reverine Vessel সংগ্রহ, মাওয়া ও কাওড়াকান্দি ফেরিঘাট Shifting, ২টি থানা বিল্ডিং নির্মাণ।

Special Revision of RDPP :
Date : 30 June 2018
Additional Land Acquisition 1,162.67 Hectors
Cost- 1,400.00 Crore.
Total RDPP Cost : 30,193.39 Crore

ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতা

১. Infrastructure প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজন হলো Drawing, Design Ges Estimate। বিশেষভাবে পদ্মা সেতুর মতো Mega I Complex প্রকল্পের Design Estimate করার জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি Consulting Firm নিয়োগ করা। কিন্তু ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এজাতীয় কোনো Design Estimate-এর ভিত্তিতে সেতুর প্রকল্প প্রণয়ন করেনি, Feasibility Report-i-এর ওপর ভিত্তি করে উচ্চ প্রণয়ন করেছে। অথচ Feasibility Report প্রকল্পের কোনো Design ev Estimate প্রদান করে না বরং সেতুর Design কেমন হবে, Type of Bridge কী হবে, Traffic Analysis এবং Economic/Financial Viability, IRR, Cost-Benefit analysis, Log Frame, NPV সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। সে কারণে ২০০৭-এ প্রণীত প্রকল্পের ব্যয়কে ধারণাকৃত ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তবে এটা কোনোভাবেই বাস্তব ব্যয় নয়।

১. (ক) প্রথম সংশোধনীতে ২০১১ সালে সেতু নির্মাণের সার্বিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ২০,৫০৭.২০ কোটি টাকা। এই ব্যয়টি বিবেচনার সময়ও Design ও Estimate চূড়ান্ত করা হয়নি। কিন্তু তখন World Bank, JICA, ADB ও IDB-এর তরফ থেকে চুক্তি সম্পাদন করার বাধ্যবাধ্যকতা ছিল। সে ক্ষেত্রে উচ্চ সংশোধনপূর্বক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্পের ব্যয় অবহিত করতে হয়। তার ভিত্তিতেই World Bank, JICA, ADB ও IDB তাদের ঋণ প্রস্তাব নিয়ে আসে এবং চুক্তিও স্বাক্ষর করে।

২. (ক) প্রাথমিকভাবে সেতুর দৈর্ঘ্য সম্ভাব্য অনুমানভিত্তিক ধরা হয়েছিল ৫.৫৮ কিলোমিটার।

(খ) শুধু তিনটি স্প্যানের Navigation Clearance ধরা হয়েছিল। অথচ পরবর্তীতে Design Final হওয়ার পর দেখা যায় যে পদ্মা নদীর মূলস্রোত প্রতি

২০-২২ বছরে এক পার থেকে অপর পার পর্যন্ত চলে যায়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রকৌশলগত কারণে প্রতিটি স্প্যানকেই মূল স্প্যান হিসেবে বিবেচনা করে Navigation Clearance রাখতে হয়েছে। সেজন্য সম্পূর্ণ ব্রিজেরই মূল কাঠামো ১২.৫ মিটার থেকে ১৮.৩ মিটার উচ্চতায় নির্মাণ করতে হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেতুর দৈর্ঘ্য Viaductসহ ৯.৮৫ কিলোমিটারে উন্নীত হয়।

(গ) সেতু নির্মাণের সময় এই উচ্চতে Scour Depth (মাটি সরে যাওয়া) ধরা হয়েছিল (-) ৩৭.৬ মিটার। কিন্তু Design সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা যায় বাস্তব Scour Depth (-) ৬২ মিটার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীতে (-) ৬২ মিটারকে বিবেচনায় এনে Pile length পরিবর্তন করা হয়েছে। সেতু উন্নয়নের ব্যয়ে এগুলোর নির্মাণ ব্যয়ও সংযুক্ত রয়েছে।

(ঘ) ২০০৭ সালে শুধু Road Bridge-কে বিবেচনায় আনা হয়েছিল; কিন্তু Design-এর পর এই সেতুতে Double Deck রেলব্রিজ, গ্যাসলাইন এবং বিদ্যুতের গ্রিড লাইনের টাওয়ার সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় বেড়ে গিয়েছে।

৩. ২০০৭-এর উচ্চতে প্রয়োজনীয় জমি Acquisition ধরা হয়েছিল ২,২৬৭.৭০ একর। কিন্তু Design সম্পন্ন হওয়ার পর জমির প্রয়োজন হয়েছে ৬,২৪১.৭০ একর।

৪. ২০০৭-এ ডলারের মূল্য ধরা হয়েছিল ৬৯.১০ টাকা; কিন্তু ২০১৮-তে উচ্চ সংশোধনের সময় (তখনকার ডলারের মূল্য হিসাবে) ধরা হয়েছে ৮০.০০ টাকা।

৫. ২০১৩ সালে পদ্মা ব্রিজ স্থলে ভয়াবহ Scouring (ভূমি ধস)-এর কারণে ১.৩ কিলোমিটার অতিরিক্ত নদীশাসন কার্যক্রম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

৬. ২০১২ সালে Design Estimate ছাড়াই উচ্চ সংশোধন করে ব্যয় ধরা হয় ২০,৫০৭.২০ কোটি টাকা।

৭. ২০১৪-২০১৫-তে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর Actual Tender Cost এবং কিছু নতুন আইটেমসহ ২০১৬-তে উচ্চ দ্বিতীয়বারের মতো সংশোধন করা হয় এবং মোট ব্যয় দাঁড়ায় ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি। (১ US Dollar = ৭৮ টাকা হিসাবে)

৮. পরবর্তীতে ২০১৭ সালে ভূমি অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তিত হলে পুনরায় উচ্চ সংশোধনের প্রয়োজন হয়। কারণ তখন অধিগ্রহণের জন্য হার ধরা হয় সাধারণ মূল্যের তিন গুণ। জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায়

৩০,১৯৯.৩৯ কোটি টাকা (১ US Dollar = ৮০ টাকা হিসাবে)। যা এখন পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় হিসেবে গৃহীত।

** উল্লেখ্য, আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোর Oakland Bay Bridge নির্মাণ শুরু হয় ১৯৯৯-২০০০ সালে। তখন সেতুটির ব্যয় ধরা হয় ১.০০ বিলিয়ন US Dollar। কিন্তু সেতুটি সম্পন্ন হয় ২০১4 সালে এবং তখন এর ব্যয় দাঁড়ায় ৬.৫ বিলিয়ন US Dollar। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুসারে, Design চূড়ান্ত না করেই প্রকল্প শুরু ও পরবর্তীতে Design Final করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই তারতম্য হয়। Design Final করে কাজ শুরু করলে সেক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার সম্ভাবনা থাকে। সেই সঙ্গে কাজ করার সময়ও Design-এর পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে। তাহলেও Estimate-এ পার্থক্য হতে বাধ্য।

** হংকং-ম্যাকাও-জুহাইয়ের ৫৫ কিলোমিটার (৮ কিমি টানেলসহ) সেতুটিও সুনির্দিষ্ট Estimate ও Design ছাড়াই কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে কাজ সম্পন্ন করার পরই এই সেতুর ব্যয় চূড়ান্ত করা হয় ১৮.৬ বিলিয়ন US Dollar-এর অধিক।

৯. এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে পদ্মা সেতু নির্মাণের খরচ ১০,০০০ কোটি টাকা বলে যে তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা সত্যিকারভাবে কোনো প্রাক্কলন নয় এবং বাস্তবসম্মত নয়।

১০. আমাদের মনে রাখতে হবে যে পদ্মা সেতুর Design I Estimate করেছে AECOM MAUNSELL নামক একটি অত্যন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Consulting Firm। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই Firm নিয়োগ দিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে Design Estimate চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১১. Design Estimate চূড়ান্ত করার পূর্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Expert-iv শ্রদ্ধেয় প্রয়াত অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে AECOM MAUNSELL-এর টিমকে ঢাকায় সাত দিনব্যাপী Cross করে চূড়ান্ত করেছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যৌক্তিকতার বাইরে কোনো ব্যয়/কাজ অন্তর্ভুক্তির কোনো সুযোগই ছিল না। তাছাড়া AECOM MAUNSELL-এর Design Team-এ Mr. Rabin Sam ও Kane Wheeler-এর মতো জগৎখ্যাত Designer-iv অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১২. ADB, WB, JICA ও IDB-এর সাথে চুক্তি হয়েছিল যে পদ্মার কোনো

Tender Evaluation আমাদের সরকারি কর্মকর্তারা করতে পারবেন না। সে কারণে অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Expert-দের সমন্বয়ে Tender Evaluation কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিই সব টেন্ডার মূল্যায়ন করে যেভাবে সুপারিশ করেছে, সেভাবেই সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বিবেচনা করে অনুমোদন দিয়েছে।

১৩. আমরা Tender Evaluation Committee-এর সুপারিশ থেকে বিভিন্ন Component-এর ব্যয় পর্যালোচনা করলে যা দেখতে পাই তা হলো :

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় সারাংশ

(২১ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

ভৌত ৯৪.৫০% ও আর্থিক ৯১.৮৫%

মূল সেতুগুভৌত ৯৯.৫০% ও আর্থিক ৯৮.৩৯%, নদীশাসন-ভৌত ৯৪% ও আর্থিক ৮৯.১০%

অঙ্গভিত্তিক বিবরণ	সংশোধিত ডিপিপির অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ	ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	২	৩
মূল সেতুর ব্যয়	১২,১৩৩.৩৯ কোটি টাকা (৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন টাওয়ার ও গ্যাস লাইনের ব্যয় বাবদ ১,০০০ কোটি টাকাসহ)	১১,৯৩৮.৬৩
নদীশাসন কাজ	৯,৪০০.০০ কোটি টাকা (সিনোহাইড্রো, WDB, BIWTAmn)	৮,৭০৬.৯১
অ্যাপ্রোচ সড়ক	১,৯০৭.৬৮ কোটি টাকা (২টি টোল প্লাজা, ২টি থানা বিল্ডিং, ৩টি সার্ভিস এরিয়াসহ)	১,৮৯৫.৫৫

পুনর্বাসন ব্যয়	১,৫১৫.০০ কোটি টাকা	১,১১৬.৭৬
ভূমি অধিগ্রহণ	২,৬৯৮.৭৩ কোটি টাকা	২,৬৯৮.৭৩
পরিবেশ	১২৯.০৩ কোটি টাকা	২৬.৭২
অন্যান্য (বেতন-ভাতা, পরামর্শক, সেনা নিরাপত্তা ইত্যাদি)	২,৪০৯.৫৬ কোটি টাকা	১৩৪৮.৭৮
প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয়	৩০,১৯৩.৩৯ কোটি টাকা	২৭,৭৩২.০৮ (৯১.৮৫%)

১৪. এখানে উল্লেখযোগ্য হলো, কিছু Component ২০১২, কিছু ২০১৩, কিছু ২০14 এবং কিছু ২০১৫-তে শুরু হয়েছে। কিন্তু Tender Evaluation কমিটি প্রতিটি Component-এ যে ব্যয় সুপারিশ করেছে কোনো ক্ষেত্রেই এখনো সে ব্যয় অতিক্রম করেনি বরং কোনো কোনো Component-এ কিছু কম ব্যয় হয়েছে।

১৫. বিশেষ করে Main Bridge-এর ব্যয় ১২,১৩৩.৩৯ কোটি এবং River Training-এর ব্যয় ৮,৭০৭.৮১ কোটি টাকা Tender Evaluation কমিটি সুপারিশ করেছিল। কাজ শুরুর আট বছর পরে যখন সেতু সমাপ্ত হচ্ছে, তখনো এই দুই প্রধান Component-এর ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি। এ ধরনের সাফল্য যে কোনো বিচারেই অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৬. পদ্মা সেতুর পুরো কাজটি আন্তর্জাতিক Contract Provision-এ পরিচালিত ও তত্ত্বাবধান করা হয়েছে। এটা FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) Contract বলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই FIDIC Contract-এরও সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে FIDIC GOLD। পদ্মা সেতুর কাজে FIDIC GOLD-এর বিধান অনুসরণ করা হয়েছে। এই বিধান অনুসারে কোনো কাজ তত্ত্বাবধান করলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। পদ্মা সেতুতে এই সতর্কতাগুলো পুরোপুরি মেনে চলা হয়েছে।

১৭. সেতু নির্মাণ এবং নদীশাসনের পুরো কাজটি তত্ত্বাবধান করেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Supervision Consultant Korean Expressway Corporation। তার বাইরেও Management Consultant হিসেবে কাজ করেছে H P Randal (বঙ্গবন্ধু সেতুর Supervision Consultant)। Supervision-এর ক্ষেত্রে পদ্মা

সেতুতে Consultant-এর কাজকেও পৃথকভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের পুরো কাজটির তত্ত্বাবধানে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে।

১৮. প্রকল্প বাস্তবায়নে টেকনিক্যাল বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত স্বনামধন্য Expert-এর সমন্বয়ে একটি International Pannelof Expert নিয়োগ দেওয়া হয়। অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী এই Pannel of Expert-এর সভাপতি ছিলেন। এই Pannel নিয়মিতভাবে সেতু নির্মাণের Technical বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে মতামত দিয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এই প্যানেলে Dr. Claus Austin Field, Dr. Ishihara, Dr. Fujimo, Dr. Carvalho-এর মতো আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেই সঙ্গে সান ফান্সিসকো ওকল্যান্ড সেতু নির্মাণের অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রকৌশলী Dr. Awal-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে Technical বিষয়ের অনিশ্চয়তাসমূহ দূর করা সম্ভব হয়।

১৯. আরও উল্লেখ্য যে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ চলাকালে বেশ কয়েকবার অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয়। সেক্ষেত্রে Design-এ কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছে। তবে এই পরিবর্তনের সব বিষয়ই AECOM প্রণীত Design-এ ইঙ্গিত দেওয়া ছিল। এই পরিবর্তনগুলো করার সময়ও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং FIDIC Provision পুরোপুরি মেনে চলা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এসব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে Supervision Consultant I Management Consultant-এর বাইরে Independent Consultant নিয়োগ দিয়ে তাদের কাছ থেকে 3rd Party opinion-এর ওপর International Panel of Expert-দের মতামত নিয়ে সব কিছু চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০. এই সেতু নির্মাণে চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং safety-কে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো :

ক. রিখটার স্কেলের ৮ মাত্রার ভূমিকম্প।

খ. ৬২ মিটার Scouring.

গ. সমস্ত সেতুতে over loaded ট্রাক ও ট্রেন।

ঘ. ৫,০০০ মেট্রিক টনের জাহাজ নদীর Pier-এ ধাক্কা মারা, এই চারটি একসাথে ঘটলেও তা সহ্য করার ক্ষমতা সেতুর থাকবে ইনশাআল্লাহ।

২১. চারটি রেকর্ড প্রচেষ্টা গ্রহণ : পৃথিবীতে সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুতে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা পূর্বে কখনো সম্ভব হয়নি। এগুলো হলো :

ক. ৩ মিটার Diameter-এর স্টিল পাইল প্রথমবারের মতো ১২২ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বসানো হয়েছে।

খ. পৃথিবীতে দীর্ঘতম ৪১টি Steel truss girder বসানো হয়েছে, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। এতে কোনো Concrete ডেক বসানো হয়নি।

গ. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ Pendulum Bearing এই সেতুতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটির ক্ষমতা ৯৮.৭২৫ কি: নিউটন। ইতোপূর্বে কোথাও ৬৮.০০০ কি: নিউটনের ক্ষমতার বেশি Pendulum Bearing ব্যবহার করতে হয়নি।

ঘ. River Training-এর ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুতে ব্যয় হবে ১.১ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর কোনো সেতুরই এত বিশালাকার River Training-এর কাজ হয়নি।

২২. পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হলো পুনর্বাসন কার্যক্রম। এই সেতু নির্মাণে যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াও পুনর্বাসন এলাকায় প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু এলাকায় সাতটি পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোতে স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টারসহ অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামোগত সুবিধাও রয়েছে। পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ এবং এর সংলগ্ন এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে, যেখানে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রভাবে যাঁরা জীবিকা পরিবর্তন করেছেন তাঁদের নতুন পেশার জন্য উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি নগদ আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণের জন্য প্রতিটি পুনর্বাসনকেন্দ্রে একটি করে বাজার নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সেই বাজারগুলোতে মহিলা উদ্যোক্তাদের ব্যাবসা পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

২৩. Feasibility Studz-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ২১টি জেলার কমবেশি তিন কোটি মানুষের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হবে এবং এই জেলাগুলোর জিডিপি ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ১.৩ শতাংশ। এই Studz করা হয় ২০০৪-০৫ সালে। তখনকার আর্থসামাজিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের তুলনায় এখনকার উন্নয়ন আরও বিস্তৃত হচ্ছে এবং অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সে কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই হিসাব আরও পরিবর্তিত হবে।

২৪. Feasibility Studz-এর পরিপ্রেক্ষিতে Toll আদায়ের যে Projection ছিল সে অনুসারে ২৫-২৬ বছরে সেতুর খরচ উঠে আসার পূর্বাভাস ছিল। তৎপরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অর্থ বিভাগের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছে শতকরা ১ শতাংশ Rate of Interest-এ ২৫ বছরে সেতুর খরচ সরকারকে ফেরত দেবে; কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে সেতু নির্মাণের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে ব্যাপক আর্থসামাজিক কার্যক্রম চলছে তাতে যানবাহন চলাচল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং সেতুর খরচ ১৮-২০ বছরেই উঠে আসবে।

২৫. পদ্মা সেতুর সফল সমাপ্তিতে আমাদের বেশ কিছু প্রাপ্তিযোগ হবে। যেমন :

ক) জাতিকে মতপার্থক্য ভুলে একতাবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

খ) নিজেদের আত্মসম্মানবোধ রক্ষায় করণীয় বিষয়ে সচেতন করে তুলবে।

গ) আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদনে আমাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে।

ঙ) যে কোনো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি ও অভিজ্ঞতার ঘাটতিকে পূরণ করবে।

চ) এশিয়ান হাইওয়ে বাস্তবায়নে যে missinglink ছিল পদ্মা সেতু সেই missing link পূরণ করে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

২৬. যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে তা হলো সেতু নির্মাণের ব্যয়। এটা সুষ্ঠুভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন যে মূল সেতুটির ব্যয় ১২,১৩৩.৩৯ কোটি টাকা। ভায়াডাক্টসহ সেতুটির দৈর্ঘ্য ৯.৮৫ কিমি। সেতুটির দ্বিতল এবং নিচের অংশে ডুয়েলগেজ রেললাইন সংবলিত। এই সেতুতে রেললাইন দিয়ে ভবিষ্যতে Double deck Container রেল যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে সেতুতে ৩০ ইঞ্চি Diameter-i গ্যাস পাইপলাইন সংযুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি Fiber Networkসহ অন্যান্য কিছু Connectivity-এর সুবিধাও থাকবে। উপরোক্ত সেতুর কয়েক কিলোমিটার ভাটিতে ৪০০ KV গ্রিড লাইনের জন্য টাওয়ার প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য ব্যয় হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা। এটা বাদ দিলে শুধু সেতুর ব্যয় দাঁড়ায় ১১,১৩৩.৩৯ কোটি টাকা। যে কোনো বিচারে এই ব্যয় অত্যন্ত সাশ্রয়ী। সমসাময়িক সময়ে নির্মিত সব সেতুর ব্যয়ের সাথেই এই সেতুর নির্মাণ ব্যয় অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

লেখক : সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একুশের অবদান : ঘরে-বাইরে

আহমদ রফিক

ভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সে সময় মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতাদের মুখে বারবার একই কথা উচ্চারিত হচ্ছিল : হবু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। তখনই দু-চারজন বাঙালি মুসলমান শিক্ষক-সাংবাদিক-লেখক সাহস করে যুক্তিসংগতভাবে বলতে ও লিখতে পেরেছিলেন অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথা। যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল হক, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. আবুল কাসেম প্রমুখ।

রাষ্ট্রভাষা দাবির এই আদি বা তাত্ত্বিক পর্যায় পার হয়ে রাষ্ট্রভাষার পক্ষে বাস্তব আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ মার্চ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। এর ব্যাপক জাতীয়তাবাদী রূপে প্রকাশ ১৯৫২ ফেব্রুয়ারিতে, যখন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিপূর্ণ ভাষা আন্দোলনে পরিণত হয়। তখন স্লোগান শুধু রাষ্ট্রভাষার নয়, মিছিলে মিছিলে দেশের (পূর্ববঙ্গ প্রদেশের) সর্বত্র স্লোগান ওঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', '(জাতীয় জীবনের) সর্বস্তরে বাংলা চালু করো'।

প্রথম স্লোগানটি যেমন জাতিরাষ্ট্রের ইঙ্গিতবহ, দ্বিতীয় স্লোগানটি গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি প্রতিফলিত করে এবং তৃতীয়টি জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে উচ্চশিক্ষা, উচ্চ আদালত প্রভৃতি ক্ষেত্রে মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটায়। মায়ের মুখের ভাষা তথা মাতৃ ভাষা যেমন ভাব বিনিময়, সাহিত্য রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে একটি ভূখণ্ড ঘিরে একটি জনগোষ্ঠীকে ভাষিক ও জাতীয় আবেগে সংহত করে, তেমনি জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে একটি জাতীয় ভাষার মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা নিশ্চিত করে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২-র একুশে পর্বে পৌঁছে এই জাতীয়তাবাদী রূপের ভাষা আন্দোলনে পরিণত ও পরিস্ফুট হয়। ভাষার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দিকগুলো বিচার করে দেখলে এর পারস্পরিকতা ও স্বাতন্ত্র্যবাদী চরিত্রও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে লক্ষিত হয় এর নেতিবাচক দিক 'জাত্যভিমান', যা বিশ্বজনীন মানব চেতনার বিরোধী তবু আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক

স্বার্থ ও সমৃদ্ধির টানে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতিরাষ্ট্র গঠন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে সময় বিশেষে শ্রেণি চেতনা হার মানে। পিছু হটেছে বিশ্বের একাধিক দেশ তেমন উদাহরণ দৃশ্যমান।

বাস্তবিক একুশে হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ভবিষ্যৎ ভাষিক জাতিরাষ্ট্রের বীজতলা। এ যাত্রা পথ মোটেই মসৃণ ছিল না, ছিল অবাঞ্ছিত জটিলতায় যুক্ত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিভাজক নীতি ও তাদের বঙ্গীয় কৃষিনীতির কারণে বঙ্গীয় মুসলমান শুধু প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায়ই নয়, উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের তুলনাই নয়, উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের তুলনায়ও শিক্ষা ও আর্থসামাজিক পর্যায়ে পিছিয়ে পড়েছিল। ইরফান হাবীব প্রমুখ উত্তর ভারতীয় গবেষকদের রচনা তেমন প্রমাণ দেয়। বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে বোম্বাই, পাঞ্জাব-গুজরাট তার প্রমাণ।

স্বভাবতই হীনম্মন্যতায় ভুগেছে বাঙালি মুসলমান। তাই জিন্নাহর স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির স্বতন্ত্র ভুবন (পাকিস্তান) আত্মোন্নয়ন ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাদের কাছে আকর্ষণীয় স্বপ্নের ভুবন বলে মনে হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত রাজনীতি থেকে মুক্ত হতে অনেকটা সময় লেগেছে। পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে এ যাত্রার মুক্তিস্থান।

বাঙালি মুসলমানের জন্য দেশভাগ পূর্বকালে পাকিস্তান হয়ে ওঠে স্বপ্নের ভুবন। তাদের অসীম উদারতার সুযোগ নিয়েছিল জিন্নাহ-লিয়াকত থেকে পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। বাঙালি মুসলমানের ভোটে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি রচিত হয়েছিল ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক নির্বাচন তার প্রমাণ। তারা একজোটে মুসলিম লীগের বাক্সে ভোট দিয়েছিল। ফজলুল হক সাহেবের দুটি আসন বাদে বাকি সব মুসলিম লীগ দখল করে।

কিন্তু মুসলমান প্রধান পশ্চিম ভারতে ভোটের ফলাফল ছিল ভিন্ন ও মিশ্র। গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জাব প্রদেশসহ সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগবিরোধী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সিন্ধুতে লীগ অতি কষ্টে ইউরোপিয়ান ব্লকের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এককথায় বাঙালি মুসলমানই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তব পটভূমি তৈরি করেছিল।

আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি মুসলমানের অসীম উদারতায় অমৃতের সবটুকু গ্রাস করে উর্দুভাষী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তির কল্যাণে পশ্চিম পাকিস্তান। ঢাকা নয়, করাচি হয় পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী, পরে রাওয়ালপিন্ডি হয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়ে স্থায়ী রাজধানী ইসলামাবাদ। ঢাকা বিকল্প রাজধানীর মর্যাদাটুকু পর্যন্ত পায়নি।

ইঙ্গো-মার্কিন বিদেশি ঋণ ও অনুদানের সিংহভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে নানা ধারার শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে এবং করাচি বন্দরের আধুনিকায়নের মতো উন্নয়নকর্মে, চট্টগ্রাম বন্দর পূর্বাবস্থায়। পূর্ববঙ্গের পাট ও বস্ত্রকলগুলোর মালিকানায় ছিল উর্দুভাষী অবাঙালি শিল্পপতিবৃন্দ। শিল্প, শিক্ষা ও নানাখাতে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বিপুল আর্থসামজিক বৈষম্য গড়ে ওঠে।

বিস্ময়কর যে শুধু কেন্দ্রীয় শাসনের উচ্চপদগুলোতেই নয়, পূর্ববঙ্গীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদগুলোতেও দেখা গেছে উর্দুভাষী অবাঙালিদের প্রাধান্য। এই বৈষম্য ধীরেসুস্থে গড়ে ওঠে। তবে বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তানবিষয়ক স্বপ্নে প্রথম আঘাত পড়ে যখন জিন্নাহ-লিয়াকত থেকে শুরু করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বলতে থাকেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়। বিষয়টি ইতঃপূর্বে উল্লিখিত।

তবু অবাক হওয়ার মতো ঘটনা, বাঙালি মুসলমানের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানি প্রভাব এতই ছিল যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরুতে লীগ রাজনীতিকগণ তো বটেই, শিক্ষিত শ্রেণির অংশ বিশেষের সমর্থন ছিল উর্দু ও উর্দুভাষী নেতৃবৃন্দের প্রতি।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে ও পাকিস্তান আন্দোলনে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ছাত্র-যুবারা। তাদের ক্লান্তিহীন শ্রমে ও মুসলিম লীগের প্রচারে পাকিস্তান দাবি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। দাবিটি হয়ে ওঠে সর্বজনীন চরিত্রের।

এই অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক চরিত্রের অবসান ঘটায় যে ভাষা আন্দোলন, তারও চালিকাশক্তি ও রাজনীতি সচেতন ছাত্র-যুবা, যাদের শ্রমে-আদর্শে এবং আত্মদানে ভাষার নাম মাত্রিক দাবিগুলোকে (স্লোগান স্মর্তব্য) কেন্দ্র করে একুশের আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, চাটমোহর থেকে মেহেরপুর, অর্থাৎ প্রদেশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, যদিও মূলত শিক্ষায়তনগুলোকে কেন্দ্র করে। আন্দোলন সর্বজনীন চরিত্র অর্জন করে, তবে ১৯৪৬- এর বিপরীত চরিত্রে। সুস্পষ্টভাবেই অসাম্প্রদায়িক, উদার গণতন্ত্রী, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ধারায়।

বিভাগপূর্ব রাজনীতির চরিত্রবদল ঘটায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২), বিশেষ করে একুশের ভাষিক জাতীয়তাবাদী চেতনানির্ভর আন্দোলন। এই আন্দোলন ছাত্র-যুবা এবং এক পর্যায়ে জনতার অসীম সাহস ও বীরত্বের প্রকাশ।

১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারির ছাত্র-যুবাদের ঘোষিত কর্মসূচি বানচাল করতে ঢাকা প্রশাসন ২০ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) বিকেলে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। সামনে নির্বাচনের গাজর ঝোলানো থাকায় রাজনীতিক প্রধান সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভাঙার বিপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে, যদিও ছাত্র-যুবা নেতৃত্বের প্রধান অংশ সে প্রস্তাব মেনে নেয়নি, সাধারণ ছাত্ররা তো নয়ই। তাদের কথা, যে কোনো মূল্যে তারা ১৪৪ ধারা ভেঙে নির্ধারিত কর্মসূচি পালন করবে।

সে উদ্দেশ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক আমতলায় ছাত্রছাত্রীদের অনড় সিদ্ধান্ত ১৪৪ ধারা ভেঙে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণের দিকে বেরিয়ে যাওয়া ১০ জনের ছোটো ছোটো মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের সম্মুখীন হয়।

সেদিন দুপুরের অসাধারণ ঘটনা—পুলিশের কঠিন ব্যারিকেড ভাঙায় অপারগ হোস্টেল প্রাঙ্গণে স্লোগানরত ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং রফিক-জব্বার-বরকত প্রমুখের শাহাদাতবরণ, দিনটি পরবর্তী সময়ে চিহ্নিত হয় শহিদ দিবস হিসেবে। প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা শহরসহ গোটা প্রদেশ প্রতিবাদে উত্তাল। ঢাকা লাল-কালোয় আশ্চর্য এক প্রতিবাদের শহর, পুরান ঢাকার অধিবাসীসহ।

২২ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা মিছিলের শহর। পুরনো স্লোগানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন স্লোগান—'শহিদ স্মৃতি অমর হোক'। সেই স্লোগান বাস্তবায়নে ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের রাজনীতিমনস্ক ছাত্ররা তাদের হোস্টেল প্রাঙ্গণে এক রাত্রির শ্রমে তৈরি করে ১০ ফুট উঁচু, ৬ ফুট চওড়া পাকা একটি শহিদ মিনার। ঢাকাবাসীর প্রিয় সেই মিনার ২৬ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনের দিনেই বিকেলে পুলিশ ভেঙে ফেলে, ইটের শেষ টুকরাটি পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায়।

কিন্তু শহিদ মিনার মরে না। ভাষিক চেতনার মানুষের মনে সে চিরজীবী হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রাজশাহী থেকে নড়াইল শহরে ছাত্র-যুবাদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে শহিদ মিনার, এমনকি গ্রামের স্কুল প্রাঙ্গণেও। পরবর্তী সময়ে সরকারি উদ্যোগে ঢাকায় যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণের চেষ্টা চলে, ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে, তার অবশেষ পরিণাম মূল নকশা থেকে কাটছাঁট করা বর্তমান শহিদ মিনার। হামিদুর রহমানের মূল নকশা ও নভেরা আহমদের ভাস্কর্য কিছুই এতে ধরা পড়েনি। বর্তমান সরকার আকর্ষণীয় মূল নকশাটির ধারায় শহিদ

মিনার পুনর্নির্মাণ করে ভাষাসংগ্রামী ও সংস্কৃতিসচেতন জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। নতুন মিনার বিদেশি পর্যটকদের প্রশংসা কুড়াবে।

ভাষা আন্দোলন একুশে জাতিকে (এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) রাষ্ট্র ও সরকারকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী প্রতীক উপহার দিয়েছে। প্রথমত, শহিদদের আত্মদানের স্মৃতিনির্ভর শহিদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারির; দ্বিতীয়ত, শহিদ মিনার। শুধু কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারই নয়, দেশব্যাপী নির্মিত ছোটো-বড়ো নানা আকৃতির শহিদ মিনার—জাতি যেখানে প্রতিবছর একবার করে হলেও শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়।

শহিদের আত্মদানের স্মৃতিনির্ভর শহিদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি একদিকে শোক, অন্যদিকে প্রতিবাদ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে স্বীকৃত। দিনটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে শহিদ মিনার থেকে সূচিত স্মারক মিছিল এবং অপরাহ্নে জনসভা। শহিদ দিবসের ছুটি উপলক্ষ্যে গোটা দেশ এই রীতি প্রথম পালন করে থাকে।

শহিদ মিনার এদিক থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এর প্রতীকী তাৎপর্যের ধরা রয়েছে শহিদের জন্য শোক, অনাচারী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা, প্রতিবাদ; সর্বোপরি জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেরণা। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের উৎসস্থল।

ভাষা আন্দোলনের আরেক গৌরবময় অবদান বৈশ্বিক পরিসরে এই দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা, যা বাংলাভাষী মানুষ মাত্রের জন্যই অহংকারের বিষয়। এর প্রাথমিক কৃতিত্ব রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম নামের দুই প্রবাসী বাংলাদেশির। সেই সঙ্গে কৃতিত্ব তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের এবং বিশেষভাবে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও বিশিষ্ট বাংলাদেশি কূটনীতিক সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর আন্তরিক তৎপরতার। ঘোষণাটি আসে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে ১৭ নভেম্বর।

ভাষা আন্দোলন একুশের (১৯৫২) অবদান এভাবে ঘরে-বাইরে আমাদের জন্য গর্বের বিষয় হয়ে আছে যদিও এর গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান : 'সর্বস্তরে বাংলা চালু করো' এত কাল পরও চালু হয়নি। উচ্চশিক্ষা, উচ্চ আদালতের মতো একাধিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাজভাষা ইংরেজি সগৌরবে বিরাজমান, মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা সে বিবেচনায় অনেক পিছিয়ে এবং সত্যি বলতে কি আমাদের চর্চায় হেলাফেলার পাত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম সাহিত্য-সংস্কৃতির ভুবনটি।

এককথার শেষ কথা হচ্ছে, ভাষা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অবদান একুশের রক্তরঞ্জিত জাতীয়তাবাদী চেতনার পথ ধরে ষাটের দশকে স্বশাসনের জোরালো হাওয়ায় (ছয় দফা, ১১ দফা) ঊনসত্তরের গণজাগরণ ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। প্রাপ্তি একটি নতুন পতাকা, একটি নতুন মানচিত্র, একটি অসাধারণ সংবিধান এবং সংবিধানসম্মত একক রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ('প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা')।

কিন্তু অনভিজ্ঞ থেকে গেছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রচলন, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা-বিজ্ঞান শিক্ষা ও উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক রাজভাষা ইংরেজি। ভাষাসংগ্রামী ও আত্মসচেতন বাঙালি সংবিধানসম্মত রাষ্ট্রভাষার সর্বস্তরে প্রচলনের অপেক্ষায় রয়েছে।

লেখক : ভাষাসৈনিক

১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বনাম আটকে পড়া বাঙালি

জাফর ওয়াজেদ

প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির একটি রোগ। তাই ৫০ বছর আগে যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করা দূরে থাক, উপরন্তু বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা হয়নি বলে সে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে গ্লানিময় কণ্ঠে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ কখনো পরাভব মানেনি। তাই স্বদেশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চার দশক পর হলেও অব্যাহত রেখেছে। এবার পাকিস্তানি সেই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রতীকী হলেও শুরু করতে যাচ্ছে। বিশ্ব জনমত আজ হোক, কাল হোক, এদের বিচারের জন্য পাকিস্তানকে চাপ দেবেই।

স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও প্রশ্ন ওঠে এখনো, কেন ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার হলো না। বিচার ছাড়াই তাদের কেন পাকিস্তানিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। কেন পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি দিয়েও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পদক্ষেপ নেয়নি। আটকে পড়া বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে ফেরত এলেও বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিরা এখনো কেন পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করছে না। প্রশ্ন যখন আছে, উত্তরও তার রয়েছে দণ্ডায়মান। কেন, কী কারণে যুদ্ধবন্দিরা মুক্তি পেল, এর নেপথ্যে ঘটনার ঘনঘটা কম নয়।

পঞ্চাশ বছর আগে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার সেনাদের আত্মসমর্পণ-পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত–এই তিন দেশের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক টানাপোড়েন শুরু হয়। যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাদের বিচার নিয়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়। ভারত এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকেই সমর্থন করে; কিন্তু ভারতের তখন তাদের আশ্রিত প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির ভরণপোষণ নিয়ে হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। বাংলাদেশও আটকে পড়া পাকিস্তানিদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পক্ষে তাদের ভরণপোষণও অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদিও এরা তখন থেকেই জেনেভা কনভেনশনের অধীনে। যেমন ছিল পাকিস্তানি পরাজিত সেনারা। ভারত যেহেতু আন্তর্জাতিক জেনেভা কনভেনশনের সদস্য এবং যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী, তাই যুদ্ধবন্দিদের রক্ষা করার জন্য দেশটি আন্তর্জাতিকভাবে দায়বদ্ধ। যে কারণে পাকিস্তানি হানাদাররা

বাঙালি মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে আগ্রহী হয়নি। হলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদা পেত না। যদিও যৌথ বা মিত্রবাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু দলিলে মিত্রবাহিনীর বাঙালিপক্ষের স্বাক্ষর নেই। তবে বাংলাদেশি পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের জন্য যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তাতে যৌথ বাহিনীর কথা উল্লেখ ছিল। আত্মসমর্পণ দলিলেও বলা হয়, 'আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হবে এবং আত্মসমর্পণকারী সব পাকিস্তানি সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।' এতে হানাদারদের স্থানীয় সহযোগী রাজাকার, আলশামস ও আলবদররা জেনেভা কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এদের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের হাতে ন্যস্ত বলে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছিলেন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতে স্থানান্তর কালে।

যুদ্ধবন্দিদের যাতে বিচার হতে না পারে, সেজন্য পাকিস্তান তখন 'তুরুপের তাস' হিসেবে সে দেশে আটকে পড়া চার লাখ বাঙালিকে জিম্মি করার হুমকি দেয়। যুদ্ধবন্দিদের দ্রুত পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর জন্য জাতিসংঘসহ মুসলিম দেশগুলো ভারত ও বাংলাদেশকে চাপ দিতে থাকে। একাত্তরের সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে তখন শুরু হয় তিন দেশের মধ্যে কূটনৈতিক লড়াই এবং তাতে বিশ্বের অন্য দেশগুলোও জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশই প্রথম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটাকে সামনে নিয়ে আসে। মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম কামারুজ্জামান ১৯৭১-এর ২৭ ডিসেম্বরে ঘোষণা দেন যে 'বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৩০ জন শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি সরকারি কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেছে এবং গণহত্যায় সহযোগিতার জন্য অচিরেই তাদের বিচার হবে।' এর পরই একাত্তরে গণহত্যার শিকার সাত বাংলাদেশি কর্মকর্তার পরিবারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে দোষী পাকিস্তানিদের বিচারে বাংলাদেশকে সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়ে কলকাতায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য ডিপি ধর বলেন, 'ভারত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন পরীক্ষা করছে। সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ভারত স্পষ্ট ঘোষণা দেয় যে 'যুদ্ধাপরাধী বিচারের ব্যাপারটি বাংলাদেশের এখতিয়ারের ভেতর। কারণ পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে। ফলে এ নিয়ে ভারতের একার বলার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নেই। যা কিছু করতে হয় তা বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার ভিত্তিতেই করতে

হবে।' বাংলাদেশ সরকারও ঘোষণা দেয় যে 'কূটনৈতিক স্বীকৃতির আগে এবং সম্পর্কের সমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা বলতে সে প্রস্তুত নয়। আর ১৯৭১-এর ২০ ডিসেম্বরে ক্ষমতায় বসে ভুট্টো দেখলেন, তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখা সহজ নয়। 'জাতশত্রু' ভারতের কাছে হেরে এবং আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের তখন করুণ দশা। ভুট্টো জাতিসংঘে দাবি তোলেন–ভারতে আশ্রিত দ্রুত তাঁর ৯৩ হাজার সেনাকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ তখন গোঁ ধরে বসে আছে; যুদ্ধাপরাধের জন্য তারা পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করবে। সে উদ্দেশ্যে যুদ্ধাপরাধী সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের এক তালিকাও বাংলাদেশ তৈরি করে। ভুট্টোর জন্য তখন প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল সে বিচার ঠেকানো এবং যুদ্ধাপরাধীসহ সব বন্দিকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া। ভুট্টোর জন্য এই এজেন্ডা পাকিস্তানি জেনারেলরা ঠিক করে দেয় ক্ষমতায় বসার প্রথম দিন থেকেই। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্ন সে সময় ছিল পাকিস্তানের বিবেচনার বাইরে বরং যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখবে না বলে পাকিস্তান ঘোষণা দেয়। তাই দেখা যায়, ১৯৭২-এর প্রথম দিকে ছোটো ছোটো গোটা কয়েক দেশের সঙ্গে পাকিস্তান তার সম্পর্ক ছেদও করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করায় যুক্তরাজ্যের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তান কমনওয়েলথ থেকেও বেরিয়ে আসে।

বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে। সে অনুযায়ী বিচারের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার বাহাত্তরের ২৯ মার্চ ঘোষণা করে যে জেনারেল নিয়াজি, রাও ফরমান আলীসহ ১১০০ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হবে। সেজন্য একটি প্রস্তাবনাও উপস্থাপন করা হয়। যাতে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীর বিচারে দেশি-বিদেশি জুরি নিয়োগ এবং অন্যদের জন্য শুধু দেশীয় জুরি নিয়োগের উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সেসব পাকিস্তানি সেনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়, যাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে 'প্রাইমা ফেসিইকেল' যোগ করতে পারবে। বাংলাদেশের সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ১৪ জুন ভারত সরকার নিয়াজিসহ প্রাথমিকভাবে ১৫০ যুদ্ধবন্দিকে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়। ১৯৭২ সালের ১৯ জুন বঙ্গবন্ধু পুনরায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলার মাটিতেই তাদের বিচার হবে।

১৯৭২ সালের ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাই ভারতের শৈলশহর সিমলায় অনুষ্ঠিত হয় ইন্দিরা-ভুট্টো বৈঠক। ভুট্টোকন্যা ১৮ বছর বয়সি বেনজিরও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ইন্দিরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। প্রথমে ইন্দিরা ও ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক হয় অন্য কোনো উপদেষ্টা বা পরামর্শক ছাড়াই। এরপর উভয় সরকারের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাদের উপস্থিতিতে ইন্দিরা-ভুট্টোর মধ্যে আরও কয়েক দফা বৈঠক হয়। অতঃপর দুই দেশের মধ্যে অতীতের সব সংঘর্ষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংকল্প ব্যক্ত করে ইন্দিরা ও ভুট্টো এক চুক্তি সই করেন। এটাই 'সিমলা চুক্তি' নামে খ্যাত। সামরিক ও রাজনৈতিক নানা দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নিয়ে বৈঠকে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের স্বীকৃতি বা যুদ্ধবন্দি ফেরত নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। চুক্তিতে কাশ্মীর সীমান্তসহ দ্বিপক্ষীয় কতিপয় বিষয়, যেমন : পাকিস্তানের যে অঞ্চল ভারত দখল করেছে, তা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সিমলা চুক্তির পরপরই বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।' প্রতিবাদ জানান ভুট্টো, 'পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচার করার কোনো অধিকার বাংলাদেশের নেই। কারণ পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনীর কাছে।' তখন ভারত সরকার বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, 'প্রকৃত সত্য এই যে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর কাছে। আর এ কারণেই যুদ্ধবন্দিদের প্রশ্নে যে কোনো সিদ্ধান্ত ভারত ও বাংলাদেশের মতৈক্যের ভিত্তিতেই গৃহীত হবে।'

যুদ্ধবন্দিদের বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পাকিস্তান সরকার সে দেশে আটকে পড়া চার লাখ বাঙালিকে তখন 'জিম্মি' করে। বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারী সন্দেহে বহুজনকে বন্দিশালায় আটকে রাখে। প্রায় ১৬ হাজার বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা, যাদের একাত্তরেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল, তাদের পাকিস্তান ত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পাকিস্তান সেখানে আটকে পড়া বাঙালিদের পরিবারসহ অমানবিক পরিবেশে বন্দিদশায় রাখে। অনেক বাঙালি আফগানিস্তানের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দেশে আসার পথে মারা যান। যাঁরা আফগানিস্তান হয়ে পালিয়ে আসছিলেন, সেসব বাঙালিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ভুট্টো সরকার মাথাপিছু এক হাজার রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বাঙালিবিদ্বেষী অনেক পাকিস্তানি অসত্য অভিযোগ এনে

প্রতিবেশী অনেক বাঙালিকে পরিবারসহ ধরিয়ে দেয়। যাদের পুলিশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি পাকিস্তানে বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন পেশ করেছিল। যাতে বলা হয়েছিল, 'হাজার হাজার বাঙালি বিনা বিচারে জেলে আটক আছে। পাকিস্তান ত্যাগ করতে পারে–এই অভিযোগে বাঙালিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিদিনই তাদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং তারা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা উঁচু পদে রয়েছেন এবং বিত্তবান, তাঁরা দুর্বিষহ অবস্থায় রয়েছেন। বাঙালিদের 'নিগার' বা নীচুজাত হিসেবে দেখা হচ্ছে। যাঁরা ইতোমধ্যেই নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার, তাঁদের প্রতি অত্যন্ত খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। তবে সেনাবাহিনীসহ সরকারি উঁচুপদে অনেক বাঙালি পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে চাকরিরত রয়েছেন।' যেসব বাঙালি নারী বা পুরুষ পাকিস্তানি বিয়ে করেছেন, তাঁদের অবশিষ্টাংশ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বহাল তবিয়তে সে দেশে রয়ে যান। ভুট্টো প্রকাশ্য জোরগলায় বলেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাংলাদেশের প্রস্তাবের বিপরীতে পাকিস্তান আটকে পড়া বাঙালিদের জিম্মি করতে বাধ্য হয়েছে।'

আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত আনার জন্য তাদের পরিবার ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। প্রয়োজনে যুদ্ধাপরাধীদের বিনিময়ে তাদের স্বজনদের ফেরত আনার দাবি জানাতে থাকে। এই দাবিতে তারা সমাবেশ এবং অনশন পালন অব্যাহত রাখে। ১৯৭২ সালের ৪ মে ঢাকাজুড়ে জনতার বিক্ষোভ মিছিল বের হয় বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে। সরকারের ওপর তারা ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকে। আটকে পড়া বাঙালিদের ব্যাপারে বাংলাদেশ তখন বিশ্ব জনমতের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের সাহায্য কামনা করে ভারতের মাধ্যমে আবেদন জানায়। অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় নিহত শহিদদের পরিবারগুলো সারা দেশে সভা-সমাবেশ করতে থাকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার দালাল আইন জারি করে। আলবদর, আলশামস, রাজাকারসহ দালালদের গ্রেফতার অব্যাহত রাখে এবং বিচারকাজ শুরু করে। চীনাপন্থি দল, উপদল ও গ্রুপ এবং মওলানা ভাসানী এই আইন বাতিলের দাবি জানাতে থাকেন। তাঁরা এই আইনে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে সভা-সমাবেশ ও মিছিলে হুঁশিয়ারি জারি করেন। পাশাপাশি মুজাফফর ন্যাপ, সিপিবিসহ কয়েকটি দল আটকে পড়া পাকিস্তানিদের দ্রুত

পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর দাবি তুলতে থাকে। নানামুখী চাপে তখন বঙ্গবন্ধু সরকার। অন্যদিকে ভুট্টো বুঝতে পেরেছেন, আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত নিতে শেখ মুজিবের সরকার চাপের মুখে রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে দেরি না করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে কর্মরত সেনা সদস্য ও চাকরিজীবী কয়েক শ বাঙালিকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধু তাদের মুক্তি দেওয়ার দাবি জানালেও ভুট্টো তাতে সাড়া দেননি বরং আটকে পড়াদের বিনিময়ে সব যুদ্ধবন্দিকে ফেরত নিতে ষড়যন্ত্র আঁটেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভুট্টো বিহারি অধ্যুষিত সিন্ধুপ্রদেশে 'বিহারি বাঁচাও' নামে মিছিল সমাবেশ করান এবং আন্তর্জাতিক মহলকে এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে আবেদন জানালেও বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি।

১৯৮৯ সালে দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওমান এরিয়াস' গ্রন্থে অধ্যাপক ডেনিস রাইট উল্লেখ করেছিলেন, সে সময়ের কথা "বিকৃত বিচারের বদলে' যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্নটি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় দেশের জন্যই একটি 'কূটনৈতিক তুরুপের তাস'-এ পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ একে ব্যবহার করছে পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। আর পাকিস্তান স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে দাবি করছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নাকচ করার জন্য।"

যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সেনাদের নিয়েও বিপাকে পড়ে ভারত। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এদের নিরাপত্তা, খাওয়াদাওয়াসহ ভরণপোষণ এবং ভাতা প্রদান করতে হতো ভারতকেই। এ খাতে প্রতি মাসে ব্যয় দাঁড়াচ্ছিল এক লাখ ডলারের বেশি। যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধবিরতি চুক্তিও সই হয়েছে, পরাজিতরা আত্মসমর্পণও করেছে, সুতরাং তাদের আর আটকে রাখার পক্ষে কোনো যুক্তিও ভারতের সামনে তখন ছিল না। ভারত আকাশবাণীর বিশেষ চ্যানেল চালু করে, যেখান থেকে যুদ্ধবন্দিরা পাকিস্তানে তাদের পরিবারের কাছে নিজের অবস্থা জানান দিয়ে বার্তা প্রচার করতে থাকে। তাই দেখা যায়, বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডাইম ভারত সফরে এসে ইন্দিরা গান্ধীকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দেন। ইন্দিরা অবশ্য সরাসরি জানিয়ে দেন, বাংলাদেশের মতামত অগ্রাহ্য করে ভারত একতরফাভাবে কিছু করতে পারে না, করবেও না। ইন্দিরা জানতেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে শেখ মুজিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম তালিকায় ১৫০০ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও সেনা

সদস্যের নাম প্রকাশ করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যথাযথ তথ্য-প্রমাণ হাজির করার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় তালিকা কমিয়ে আনে। শেষে তা দাঁড়ায় ১৯৫ জনে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত বাংলাদেশের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি এই তালিকা করে। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে যুদ্ধবন্দি বিষয়ে প্রথম আইন পাস করা হয়।

দিল্লি থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ; সার্চ ফর নিউ রিলেশনশিপ' গ্রন্থে অধ্যাপক মুহম্মদ আইউব লিখেছেন, 'ভুট্টো জানতেন, তাঁর দেশের আটক যুদ্ধবন্দি ভারতের জন্য বোঝাস্বরূপ। আজ বা কাল হোক, ভারতকে সব যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দিতেই হবে। ফলে এই প্রশ্নে দেনদরবার করে কোনো বাড়তি ফায়দা আদায় হবে না। ভুট্টো বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন ও হেনস্তা করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। পুরো ১৯৭২ সাল তাই ভুট্টো বাংলাদেশকে ভারতের অধিকৃত অঞ্চল বলে ঘোষণা করতেন।' ১৯৭২ সালের ১০ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো বলেন, 'বাংলাদেশ ভেবেছে যে আমাদের বন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে তাদের ভেটো ক্ষমতা আছে। ভেটো আমাদের হাতেও একটা আছে।' ভুট্টো জানান যে 'পাকিস্তানের অনুরোধে চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়ে ভেটো দেবে।' সে সময় সদ্যস্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশ সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন করে। ২৫ আগস্ট চীন নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়ে ভেটো দেয়। বাংলাদেশের অপরাধ তখন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করা। তদুপরি বাংলাদেশ বিচারের অবস্থান থেকে সরে আসেনি। দূতিয়ালির জন্য বঙ্গবন্ধু চীনেও প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন গোপনে। চীন তখন পাকিস্তানের বিষয়ে অন্ধ এবং গণহত্যাকারীদের বিচারের বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। ফলে বাংলাদেশের দূতিয়ালি সফল হতে পারেনি। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল পুরো একাত্তর সালসহ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত।

১৯৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভুট্টো ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন, 'কয়েক শ পাকিস্তানি বন্দিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করার জন্য রেখে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁর আপত্তি নেই।' কিন্তু

১৯৭৩ সালে ভুট্টো তাঁর মত পরিবর্তন করে বলেন, 'পাকিস্তানি বন্দিদের বিচার করা হলে সেই আটকে পড়া বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' (হু কিল্ড মুজিব, এএল খতিব)। ১৯৭২ সালের নভেম্বরে ভারতে আটক পাকিস্তানি সেনা পরিবারের প্রায় ছয় হাজার সদস্যকে মুক্তি দেয়। বিপরীতে পাকিস্তানও আটকে পড়া ১০ হাজার বাঙালি নারী ও শিশুর একটি দলকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসনে সম্মত হয়; কিন্তু পাকিস্তানে আটক অধিকাংশ বাঙালির কী হবে, এ নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে বাংলাদেশের। যুদ্ধবন্দি ও আটকে পড়া বাঙালিদের বিনিময় নিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতার আড়ালে চাপা পড়ে যেতে থাকে আটকে পড়া পাকিস্তানি তথা বিহারিদের ফেরত যাওয়ার বিষয়টি। জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন এদের শরণার্থী হিসেবে মর্যাদা দেয়। এরা যেসব ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়, তা জেনেভা ক্যাম্প নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রায় ছয় লাখ বিহারি পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হয়। এদের একটা অংশ ১৯৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মিরপুর দখল করে রেখেছিল। আলশামস বাহিনীর সদস্যও ছিল এরা। ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই ব্রিটিশদের কূটকৌশলে বিহার থেকে এরা এ দেশে আসে রেলসহ অন্যান্য সেক্টরে কাজের জন্য। পাকিস্তান যুগে এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃজনে এরাই প্রধান নৃশংস ভূমিকা রেখেছিল। প্রচণ্ডভাবে বাঙালিবিদ্বেষী বিহারিরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় জায়গাজমি দখল করে গোত্রভুক্ত হয়ে থাকত। ১৯৭১ সালের মার্চে এরা বিভিন্ন স্থানে বাঙালির ওপর হামলা চালায়। আর পুরো ৯ মাস গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটে এরা পাকিস্তানি বাহিনীর বিশ্বস্ত হিসেবে নৃশংস হয়ে উঠেছিল। এদের একটি বড়ো অংশ, অর্থাৎ বিত্তবানরা ডিসেম্বরের আগেই পাকিস্তান চলে যায়। দরিদ্র বিহারিরা আর পালানোর পথ পায়নি। পাকিস্তানি হানাদাররাও এদের সঙ্গে নিয়ে যায়নি। এই আটকে পড়ারা পাকিস্তান যাওয়ার জন্য চার দশকেরও বেশি অপেক্ষমাণ।

যুদ্ধাপরাধী বিচারের পথ বন্ধ করতে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতা এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ১০ জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় লেখা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বাংলাদেশের সরকারপ্রধান শেখ মুজিবকে পরামর্শদান উপলক্ষে জানিয়ে দিয়েছেন যে একটি বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচার করা হলে পাকিস্তানের হতোদ্যম জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তা সামলাতে পারবেন না এবং এর ফলে উপমহাদেশে শান্তি স্থাপন সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' যুদ্ধাপরাধী

বিচার প্রত্যাহারের জন্য এটাই প্রথম বিদেশি চাপ তা নয়, শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেন এ ধরনের পরামর্শ দিয়েছে, তাও নয়। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশে গণহত্যায় লিপ্ত, তখন যেসব মুসলিম দেশ এসবেরও প্রতিবাদ করেনি, তারা ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর জন্য গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিশেষত, মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ভাগ্যের সঙ্গে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়ে। তখন ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল টানা চার দিনের আলোচনা শেষে বাংলাদেশ ও ভারতে যৌথ ঘোষণায় যুগপৎ প্রত্যাবাসনের প্রস্তাব রেখে বলে, যুদ্ধবন্দি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আটক সব নাগরিককে একযোগে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হবে। এর আগে তিনটি দেশ নাগরিকদের সাতটি ক্যাটাগরি প্রণয়ন করেছিল। এই তালিকায় আটকে পড়া বাঙালি ও বিহারি ছাড়াও পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি। তাই প্রস্তাব আনা হয়, ভারত সে দেশে আটক প্রায় ১০ হাজার বন্দিকে পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করবে। বিনিময়ে পাকিস্তান সে দেশে আটকে থাকা বাঙালিদের মধ্যে দুই লাখকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে। এছাড়া বাংলাদেশে আটক প্রায় দুই লাখ ৬৩ হাজার অবাঙালি তথা বিহারিকেও পাকিস্তান ফেরত নেবে। তার পরও বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি থেকে সরে আসেনি। এমনকি অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের এই প্রত্যাবাসন প্রস্তাবের বাইরে রাখে। যুগপৎ এই প্রত্যাবাসনে ভুট্টো সায় দিলেও মাত্র ৫০ হাজার বিহারিকে ফেরত নিতে রাজি হয়। তবে ভুট্টো বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সদম্ভে ঘোষণা করে, ‘বাংলাদেশ যদি অভিযুক্ত পাকিস্তানিদের বিচার করে, তাহলে তিনি পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশের নাগরিকদের একই রকম ট্রাইব্যুনালে বিচার করবেন।’ ১৯৭৩ সালের ২৭ মে নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো বলেন, ‘বাঙালিদের এখানে বিচার করার দাবি জনগণ করবে। আমরা জানি, বাঙালিরা যুদ্ধের সময় তথ্য পাচার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হবে। কতজনের বিচার করা হবে, তা এখনই বলতে পারছি না। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করে, তাহলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ক্যু’র মাধ্যমে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সরকারের পতন ঘটাবে এবং দুই দেশের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে। এই চক্রান্তের জন্য ইতোমধ্যেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েক শীর্ষ কর্মকর্তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।’

ভুট্টোর এসব বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদ করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৩ সালের ৭ জুন নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ভোলা সম্ভব নয়। এই হত্যা, ধর্ষণ, লুটের কথা জানতে হবে। যুদ্ধ শেষের মাত্র তিন দিন আগে তারা আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। তারা প্রায় দুই লাখ নারীকে নির্যাতন করেছে, এমনকি ১৩ বছরের মেয়েকেও। আমি এই বিচার প্রতিশোধের জন্য করছি না। আমি এটা করছি মানবতার জন্য। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে বাঙালিদের বিচারের হুমকির প্রতিবাদ করে বলেন, 'এটা অবিশ্বাস্য। এই মানুষগুলো চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তা; যারা বাংলাদেশে ফেরত আসতে চায়, ওরা কী অপরাধ করেছে? এটা ভুট্টোর কী ধরনের প্রতিহিংসাপরায়ণতা।' কিন্তু ভুট্টোর কুমন্ত্রণা তাঁর আদ্যোপান্ত জীবনজুড়ে। তিনি ষড়যন্ত্রের জাল ছড়াতে থাকেন। পাকিস্তান সে দেশে আটক ১৯৫ শীর্ষ বাঙালি কর্মকর্তাকে বিচারের জন্য গ্রেফতার করে বলে ১৯৭৩ সালের ২৬ আগস্ট নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় সফরে যান যুগোশ্লাভিয়ায়। এ সময় পাকিস্তানি নোবেলজয়ী পরমাণুবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম এক পত্রে বঙ্গবন্ধুর জামাতা ড. এম ওয়াজেদ মিয়াকে জানান, তিনি বেলগ্রেডে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভুট্টোর একটা বৈঠকের আয়োজন করতে চান। পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব নাকচ করে দেন। প্রফেসর সালাম বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে পত্রে অনুরোধ জানান, 'শেখ সাহেবের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ যে তিনি যেন ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির মধ্যে শুধু ১৯৫ কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে বাকিদের বিনা শর্তে মুক্তি দেন। পরবর্তীতে ১৯৫ জনের বিচার করে ওদের থেকে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ফাঁসি দেওয়া যেতে পারে।'

বাংলাদেশ ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দেশীয় সহযোগীদের বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস, দালালদের বিচারের জন্য 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২' জারি করে। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশের নয়া সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয়। এতে ৪৭(৩) ধারা সংযুক্ত করা হয়। যাতে 'গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিত্বে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করার বিধান' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০ জুলাই জারি করা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ

(ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩। ফলে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাদের জন্য পাকিস্তানি সেনা এবং দেশীয় যুদ্ধাপরাধী রাজাকার, আলবদরদের বিচারের ব্যবস্থা নেওয়ার পথ সহজ হয়।

বাংলাদেশও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অনড় অবস্থানে থাকে। তবে ভারতের শিবিরে থাকা অন্য যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে অনাগ্রহী ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের বিপরীতে চীনের অবস্থান ভারতকে বিপাকে ফেলে। চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াতে ভারত তখন আগ্রহী নয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণেই। আন্তর্জাতিকভাবে যেমন, তেমনই অভ্যন্তরীণভাবেও ইন্দিরা সরকারের ওপর চাপ তৈরি হতে থাকে। যাতে ভারত দ্রুত সব যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিমলা চুক্তির সূত্র ধরে ভারত-পাকিস্তান দুই দফা বৈঠকে বসে। ১৯৭৩-এর জুলাইয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে এবং আগস্টে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইন্দিরার বিশেষ উপদেষ্টা পিএন হাকসার এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর একটি চুক্তি সই হয়। ভারতে আটক থাকা পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি এবং বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এই লোক বিনিময় শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বাকি ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিষয় চূড়ান্ত করবে। কিন্তু বাংলাদেশকে আলোচনায় না রাখায় দুটি বৈঠকে চুক্তি জোরালো হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, একমাত্র সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ এ ধরনের কোনো আলোচনায় বসতে পারে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এই চুক্তি সই হওয়ায় স্বভাবতই আশা করা হয়েছিল যে অতঃপর পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে; কিন্তু বাস্তবে স্বীকৃতিদান দূরের কথা, জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ঠেকিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তান ধরনা দেয় গণচীনের দরবারে। পাকিস্তানের প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহম্মদ পিকিং (বেইজিং) ছুটে যান এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে চীনা নেতাদের সঙ্গে দেনদরবার করেন। অতঃপর আজিজ আহমদ এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন, ‘পাকিস্তানি ১৯৫ যুদ্ধবন্দির বিচারের সিদ্ধান্ত বাতিল না করা পর্যন্ত পাকিস্তান ও চীন বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপ্রাপ্তির বিরোধিতা করে যাবে।’

১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট যে দিল্লি চুক্তি সই হয়, তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে বাংলাদেশকে ছাড় দিতে হয়। চুক্তিতে বলা হয়, পাকিস্তান বাঙালি 'গুপ্তচরদের' বিচার করবে না। আর যে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশ চিহ্নিত করেছে, তাদের বিচার হবে এবং বাংলাদেশেই হবে। তবে এ ব্যাপারে যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে, তবেই তা হবে। বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে তাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা এর পরও উল্লেখ করতে থাকে; কিন্তু এই চুক্তির ফলে একতরফাভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ আর থাকেনি। দিল্লি চুক্তি স্পষ্ট করেছিল, যুদ্ধাপরাধীদের আর বিচার হচ্ছে না। কারণ পাকিস্তান এ প্রশ্নে কখনোই বাংলাদেশের সঙ্গে সহমত ঘোষণা করতে চায় না। দিল্লি চুক্তিকে পাকিস্তানি সংবাদপত্র উপমহাদেশে নতুন সম্পর্কের সূচনা করবে বলে অভিমত জানায়। নিউ ইয়র্ক টাইমসের ২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বলা হয়, নতুন সম্পর্ক হয়তো এখনই শুরু হচ্ছে না; কিন্তু এ কথায় কোনো ভুল নেই যে এই তিন দেশের মধ্যে সম্পর্ক নতুন মোড় নিচ্ছে।

১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনকালে সৌদি বাদশাহর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বৈঠক করেন। বাদশাহ ফয়সাল দাম্ভিকতার সঙ্গে শর্তারোপ করেন যে বাংলাদেশকে সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে দেশটির নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' রাখতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, অবিলম্বে সব পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু বাদশাহকে কড়া জবাব দিয়ে যুদ্ধবন্দি সম্পর্কে বলেন, 'এটা তো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিষয়। এই দুটি দেশের মধ্যে এ ধরনের অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে। যেমন ধরুন, বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ পাকিস্তানি নাগরিককে সে দেশে ফেরত নেওয়া এবং পাকিস্তানে আটকে পড়া পাঁচ লক্ষাধিক বাঙালিকে বাংলাদেশে পাঠানো এবং বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থসম্পদ পরিশোধ করা। এমন বেশ কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে। আর এসবের মীমাংসা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধু বিনা শর্তে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে না। আর সৌদি আরবই বা এত উদ্গ্রীব কেন?' বঙ্গবন্ধুর কড়া ভাষ্য শুনে সৌদি বাদশাহ একটু রূঢ়স্বরে বলেন, 'শুধু এটুকু জেনে রাখুন, সৌদি আরব আর পাকিস্তান একই কথা। পাকিস্তান আমাদের সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু। যাহোক, আমার শর্ত দুটি বিবেচনা করে দেখবেন। একটা হচ্ছে, বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও অন্যটি বিনা শর্তে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি। আশা করি,

এরপর বাংলাদেশের জন্য সাহায্যের কোনো কমতি হবে না।' সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এবং পশ্চিমা অনেক দেশই যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিপরীতে অবস্থান নেয়। কিন্তু বাংলাদেশ তাদের বিচারের বিষয়ে তখনো অনড় অবস্থানে। বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধী ছাড়া বাকি যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যাবাসনে আপত্তি তোলেনি; কিন্তু পাকিস্তান যুদ্ধাপরাধীদের ছাড়া যুদ্ধবন্দিদের ফেরত নিতে আপত্তি বজায় রাখে। ভুট্টো জানতেন, যুদ্ধবন্দিদের ভারত এমনিতে ফেরত দিতে বাধ্য হবে। কারণ বেশিদিন ভরণপোষণ দিতে পারবে না। আর পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের নিরাপত্তা বা সুরক্ষার দায়িত্ব তার নেই। যদিও বেশির ভাগ বাঙালিই যুদ্ধের সময় থেকেই চাকরি হারাতে থাকেন। বেকারত্বের কারণে তাঁরা সহায়-সম্পদ সবই বিক্রি করতে বাধ্য হন। এসব তথ্য জেনে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ৮ মার্চ জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে এই করুণ অবস্থার অবসানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ১৯৭৩-এর ২৮ আগস্ট দিল্লিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈঠকটি হয় বাংলাদেশের সম্মতিতেই। বৈঠকে উভয় দেশ, 'দিল্লি চুক্তি' সই করে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে যুগপৎ প্রত্যাবাসন নিয়ে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। অন্যদিকে শর্তারোপ করা হয়, পাকিস্তান গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে আটক বাঙালিদের বিচার করবে না। তবে বাংলাদেশ সে দেশে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর যে বিচার করতে চায়, এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ঐকমত্য হলেই তবে বিচার হবে। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য তাঁর সরকারের দৃঢ়তার কথা বিভিন্ন পর্যায়ে তখনো বিবৃত করেছেন। কিন্তু এই চুক্তির ফলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার নামে প্রথম সপ্তাহেই ১৪৬৮ বাঙালি এবং এক হাজার ৩০৮ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির প্রত্যাবাসন ঘটে। বাংলাদেশ ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী ফেরত না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় পাকিস্তান দুই শতাধিক বাঙালিকে পণবন্দি হিসেবে জিম্মি করে রাখে। এসব সিদ্ধান্তের আগে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে ভুট্টো একটি নতুন প্রস্তাবও রেখেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল, 'পাকিস্তান তার যে কোনো যুদ্ধবন্দির বিচার ঢাকায় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে, কারণ অভিযুক্ত অপরাধ পাকিস্তানের একটি অংশেই ঘটেছে। সুতরাং পাকিস্তান নিজে বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এদের বিচারে আগ্রহী, যা আন্তর্জাতিক আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে।' (পাকিস্তান অ্যাফেয়ার্স, ১ মে ১৯৭৩)। কিন্তু টিক্কা খান পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান থাকাবস্থায় এসব যুদ্ধাপরাধীর বিচারে পাকিস্তানি প্রস্তাবে সন্দেহ পোষণ করে বাংলাদেশ।

তবে বাংলাদেশে যে বিচার করা সম্ভব হবে না, তা বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ তখন আটকে পড়া নির্যাতিতসহ সাধারণ বাঙালিদের দেশে ফেরত আনা জরুরি হয়ে পড়েছে অথচ এই বাঙালিদের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সঙ্গে। এক দোটানায় পড়ে যায় বাংলাদেশ। তথাপি যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার আগে পাকিস্তানের কাছে চারটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। প্রথমত, যুদ্ধাপরাধের জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ খোলা রাখা এবং তৃতীয়, সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্য, চীনসহ অন্যান্য দেশে পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা বন্ধ করা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদান। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নে শর্ত সাপেক্ষে ভুট্টোকে একক ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। ভুট্টো সংসদে বলেন, 'পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের দাবি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত কোনো স্বীকৃতি নয়।'

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ভাষণে বলেন, '১৯৫ যুদ্ধবন্দির মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে ফেরত না পাঠানো পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের শর্ত অপূর্ণই থেকে যাবে। আর জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের প্রশ্নই ওঠে না।' এর ১২ দিন পর ৩ অক্টোবর চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী চিয়ান জিয়ান হুয়া অধিবেশনে বলেন, 'জাতিসংঘের প্রস্তাব কার্যকরী করার পরেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে পারে। তার আগে কোনোক্রমেই নয়।'

দিল্লিতে ১৯৭৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বসে। বৈঠক শেষে তিন দেশীয় প্রতিনিধিরা এক যুক্ত ঘোষণায় বলেন, 'উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করে দেওয়া হবে।' অবশ্য এই যুক্ত ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রথম দলটি ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা পৌঁছে; কিন্তু এরপর প্রত্যাবাসন থেমে যায়। পাকিস্তান এ ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে অথচ যুক্ত ঘোষণায় ত্রিমুখী লোক বিনিময় যুগপৎ পরিচালিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ২২ অক্টোবর টোকিওতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বাংলাদেশ

পাকিস্তান থেকে প্রতিটি বাঙালি ফেরত নিচ্ছে; কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি নাগরিকদের বিপুলসংখ্যককেই পাকিস্তান নিচ্ছে না।' এর কদিন পরই ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিক বিহারিদের পাকিস্তান ফেরত নেবে না।' অথচ প্রায় পাঁচ লাখ বিহারির মধ্যে অধিকাংশই পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সে দেশে ফেরত যেতে আগ্রহী। বাংলাদেশের পক্ষে এদের ভরণপোষণ ভারবাহী হয়ে দাঁড়ায় গোড়াতেই।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনকালে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ও আটকে পড়া বাঙালিদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু বৈঠক চলাকালে সাংবাদিকদের জানান, 'পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বাঙালিদের দেশে ফেরাসহ অনেক বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন হবে। এই সম্মেলন শুরুর আগে, অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছি। আল্লাহর নামে এবং দেশের জনগণের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করছি।...আমি বলছি না যে এটি আমি পছন্দ করছি। আমি বলছি না আমার হৃদয় আনন্দিত। এটি আমার জন্য একটি আনন্দের দিন নয়; কিন্তু বাস্তবতাকে আমরা বদলাতে পারব না।' ভুট্টোর ঘোষণার আগের রাত, অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সৌদি আরব, মিসর, ইন্দোনেশিয়াসহ ৩৭টি মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উভয় দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হয়। তবে বাংলাদেশ তখনো ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচার থেকে সরে আসার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। লাহোর সম্মেলন থেকে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু জানালেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তিনি আপাতত স্থগিত রেখেছেন। তবে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান শীঘ্রই আলোচনায় বসবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

যেখানে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের জন্য অভিযোগ করেছে। ভুট্টো এই কমিশনের প্রতিবেদনে যেমন প্রকাশ করেননি, তেমনই ১৯৫ জনকে বিচারের মুখোমুখি করেননি। কারণ প্রধান আসামি কসাই টিক্কা খান তখন ভুট্টোর সেনাপ্রধান। দিল্লি চুক্তিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা থাকলেও ভুট্টো তা করেননি। অন্যদিকে চুক্তিতে আটকে পড়া বাঙালিদের দেশে ফেরত পাঠানোর উল্লেখও রয়েছে। ভুট্টো চুক্তির কোনোটিই আসলে কার্যকর করেননি। কারণ ভুট্টো বলেছিলেন,

চুক্তির আগে পাকিস্তান নিজে তার জাতীয় আইনের ভিত্তিতে তাদের বিচার করবে। ভুট্টো তো বাহাত্তর সাল থেকেই নিজে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু কথা রাখেননি। সময়টা ছিল বাংলাদেশের প্রতিকূলে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা নাজুক ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ছাড়া আর কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। এমনকি মুসলিম দেশগুলোও নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার মতো বাস্তব অবস্থা এবং উপকরণগত সহায়তাও বাংলাদেশের ছিল না।

সে সময় বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়, দুটি কারণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দিতে রাজি হন। প্রথমত, পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রায় চার লাখ বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা তাঁর প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে 'সম্পদ' হিসেবে গণ্য হবেন। তাছাড়া যুদ্ধবন্দি বিচারের ওপর প্রায় চার লাখ আটকে পড়া বাঙালি ও তাদের আত্মীয়স্বজনের জীবন-মরণ ও সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে। দ্বিতীয়ত, যেসব দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সহায়তা করেছে এবং সাহায্য দিয়েছে, তাদের মধ্যে ভারত ছাড়া আর প্রায় দেশই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার অনুরোধ জানিয়েছিল।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ভুট্টো জিম্মি করে রেখেছিলেন। আন্তর্জাতিক বিশ্ব এ বিষয়ে সেভাবে এগিয়ে আসেনি। ভারত এ ব্যাপারে পাকিস্তানের ওপর চাপ বহাল রেখেছিল; কিন্তু এই বাঙালিদের ফেরত আনার জন্যই সেদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দিল্লি চুক্তি অনুযায়ী তাদের বিচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। যদিও তাদের প্রায়জনই আর জীবিত নেই। কিন্তু মরণোত্তর বিচারকাজটি পাকিস্তানের করা উচিত তাদের নিজেদের স্বার্থে যেমন, তেমনই বিশ্বের শান্তির স্বার্থেও।

যুদ্ধাপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার নজির বিশ্বে আর নেই। কূটনৈতিক লড়াইটায় খোদ পাকিস্তান বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ও শরণার্থী কমিশন এবং রেডক্রস তাদের নিয়ে কাজ করে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তাদের শরণার্থী মর্যাদা দেওয়া হয়। রেডক্রস তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টার অংশ হিসেবে নাগরিকত্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করলে তারা নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক পরিচয় দিয়ে সে দেশে ফেরত যেতে চায়। সে সময় থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিহারিদের 'আটকে পড়া পাকিস্তানি' বলে অভিহিত করা হয়।

এদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ৬৬টি ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়। এর মধ্যে ঢাকার মিরপুরে ২৫টি, মোহাম্মদপুরে ৬টি ক্যাম্প। ১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস বিদায় নিলে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি এদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে জেদ্দাভিত্তিক সংগঠন রাবেতা আল আলম ইসলাম জরিপ চালায়। তারা তালিকাও প্রণয়ন করে। সর্বশেষ ২০০৩ সালে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার উর্দুভাষী পাকিস্তানি ৮১টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। এদের ফেরত নিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জিয়াউল হক সত্তরের দশকে একটি তহবিল গঠন করেছিলেন; কিন্তু তা ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ পুনর্বাসন থমকে থাকায় তা ব্যয় করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ক্যাম্পগুলো বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে চলছে।

১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী, ৫ লাখ ৩৯ হাজার ৬৬৯ জন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক দাবি করে সে দেশে ফিরে যেতে চায়। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় একাধিক চুক্তি করে। ইন্দো-পাক অ্যাগ্রিমেন্ট ১৯৭৩, জেদ ট্রাইপাটাইট অ্যাগ্রিমেন্ট অব বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, ১৯৭৫—এই চুক্তিগুলোর অন্যতম। ১৯৭৪ সালে তিন দেশের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ মাত্র তিন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের পাকিস্তানে ফেরত নিতে সম্মত হয়। চুক্তির আওতায় পাকিস্তান ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬৩৭ জনকে ফেরত নেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে মাত্র ১ লাখ ২৬ হাজার ৯৪১ জনকে ফেরত নেয়। বাকি ৪ লাখ ফেরত নেয়নি।

বাংলাদেশে উর্দুভাষীদের মূল সমস্যাটি নাগরিকসংক্রান্ত। তারা বাংলাদেশি না পাকিস্তানি ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দশকগুলোয় ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে কাজ করার জন্য অনেক উর্দুভাষী বিহার, ওড়িশা ও উত্তর প্রদেশ থেকে পূর্ববঙ্গে আসে। এদের বেশির ভাগই বিহারের। যারা প্রধানত, রেল পুলিশ, বিচারব্যবস্থা ও অন্য বেসামরিক পদগুলোয় যোগ দিয়েছিল। সৈয়দপুরে বৃহৎ রেল ওয়ার্কশপে কাজ করার জন্য ব্রিটিশরা বিহার থেকে ৭ হাজার জনকে নিয়ে এসেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও দাঙ্গার ফলে ১৩ লাখ মুসলিম অধিবাসী পূর্ব বাংলায় আসে। এর মধ্যে ১০ লাখ বিহারি। এদের মোহাজির অভিহিত করা হয়। পূর্ববঙ্গের

সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতার পাশাপাশি ভাষাগত ভিন্নতার মুখোমুখি হয় তারা। বাংলা ভাষা বা লিপি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এ কারণে এবং রাজনৈতিক নীতির কারণেও এরা বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে এড়িয়ে চলে এবং দৃঢ় গোষ্ঠীগত বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এমনকি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন থাকে। এরাই হিন্দুদের জমিজমা দখল করার জন্য ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটায়। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সহযোগী হয়ে গণহত্যায়ও অংশ নেয়। এরা আলশামস বাহিনী গঠন করেছিল।

১৯৯২ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দেয় যে ৩০০ বিহারি পরিবারকে পাকিস্তানে ফেরত নেওয়া হবে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে মাত্র ৫০ পরিবারকে ফেরত নেওয়ার পর প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ বিষয়টি উত্থাপন করলেও সন্তোষজনক কোনো সুরাহা হয়নি। আটকে পড়া সবাইকে ফেরত নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ পাকিস্তান উপেক্ষা করে আসছে। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারের সহযোগী বিহারিদের বাংলাদেশ জিম্মিও করেনি কিংবা যুদ্ধাপরাধের দায়ে তাদের বিচারের আওতায় আনেনি। এরা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মিরপুর দখলে রেখেছিল। মুখোমুখি সশস্ত্র প্রতিরোধে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তা মুক্ত করে। চিত্রনির্মাতা-সাহিত্যিক জহির রায়হান ওখানেই গোলাগুলিতে নিহত হন।

পাকিস্তান আটকে পড়া পাকিস্তানিদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের জন্য যে কমিটি করেছে, তারা বছর সাতেক আগে সুপ্রিম কোর্টে বলেছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৪ থেকে ৫ লাখ পাকিস্তানি আটকে পড়ে আছে। পাকিস্তান এদের ফেরত এবং দায়দায়িত্ব নেবে না। বাংলাদেশকেই এদের দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। বাংলাদেশ অবশ্য বলে দিয়েছে, একাত্তরপূর্ব সময়ে জন্মগ্রহণকারী পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে হবে।

১৯৯২ সালের ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গোলাম আযমের বিচার সম্পর্কে বিতর্ক হয়। বিএনপির মন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, রফিকুল ইসলাম মিয়াসহ বিএনপি সরকার পক্ষের কতিপয় সদস্য বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় রাজাকার ও পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'যেসব রাজাকারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ছিল, তাদের ক্ষমা করা হয়নি।' ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকে কেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা সংসদে আরও বলেন, পাকিস্তানে আটকে পড়া

৪ লাখ বাঙালিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই সরকারকে বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল।' শেখ হাসিনা এমনও বলেন, 'সেনাপতি নূরউদ্দিন খান, বিডিআর প্রধান আবদুল লতিফ, জেনারেল সালাম, মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, মাজেদুল হকসহ ৪ লাখ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় ছিল, তাঁদের পরিবার-পরিজনদের মাতমে সাড়া দিয়েই বঙ্গবন্ধু সেদিন যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি সেনাদের ছেড়ে দিয়ে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে এনেছিলেন। (সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ১৯৯১)।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে পেরেছিল। তেমনি ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিও পাকিস্তান ফিরেছিল বিনিময়ের মাধ্যমে; কিন্তু বিহারিদের আর বিনিময় হয়নি। দিল্লি চুক্তি রক্ষা করে পাকিস্তান ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকে বিচার করেনি যেমন, তেমনই বিহারিদের ফেরত নিচ্ছে না। বিশ্ব জনমতই পারে এ সমস্যার সমাধান করতে।

লেখক : মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

ডায়রিয়া : কারণ ও করণীয়

ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ

বাংলাদেশের রোগগুলোর মধ্যে ডায়রিয়া অন্যতম একটি। প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ এতে আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে শিশুদের ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার অনেক বেশি। রাজধানীর মহাখালীর আইসিডিডিআরবিতে প্রতিদিন গড়ে এক হাজারের বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছে। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় রোগী সামলাতে হাসপাতালের বাইরে অস্থায়ী তাঁবু টানিয়ে চিকিৎসা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর অনেকেই আবার কলেরায় আক্রান্ত। প্রতিষ্ঠানের ৬০ বছরের ইতিহাসে এত রোগীর চাপ আগে দেখা যায়নি। তবে বর্তমানে সারা দেশের বিভিন্ন শহরে-গ্রামেগঞ্জে ব্যাপক হারে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে।

ডায়রিয়া কাকে বলে? মনে রাখতে হবে পায়খানা নরম বা পাতলা হওয়া মানেই যে ডায়রিয়া হয়েছে, তা নয়। সারা দিনে তিনবার বা তার বেশি নরম বা পাতলা পায়খানা হলে তাকেই সাধারণত ডায়রিয়া বলা হয়। তবে কিছু কিছু রোগীর পানির মতো পাতলা পায়খানার সাথে রক্ত কিংবা মিউকাছ বা আম মিশ্রিত পায়খানাও হতে পারে। ডায়রিয়ার কারণ : ডায়রিয়া সংক্রমণের মূল কারণ সাধারণত বিশুদ্ধ পানি পান না করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার না খাওয়া। তাই সঠিকভাবে ব্যক্তিগত এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলাই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী। গত দুই বছরের বেশি হলো করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে জনগণ বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। এমনকি তারা ঘরে বন্দি জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। করোনাভাইরাস মহামারি শুরুর পর থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধসহ জনগণের চলাচল ও জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে, প্রচুর মানুষ শহর থেকে গ্রামে চলে গিয়েছিল। বর্তমানে করোনার সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে, জনগণের ভয়-ভীতি কেটে গেছে। এর সাথে স্বাস্থ্যবিধি পুরো শিথিল হয়ে যাওয়ায় জীবনযাত্রার অনেক কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এখন সব কিছু পুরোদমে চালু হয়ে গেছে। ফলে জনগণের বিরাট অংশ আর স্বাস্থ্যবিধি মানছে না। এটাও হঠাৎ ডায়রিয়া বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এবারে হঠাৎ করেই গরমের মাত্রাটা একটু বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই জনগণকে বাইরে বের হতে হচ্ছে, সর্বস্তরের লোকজন অর্থনৈতিক কারণে বা পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। গরমের কারণে প্রচুর

ঘাম হয় এবং শরীর থেকে পানি লবণ বের হয়ে যায়, দেহের ভেতরে পানির চাহিদা বেড়ে যায়। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ তৃষ্ণার্ত বা পিপাসার্ত হয়। তাই অনেকেই রাস্তাঘাটের তৈরি শরবত পান করে, যেমন–গুড়ের বা আখের বা লেবুর শরবত এবং অন্যান্য পানীয়, যা মোটেই বিশুদ্ধ নয়। এগুলো পান করেই মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে, এমনকি এর থেকে ফুড পয়জনিংও হচ্ছে। অনেকেই আবার রাস্তাঘাটের বা ফুটপাতের খাওয়াদাওয়া খেয়ে থাকে। এই খাবারগুলো প্রায়ই উন্মুক্ত বা খোলা থাকে। এগুলোতে মাছি, পোকামাকড় পড়ে, এমনকি ধুলাবালিসহ অন্যান্য দূষিত পদার্থও মিশ্রিত হয়। এ সমস্ত খাবার খেয়েও অনেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

নিজের ঘরের খাবারও যদি ৬-৭ ঘণ্টার বেশি ফ্রিজের বাইরে থাকে, তাহলে সেগুলো অনেকক্ষণ গরমে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য রোগ-জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হয়, তা খেয়েও ডায়রিয়া হতে পারে। করোনাকালে জনগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলত। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমে আসা এবং স্বাস্থ্যবিধি শিথিল হওয়ার সাথে সাথে জনগণের মাঝে ঘনঘন হাত ধোয়া এবং স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করার প্রবণতা কমে গেছে। এর ফলেও ডায়রিয়ার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। অনেক এলাকায়, বিশেষ করে বস্তিতে, রেললাইনের ধারে বা বাসাবাড়িতে নিম্ন আয়ের শ্রমিক শ্রেণির যারা বাস করে, তারা অনেকেই বিশুদ্ধ পানির অভাব বোধ করে। এমনকি টিউবওয়েলের পানিও দূষিত, অনেক এলাকায় পানির পাইপ ফুটা হয়ে স্যুয়ারেজ লাইনের সাথে মিশে গেছে। অনেকেই আবার পানি ফুটিয়ে পান করে না। এ সমস্ত দূষিত পানি পান করেই ডায়রিয়া বেড়ে যাচ্ছে। বাসাবাড়ির পানির ট্যাংক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করলেও রোগ-জীবাণু সংক্রমিত হয়ে যাওয়া পানি পান ডায়রিয়া অন্যতম কারণ।

বাসি খাবার, পচা খাবার, অস্বাস্থ্যকর জীবাণুযুক্ত খাবার, অনেকক্ষণ গরমে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার খেলে ফুড পয়জনিং হওয়ার কারণে ডায়রিয়া হতে পারে। খাওয়ার আগে হাত ভালোভাবে না ধোয়া এবং খাবারের জন্য ব্যবহৃত থালাবাটি ভালোভাবে না ধোয়ার ফলেও এ সমস্যা হতে পারে। ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যে নানা ধরনের পানিবাহিত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। অনেক ডায়রিয়া রোগীর পায়খানা পরীক্ষা করে কলেরার জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। পাতলা পায়খানা হলে যদি তা চাল ধোয়া পানির মতো হয়, তবে সেটা কলেরার লক্ষণ। এর সঙ্গে তলপেটে ব্যথা হওয়া,

বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, ঘন ঘন পায়খানায় যাওয়া এবং শরীর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া এ রোগের উপসর্গ। শিশুদের ডায়রিয়া সাধারণত রোটা নামক ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে।

ডায়রিয়ার লক্ষণ : ঘন ঘন পানির মতো পাতলা পায়খানা হওয়া, পায়খানা হলে দ্রুত টয়লেটে যাওয়া বা অপেক্ষা করতে না পারা, পায়খানা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারা। এমনকি অনেক সময় পোশাকে পায়খানা লেগে যেতে পারে। তলপেটে কামড় বা তীব্র ব্যাথা, বমি বমি ভাব–এমনকি অনেক সময় বমিও হতে পারে এবং আস্তে আস্তে পানিশূন্যতার কারণে শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে।

ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোনো রোগ-জীবাণুর কারণে ডায়রিয়া হলে আরও কিছু লক্ষণ থাকতে পারে, যেমন–পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া, জ্বর হওয়া, শরীর ব্যথা এবং প্রচণ্ড দুর্বল অনুভব করা, বমি হওয়া বা বমি বমি ভাব থাকা ইত্যাদি। তীব্র ডায়রিয়া হলে দেহ থেকে খুব দ্রুত প্রচুর পানি এবং ইলেকট্রোলাইট বেরিয়ে যায়। ফলে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। আর এই পানিশূন্যতা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে চলে গেলে এবং সময়মতো এই ঘাটতি পূরণ করা না হলে বা দ্রুত চিকিৎসা না করলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই ডায়রিয়ার প্রথম চিকিৎসা হলো পানিশূন্যতা পূরণ করা।

পানিশূন্যতার লক্ষণ : পানিশূন্যতার প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে মুখ শুকিয়ে আসা, পিপাসা লাগা, চোখ কোটরাগত, চামড়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, তৃষ্ণা বৃদ্ধি, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া। এক পর্যায়ে ব্লাড প্রেসার কমে যায়, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি এবং খুব দুর্বল নাড়ি পরিলক্ষিত হয়। প্রচণ্ড ক্লান্তি এবং রোগী নিস্তেজ হয়ে শকে চলে যেতে পারে।

ডায়রিয়ার চিকিৎসা : ডায়রিয়ার গুরুতর জটিলতা হলো পানিশূন্যতা, তাই শরীর থেকে বের হয় যাওয়া পানি ও লবণ দ্রুততম সময়ে পূরণ করতে হবে। রোগীকে খাওয়ার স্যালাইনের পাশাপাশি বেশি বেশি তরল খাবার, যেমন–ডাবের পানি, চিড়ার পানি, স্যুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে এবং স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। এক প্যাকেট স্যালাইন আধালিটার পানিতে গুলিয়ে খেতে হবে। বড়োদের (১০ বছরের বেশি বয়সি) ডায়রিয়া হলে প্রতিবার পায়খানার পর এক গ্লাস (২৫০ মিলি) খাওয়ার স্যালাইন খেতে হবে। শিশুদের ডায়রিয়া হলে প্রতিবার পায়খানার পর শিশুর যত কেজি ওজন, তত চা চামচ বা যতটুকু পায়খানা হয়েছে আনুমানিক সেই পরিমাণ খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

শিশু বমি করলে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে, যেমন–চার-পাঁচ মিনিট পর পর এক চা চামচ করে খেতে দিন। খাওয়ার স্যালাইনের পাশাপাশি অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাবে এবং শিশুকে কোনো অবস্থায়ই বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। ছয় মাসের অধিক বয়সি বাচ্চাকে খাওয়ার স্যালাইনের পাশাপাশি সব ধরনের স্বাভাবিক খাবার খাওয়াতে হবে। ডায়রিয়ার শুরুতেই কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া একদমই উচিত নয়। আবার অনেকে দ্রুত ডায়রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য ওষুধ খায়, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক, মেট্রোনিডাজল বা বমির ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে, তবে তা খেতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

<u>কখন হাসপাতালে নিতে হবে :</u> রোগীর অবস্থার উন্নতি না হলে বা বেশি খারাপ হলে, বেশি মাত্রায় বমি হলে, মুখে খেতে না পারলে, প্রচণ্ড পেটে ব্যথা ও পায়খানার সাথে রক্ত গেলে এবং ব্লাড প্রেসার কম, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। কলেরায় খুব দ্রুত শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি হয়। সে ক্ষেত্রে রোগী দ্রুত নিস্তেজ হয়ে এবং শকে চলে যেতে পারে। তাই কলেরার রোগীকে হাসপাতালে নিতে কোনোভাবেই দেরি করা যাবে না।

<u>ডায়রিয়া প্রতিরোধে করণীয় ও সতর্কতা :</u> অবশ্যই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, নিরাপদ ও ফুটানো পানি পান করতে হবে। অত্যধিক গরম আবহাওয়ার কারণে অধিক পিপাসা লাগাই স্বাভাবিক। চেষ্টা করতে হবে নিরাপদ পানি সাথে বহন করা। পানি টগবগ করে ফুটিয়ে সেই পানি পান করতে হবে এবং ফোটানোর ব্যবস্থা না থাকলে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে।

রাস্তার পাশে অনেক খোলা পরিবেশে লেবুর শরবত, গুড়ের শরবত, আখের রস, জুস বা ফল কেটে বিক্রি করা হয়। এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। রাস্তার পাশে, ফুটপাতে বিভিন্ন ধরনের খাবার বিক্রি করা হয়, এগুলো প্রায়ই খোলামেলা থাকে কীটপতঙ্গসহ ধুলাবালি এই খাবারগুলোকে দূষিত করে। উন্মুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিবেশন করা, এমন খাবার পরিহার করতে হবে। খাদ্যগ্রহণের আগে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। তৈরি করা খাদ্যসামগ্রী এবং পান করার নির্ধারিত পানি ঢেকে রাখতে হবে। নয়তো বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ খাবারে বসে জীবাণু ছড়াতে পারে।

পরিষ্কার পানিতে আহারের বাসনপত্র, গৃহস্থালি ও রান্নার জিনিস এবং কাপড়চোপড় ধোয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রয়োজনে সাবান ব্যবহার করতে হবে। ডায়রিয়া প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হচ্ছে খাবার প্রস্তুত, স্পর্শ করা, পরিবেশন করা ও খাবার খাওয়ার আগে, বাইরে থেকে ফিরে এসে হাত ধুয়ে নেওয়া। কারণ হাত দিয়েই মানুষ সব কিছু স্পর্শ করে এবং সবচেয়ে বেশি জীবাণু বহন করে।

অবশ্যই টাটকা এবং ভেজালমুক্ত খাবার খেতে হবে। অনেক দিন ফ্রিজে রাখা খাবার খাওয়াও ঠিক নয়। দুধ, কলা, ফলমূল বেশিদিন পুরনো হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেগুলো না খাওয়াই ভালো। পিতামাতা বা যেসব অভিভাবক শিশুকে খাওয়ান, তাঁরা শিশুকে খাওয়ানোর আগে এবং শিশুর মলত্যাগের অথ বা পায়খানা পরিষ্কার করার পর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। ফিডারে দুধ খাওয়ালে ফোটানো পানি ও সাবান দিয়ে ভালোভাবে ফিডারটি ধুয়ে নিতে হবে এবং ফিডারের নিপলের ছিদ্রটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে, শিশুরা বাইরে খেলাধুলা করে, যে কোনো জিনিস হাতে নিয়ে মুখে দেয়। তাই মাঝে মাঝে তাদের হাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

পায়খানার জন্য সব সময় স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করা উচিত। মলত্যাগের পরে টয়লেট থেকে বের হয়ে নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। রান্নাঘর ও বাথরুমের পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থা যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয়। যদি পানিসংক্রান্ত কোনো সমস্যা যেমন–পানিতে দুর্গন্ধ, ময়লা পানি আসা ইত্যাদি দেখা দেয়, তবে ওয়াসা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যোগাযোগ করে পানির বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। ছোটো-বড়ো সবার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাসহ হাতের নখ কেটে সব সময় ছোটো রাখা উচিত। যারা গ্রামে বসবাস করে, তাদের যেখানে-সেখানে বা পুকুর-নদীর ধারে মলত্যাগের অভ্যাস পরিহার করতে হবে। খালি পায়ে বাথরুমে বা মলত্যাগ করতে না গিয়ে স্যান্ডেল বা জুতা ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

<u>ডায়রিয়া নিয়ে কিছু ভুল ধারণা ও করণীয় :</u> মূলত গরমকালে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। ঠিকভাবে পানি ও লবণ পূরণ করা হলে এটি কখনো গুরুতর আকার ধারণ করে না। বেশির ভাগ ডায়রিয়া এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু ডায়রিয়া হলে ওরস্যালাইন, খাওয়া–এমনকি এর চিকিৎসা নিয়ে এখনো রয়ে গেছে কিছু ভুল ধারণা :

যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ, তাঁরা ওরস্যালাইন খেতে পারবেন কি না? উচ্চ রক্তচাপ আছে–এমন রোগীরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে ওরস্যালাইন খেতে বিভ্রান্তিতে ভোগেন। কেননা স্যালাইনে লবণ আছে। তাঁদের আশঙ্কা, ওরস্যালাইন খেলে রক্তচাপ বাড়তে পারে। এটি গুরুতর ভুল ধারণা। প্রতিবার পাতলা পায়খানার সঙ্গে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও লবণ বের হয়ে যায় এবং তা যথাযথ ভাবে পূরণ করা না হলে রোগীর পানিশূন্যতা, লবণশূন্যতা–এমনকি রক্তচাপ কমে গিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে মৃত্যুও হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে ওরস্যালাইন খেতে নিষেধ নেই।

ডায়াবেটিসের রোগীরা কি ওরস্যালাইন খেতে পারবেন না? ওরস্যালাইনে চিনি বা গ্লুকোজ থাকে, তাই ডায়াবেটিস রোগীরা ওরস্যালাইন খেতে ভয় পান। মনে করেন, ওরস্যালাইন খেলে ডায়াবেটিস বাড়তে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওরস্যালাইনে যে সামান্য চিনি বা গ্লুকোজ আছে, তা অন্ত্রে লবণ শোষণের কাজে ব্যয়িত হয়। সুতরাং ডায়রিয়ার সময় ডায়াবেটিস রোগীরা নির্দ্বিধায় ওরস্যালাইন খেতে পারবেন। কিডনি রোগীরা কি ডায়রিয়া হলেও মেপে পানি খাবেন? যাঁরা কিডনির জটিলতায় ভোগেন তাঁরা অনেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, কারণ স্বাভাবিকভাবে তাঁদের নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি মেপে খেতে বলা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ডায়রিয়ায় অধিক পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, ফলে পানিশূন্যতার ফলে কিডনি রোগ আরও বাড়তে পারে। সুতরাং প্রয়োজনে অতিরিক্ত তরল গ্রহণ করতে হবে। ডায়রিয়ার রোগীরা কি স্বাভাবিক খাবার খাবেন? অনেকেই বিভ্রান্তিতে ভোগেন, ডায়রিয়া হলে স্বাভাবিক খাবার খেতে পারবেন কি না। আসলে ঘরে তৈরি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত সব ধরনের স্বাভাবিক খাবারই খেতে মানা নেই। ভাত, মাছ, সবজি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সহজপাচ্য খাবার খেতে কোনো বাধা নেই। তবে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য না খাওয়াই ভালো। স্তন্যপানরত শিশুরা কোনো অবস্থাতেই বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করবে না। সারা দিনে এক প্যাকেট স্যালাইন খেলেই চলবে?

স্যালাইন কতটুকু খেতে হবে, তা নির্ভর করবে কতবার পাতলা পায়খানা হচ্ছে বা কতটুকু পানি হারাচ্ছেন তার ওপর। ডায়রিয়ার কারণে একজন মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এক-দেড় লিটারের বেশি পানি হারাতে পারেন। সবচেয়ে সহজ হিসাব হলো, প্রতিবার পায়খানা হওয়ার পর স্যালাইন খাওয়া এবং অল্প অল্প করে সারা দিন বারবার খাওয়া। এর বাইরে সারা দিন পানি ও তরল খাবার যেমন–স্যুপ, ডাবের পানি ইত্যাদি খেতে হবে। বমি বা পাতলা পায়খানা দ্রুত

বন্ধের জন্য ওষুধ সেবন প্রয়োজন কি না? অনেক সময় ফুড পয়জনিংয়ের কারণে বমি বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। মানুষ স্বভাবতই ফার্মেসি থেকে বমি বা পাতলা পায়খানা দ্রুত বন্ধের জন্য ওষুধ খান, যা একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না, কারণ পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে বরং কিছু সময় বমি ও পাতলা পায়খানার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পয়জন বের হয়ে যায়। অ্যান্টিবায়োটিক কি জরুরি? সব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক জরুরি নয়। প্রয়োজন হলো, দেহের লবণ ও পানিশূন্যতা পূরণ। দরকার হলে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যেতে পারে।

শিরায় স্যালাইন নিতেই হবে। অনেকে শিরায় স্যালাইন নিতে ভয় পান; কিন্তু ডায়রিয়ায় মাত্রা যদি তীব্র হয় তাহলে শুধু মুখে স্যালাইন পান করে শরীরে সৃষ্ট পানিশূন্যতা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে প্রয়োজনে শিরায় স্যালাইন নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডায়রিয়া থেকে বাঁচার মূলমন্ত্র প্রতিকার এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসহ সচেতন থাকা।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

পদ্মা সেতু আমাদের জাতীয় সক্ষমতার প্রতীক

ড. আতিউর রহমান

বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই আমাদের স্বপ্নের মিনার যে পদ্মা সেতু তার কাজ শেষ হয়েছে। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে ক্ষণগণনা করছে এ দেশের আপামর জনতা। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বাস্তবে রূপায়িত হওয়া এই স্বপ্নের প্রকল্পটি কেবল সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোই নয়, একে বলতে হবে আমাদের জাতীয় সক্ষমতার অনন্য প্রতীক। কোটি কোটি বাঙালির মনে মনে থাকা 'আমরাই পারি'–এই শব্দযুগলের মূর্ত প্রতীক হয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে সদ্যঃসমাপ্ত পদ্মা সেতু। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে এ দেশের মানুষের নিজস্ব শক্তি আর সক্ষমতার ওপর সবচেয়ে বেশি যিনি আস্থা রেখেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকল চ্যালেঞ্জের মুখেও অবিচল ও আপসহীন থেকে তিনিই এই স্বপ্নের সেতুর কাজ শেষ করায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। পদ্মা সেতুর নাম এলেই এর পেছনে তাঁর এমন অবিচল নিষ্ঠা ও আপসহীনতার প্রসঙ্গ আসবে আরও বহুকাল। সরকারপ্রধান হিসেবে দেশের মানুষের আত্মশক্তির ওপর তাঁর এমন আস্থা দেখে বারবার মনে পড়ে যায় বঙ্গবন্ধুর কথা। বঙ্গবন্ধুই আমাদের মধ্যে এমন আত্মশক্তির বীজ বুনে গেছেন। সেই জোরেই আমরা আজ এতটা পথ পাড়ি দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। সেই বিচারে পদ্মা সেতুকে আপসহীন গণমুখী নেতৃত্বের পরম্পরার ফসল হিসেবেও দেখা যায়।

বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিল এ দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের আত্মশক্তির ওপর ভর করে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তাই তাঁর ডাকে পুরো জাতি এক হয়ে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করেছিল। স্বাধীন দেশে 'যুদ্ধের ছাইভস্ম থেকে সমৃদ্ধির পথে' এক নতুন অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দেশের দায়িত্বভার যখন তিনি কাঁধে নেন তখন তাঁর হাত শূন্য। শূন্য হাতে দেশ গড়ার কাজ হাতে নিয়েছিলেন দেশবাসীর আত্মশক্তির ওপর ভরসা রেখেই। তাই বিদেশি সহায়তার জন্য কখনো কোনো আপস করেননি। তাই বিশ্ব মোড়লরা যখন খাদ্য সহায়তা নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিল তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে বিশ্বব্যাংকের তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কারগিল বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন পাকিস্তান আমলে সরকারের যে ঋণ ছিল তার

দায় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকেও নিতে হবে। তা না হলে খাদ্য সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। যেহেতু পাকিস্তান আমলে পাওয়া বিদেশি সহায়তা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানেই বিনিয়োগ করা হয়েছিল। তাই বিশ্বব্যাংকের এই দাবি মেনে নিতে পারেননি বঙ্গবন্ধু। তাই কারগিলকে সেদিন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে দরকার হলে বাংলাদেশের মানুষ ঘাস খেয়ে থাকবে, তবু খাদ্য সহায়তার আশায় অন্যায়ের সাথে আপস করবে না। বঙ্গবন্ধুর এহেন আপসহীনতায় শেষ পর্যন্ত উন্নয়ন সহযোগীরা তাদের অন্যায় দাবি থেকে সরে এসেছিল। স্বাধীনতার পরপরই এভাবে বিশ্ব মোড়লদের সামনে বাঙালিকে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে পরিচিত করে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

সেই আত্মমর্যাদাশীল জাতির পরিচয় নিয়ে আজও আমরা ন্যায্যভাবেই গর্বিত হই। আজ আমাদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। তাই এ দেশেরই কিছু তথাকথিত আলোকিত মানুষের চক্রান্তে বিশ্বব্যাংক যখন পদ্মা সেতু নির্মাণে দুর্নীতি হচ্ছে–এমন অন্যায় অভিযোগ আনে তখন তা আমরা মেনে নিইনি। পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য ১.৪ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য দেওয়ার যে আয়োজন বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে উন্নয়ন অংশীদাররা করেছিল তা অযথাই এক নোংরা বিতর্কের মাঝে পড়ে যায়। তখনো কোনো আন্তর্জাতিক ঠিকাদার নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কারিগরি কমিটি শর্টলিস্ট করা ঠিকাদারদের প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল। কোথাও কোনো কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়নি। এমন সময় বিশ্বব্যাংকের ইন্টিগ্রিটি বিভাগের পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে অভিযোগ করা হলো যে এই প্রকল্পে দুর্নীতি করা হচ্ছে। এ জন্য তৎকালীন সেতু মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিদের কম হয়রানি করা হয়নি। বিশ্বব্যাংকের এই বাড়াবাড়ির জবাবে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন যে এই প্রকল্পের অর্থায়ন স্বদেশের অর্থেই করা হবে। এটিই ছিল সে সময়ে সবচেয়ে সমুচিত জবাব। পরবর্তী সময়ে কানাডার আদালত রায় দেন যে এই প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি হয়নি। আর শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আজ যখন পদ্মা সেতুর কাজ শেষ হয়েছে তখন গোটা বিশ্বই দেখতে পাচ্ছে কী করে বাংলাদেশের মানুষ তাদের দেশ ও দেশের নেতৃত্বকে অন্যায় অপবাদ দেওয়ার বদলা নেয়।

আত্মশক্তিতে বলীয়ান বঙ্গবন্ধুকন্যার বিচক্ষণ নেতৃত্বে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন আসলে আমাদের সক্ষমতার বাংলাদেশের নয়াদিগন্ত উন্মোচনের দিন হিসেবে যুগের পর যুগ পালিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত (বিশেষত অগ্রণী ব্যাংক) এই মেগা প্রকল্পের পুরো

বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করেছে। আর এই বিদেশি মুদ্রা মূলত আমাদের দেশপ্রেমিক পরিশ্রমী প্রবাসী ভাই-বোনেরাই আয় করে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠিয়েছেন। পোশাকশিল্পে কর্মরত কৃষককন্যাদের পরিশ্রমের ফসল রপ্তানি আয়ও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। সাড়ে সাত বছর ধরে প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও কভিড-১৯-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এই সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আমাজন নদীর পরেই খরস্রোতা পদ্মার ওপর ১২৮ মিটার দীর্ঘ গভীরতম পাইলিং করে পদ্মা সেতুর দ্বিতল কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। এই সেতুর ওপরতলা দিয়ে যানবাহন এবং নিচের তলা দিয়ে রেল চলবে। একই সঙ্গে নিচের তলায় রয়েছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের লাইন। প্রযুক্তির বিস্ময়কর ব্যবহারে গড়ে ওঠা পদ্মা সেতুর জন্য সিমেন্ট, রড ও অন্যান্য উপকরণের বেশির ভাগই জুগিয়েছে বাংলাদেশের শিল্প খাত। আন্তর্জাতিক ঠিকাদারদের পাশাপাশি আব্দুল মোনেম গ্রুপের মতো স্বদেশি ঠিকাদাররাও অসাধারণ অবদান রেখেছেন এই সেতু নির্মাণে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকৌশল বিভাগের সমন্বয় ও কর্মতৎপরতাও ছিল দেখার মতো।

প্রমত্ত পদ্মা যুগের পর যুগ দক্ষিণ বাংলার ২১টি জেলার অর্থনীতিকে বাংলাদেশের মূলধারার অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কৃষিপণ্যসহ অন্যান্য পণ্য দিনের পর দিন ফেরিঘাটে পড়ে থাকত। অনেক পণ্য পচে যেত। সহজে মুমূর্ষু রোগীকেও প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করানো যেত না। দক্ষিণ বাংলার রাস্তাঘাট হয়তো এখন আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে; কিন্তু কানেক্টিভিটি না থাকায় এগুলোকে দক্ষভাবে ব্যবহার হচ্ছিল না। তাই এই এলাকায় কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। ছোটো ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসায়ী উদ্যোগও তাই সীমিতই থেকে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমনিতেই দক্ষিণ বাংলার উপকূলের মানুষজন দারুণ অর্থনৈতিক চাপে রয়েছে। দেশের গড় দারিদ্র্যের হার থেকে অন্তত ৫ শতাংশ বেশি এই অঞ্চলে। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান নেই এখানে। তাই জলবায়ু শরণার্থীরা ঢাকা বা চট্টগ্রামে খুবই কষ্টে জীবন ও জীবিকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে থাকে। অথচ পদ্মা সেতুটি যদি আরও আগে করা যেত তাহলে যমুনার ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির যে উন্নতি (জিডিপিতে বছরে ২ শতাংশ যোগ হচ্ছে) হয়েছে, তা দক্ষিণ বাংলাতেও হতে পারত।

বঙ্গবন্ধুকন্যা পদ্মার ওপারের মানুষ। তাই দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিজের চোখে দেখেছেন। এসব নিয়ে বেশ কয়েকটি বইও তিনি লিখেছেন। তাই পদ্মা সেতু নির্মাণে তিনি ছিলেন আপসহীন। বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে যে লড়াকু

মন দিয়ে গেছেন তার অনেকটাই বঙ্গবন্ধুকন্যাও পেয়েছেন। তাই জনগণের মঙ্গল হবে, এমন প্রকল্প গ্রহণে তিনি এতটা মরিয়া। জেদি। অঙ্গীকারবদ্ধ। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর মতোই স্বউন্নয়নে তিনি নিবেদিত প্রাণ। আমি পদ্মা সেতু উপাখ্যানের শুরুর দিনগুলোতে তাঁর খুব কাছে থেকেই দেখেছি তিনি কতটা সাহসী এবং আত্মসম্মানে বলীয়ান। কেননা তিনি যে অনেক দূরে দেখতে পান। ঠিকই তিনি অনুভব করেছিলেন এই সেতু শুধু দক্ষিণ বাংলা নয়, পুরো বাংলাদেশের উন্নয়নের ল্যান্ডস্কেপই বদলে দেবে। তাই পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের আগ দিয়ে জনমনে যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেছে তা মোটেও অনভিপ্রেত ছিল না। তাই যখন গণমাধ্যমে দেখতে পাই একজন জসিমউদ্দীন ষোলো হাজার টাকায় আইসিইউ সুবিধাসম্পন্ন অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁর মুমূর্ষু সন্তানকে পদ্মা সেতু দেখাতে নিয়ে যান তখন আর অবাক হই না। চ্যানেল একাত্তরে যখন এই প্রতিবেদনটি দেখানো হচ্ছিল তখন দেশে এবং বিদেশে সঞ্চালকের মতোই মানুষের চোখে পানি ধরছিল না তার হিসাব কজনই বা রাখেন। একইভাবে চ্যানেল সময়ের রাশেদ বাপ্পী যখন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে তাঁর ‘স্বপ্নযাত্রা’ সিরিজটি দেখিয়েছেন তখন সহজেই বোঝা গেছে দক্ষিণ বাংলার মানুষগুলোর আরও সুন্দর জীবনযাপনের স্বপ্নের তল কতটা গভীর। ওই প্রতিবেদন থেকেই জানতে পারি ফরিদপুরের কৃষকরা আশা করছেন পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর এই অঞ্চলে নতুন কলকারখানা তৈরি হবে। তাঁদের উৎপাদিত পাটের চাহিদা বাড়বে। সোনালি আঁশ তাঁদের সোনালি স্বপ্নপূরণে সারথি হবে। ৭০ মিনিটে ঢাকা যেতে পারবে ফরিদপুরের মানুষ। এ যেন ‘স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে’ একজন জানালেন। তাঁদের ধারণা, পদ্মা সেতু তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করবে। একইভাবে খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশালের মানুষের মনে কত স্বপ্নই না ভর করেছে। কুষ্টিয়ার কুমারখালীর গামছাপল্লির তাঁতিরা মনে করছেন, তাঁদের কাঁচামাল সংগ্রহ সহজ হবে। উৎপাদিত পণ্যও দ্রুত কম সময়ে ঢাকা ও অন্যান্য বাজারে নেওয়া যাবে। কবিগুরুর কুঠিবাড়ি পর্যটকে ভরে যাবে। লালন শাহের আখড়া, কাঙ্গাল হরিনাথ, মীর মশাররফ হোসেনের স্মৃতিধন্য কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গন সক্রিয় হয়ে উঠবে পদ্মা সেতুর কল্যাণে যাতায়াতব্যবস্থা সহজ হওয়ার কারণে। শুধু ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে কেন, প্রিন্ট মিডিয়াতেও খবর বের হয়েছে জনগণের উচ্ছ্বাসের। ‘স্বপ্ন বুনছেন পদ্মাপারের মানুষ’ শিরোনামে দৈনিক আমাদের সময়ে ২১ মে, ২০২২ সানাউল হক সানি স্থানীয় অর্থনীতিতে এই সেতুর প্রভাব কতটা গভীরভাবে পড়বে, তা স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। জাজিরার নাওডোবা এলাকার ক্ষুদে দোকানদার ইব্রাহিম হাওলাদার পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর তাঁর মোটর মেকানিক সন্তানকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসবেন তাঁর গ্রামে।

তাকে তিনি গ্যারেজ করে দেবেন। সুখে-দুঃখে স্বজনদের সাথেই একসঙ্গে সেও থাকবে। জাজিরা কাজিরহাট বাজারের ব্যবসায়ী মোস্তফা কামাল জানিয়েছেন, শিল্প-কারখানার জন্য উদ্যোক্তারা কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনেছেন। স্থানীয় মানুষজনও নানামুখী ব্যবসায়ী উদ্যোগ নিচ্ছেন। জাজিরা পৌরসভার রেজাউল করিম ঢাকায় কারখানায় কাজ করেন। তিনি এই বাজারে ফিরে এসে নিজেই কারখানা গড়ে তুলবেন। নড়িয়া উপজেলা মধ্যপ্রাচ্যফেরত আশরাফুল আর বিদেশে যাবেন না। দ্রুত গড়ে ওঠা হিমাগারের ম্যানেজারের কাজ পেয়ে গেছেন। এই প্রতিবেদন থেকেই জানা গেল জাজিরা, নড়িয়া, ভাঙ্গাসহ অনেক স্থানেই বড়ো শিল্পগ্রুপ জমি কিনে রেখেছে। এরই মধ্যে পার্ক-রিসোর্ট তৈরি হচ্ছে। শরীয়তপুরের তোসাইহাটে তৈরি হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। জাজিরা উপজেলার নাওডোবায় দেশের সর্ববৃহৎ তাঁতশিল্প 'শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি' গড়ে উঠছে ১০ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। কর্মরত তাঁতিদের জন্য ৮ হাজার ৬৪টি তাঁত শেড নির্মাণ হতে যাচ্ছে তাঁতিদের আবাসনের জন্য। এই তাঁতপল্লিতে বছরে ৪.৩১ কোটি মিটার কাপড় তৈরি হবে। এই এলাকার কৃষক আলতাফ মিয়া যথার্থই বলেছেন, 'হঠাৎ পুরো এলাকাটাই বদলে গেল।... এখনই পদ্মা সেতু দেখতে পর্যটকরা ভিড় করছেন আমাদের এলাকায়।' এই এলাকায় গড়ে উঠছে আইটি পার্ক। সত্তর একর জায়গায় গড়ে উঠছে হাইটেক পার্ক। আরও গড়ে উঠছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিশু পার্ক, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ, অলিম্পিক ভিলেজ, বিসিক শিল্প পার্ক, বিশাল হাউজিং প্রকল্প, যখানে লাখখানেক মানুষের আবাসন হবে। জাজিরা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পদ্মা সেতু দিয়ে দ্রুত কৃষিপণ্য ঢাকাসহ অন্যান্য বাজারে যাবে বলে কৃষকরা ন্যায্য দাম পাবেন। চরাঞ্চলেও লেগেছে নগরায়ণের ছোঁয়া। গড়ে উঠছে শিল্প-কারখানা। বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগ। পদ্মা সেতুতে মানুষের উচ্ছ্বাস কতটা প্রবল তার খবর দিয়েছে কালের কণ্ঠ (৪ জুন' ২০২২)। পদ্মা সেতু বা ব্রিজ গুগল করলে আড়াই কোটি খবর ও ভিডিও হিট করে বলে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এসব টুকরো টুকরো তথ্য থেকেই অনুমান করতে পারি পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব কতটা হতে পারে। অর্থনীতিবিদরা মডেলিং করে দেখিয়েছেন যে পদ্মা সেতু চালু হলে বছরে ১.২৬ শতাংশ জাতীয় জিডিপিতে যুক্ত হবে। ২১ জেলার আঞ্চলিক জিডিপিতে যুক্ত হবে ৩.৫০ শতাংশ। রেল চালু হলে জাতীয় জিডিপিতে আরও ১ শতাংশ যুক্ত হবে। ভুটান, নেপাল ও ভারতের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়বে। মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের সচলতা বাড়বে। তাদের আশপাশে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে। খুলনা, বরিশালে জাহাজ

ভাঙা ও নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠবে। শুধু বরিশালেই এক হাজারের মতো ক্ষুদে ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠবে। কুয়াকাটা, ষাট গম্বুজ মসজিদ, বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ, কবিগুরুর কুঠিবাড়ি, লালনের আখড়া, সুন্দরবনে পর্যটকদের ঢল নামবে। দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিবছর অন্তত দুই লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বছরে ১ শতাংশেরও বেশি দারিদ্র্য কমে আসেব। অনেকেই ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় ফিরবে। মোট শ্রমশক্তির ১.২ শতাংশের কর্মসংস্থান ঘটবে। আরও সহজ করে বলা যায়, আগামী পাঁচ বছরে ১০ লাখ, অর্থাৎ বছরে দুই লাখ মানুষের নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। ১০ বছর পর এই সংখ্যা তিন গুণ হয়ে যাবে। এশীয় হাইওয়ে ও রেলওয়ের সাথে যুক্ত হবে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে। আমরা চাইলেই পদ্মা সেতুর দক্ষিণাঞ্চলে কিছু সরকারি অফিস (যেমন বিআরটিএ) নিয়ে যেতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, বিমানবন্দর, আন্তর্জাতিক কনভেনশন হল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিশ্চয়ই আমরা নিতে পারি। এর ফলে ঢাকার ওপর বাড়তি নগরায়ণের চাপ কমবে। সেজন্য ফরিদপুরসহ (পদ্মা বিভাগ) বিভাগীয় শহরগুলোকে আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। এই অঞ্চলে শিল্পায়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য স্টার্টআপ তহবিলসহ বিশেষ কর সুবিধা ও অর্থায়নের সুযোগ অবশ্যই দিতে পারি।

নিঃসন্দেহে পদ্মা সেতু আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথনকশায় এক নতুন আশা-সঞ্চারী মাইলফলক। পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার ও মর্যাদার প্রতীক। বিশ্বাসের আত্মশক্তির প্রতীক। 'আমরাও পারি' আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। এই সেতুর সাথে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বের ছোঁয়া লেগে আছে। এই বন্ধন যুগে যুগে আরও পোক্ত হবে। বিরাট হবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের এই দুঃসময়ে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার এক নয়া বার্তা দেবে বিশ্বকে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থাতে আমাদের সামনেও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির হচ্ছে। করোনা সংকট এখনো পুরোপুরি কাটেনি। দেশব্যাপী খাদ্য মূল্যবৃদ্ধির চাপ রয়েছে। এর মধ্যে বন্যার আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছে। এত সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। স্বপ্ন দেখছি দুই দশকেরও কম সময়ের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরের। এমন সাহসের পেছনে কাজ করছে এ দেশের পরিশ্রমী মানুষ আর অর্থনৈতিক সক্ষমতার ট্র্যাক রেকর্ড। সেই জাতীয় শক্তিরই প্রতীক এই পদ্মা সেতু। এই স্বপ্নের সেতুটি থেকে আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাধা পেরিয়ে সফল হওয়ার অনুপ্রেরণা পাব।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি

জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক, সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও এবং সর্বোপরি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্থসামাজিক, জনতাত্ত্বিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, স্থুল জাতীয় উৎপাদন, মূল্যস্ফীতি, জাতীয় আয় নিরূপণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অফিশিয়াল পরিসংখ্যান প্রস্তুত, সংকলন ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়মিতভাবে পালন করে আসছে। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত শুমারিসমূহের মধ্যে জনশুমারি ও গৃহগণনা দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

জনশুমারি ও গৃহগণনা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই পরিচালিত ব্যাপকভিত্তিক পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম। ২০১৩ সালে পরিসংখ্যান আইন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত এ শুমারিটি 'আদমশুমারি ও গৃহগণনা' নামে পরিচতি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম। আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে ১০ বছর পর্যাবৃত্তি অনুসরণপূর্বক দেশের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা। যথাক্রমে ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে তা আগামী ১৫-২১ জুন, ২০২২ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর মাধ্যমে মূলত দেশের প্রতিটি গৃহ, খানা ও ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হবে। শুমারির সামগ্রিক কার্যক্রম চারটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে, যথা : শুমরির প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড মূল শুমারি পরিচালনা শুমারি-পরবর্তী যাচাই জরিপ (পিইসি) পরিচালনা এবং আর্থসামাজিক ও জনতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স তারিখে প্রতিটি খানা ও খানার সদস্যগণকে গণনার অন্তর্ভুক্ত করে দেশের মোট জনসংখ্যার হিসাব নিরূপণ; ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার নিমিত্ত বেঞ্চমার্ক তথ্য সংগ্রহ করা; সকল ধরনের খানাভিত্তিক আর্থ-সামজিক জরিপের জন্য নমুনা ফ্রেম (Integrated Multi-Purpose Sample- IMPS) প্রস্তুত করা; জেলাভিত্তিক জনসংখ্যা

প্রক্ষেপণ (Population Projection) করা; স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণের জন্য তথ্য সরবরাহ করা; জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ করা।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানাবেষ্টিত অঞ্চলের সকল গৃহ, সাধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও বস্তি খানা, ভাসমান জনগোষ্ঠী, খানায় বসবাসরত সকল সদস্যের জনমিতিক ও আর্থসামাজিক তথ্য, যেমন–গৃহের সংখ্যা ও ধরন, বাসস্থানের মালিকানা, খাবার পানির প্রধান উৎস, টয়লেটের সুবিধা, বিদ্যুৎ সুবিধা, রান্নার জ্বালানির প্রধান উৎস, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বৈদেশিক রেমিট্যান্স, খানা সদস্যদের বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, প্রতিবন্ধিতা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার, ব্যাংক/মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতীয়তা, নিজ জেলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

এবারের শুমারিতে GIS (Geographic Information System) বেইজড ডিজিটাল ম্যাপ ব্যবহার করে CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) পদ্ধতিতে ডিজিটাল ডিভাইস ‘ট্যাবলেট’-এর মাধ্যমে একযোগে দেশের সকল খানা, গৃহ ও জনসাধারণের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। মাঠপর্যায়ে মূল শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী ১৫-২১ জুন, ২০২২ সময়ে পরিচালিত হবে। উক্ত সময়ে সাময়িকভাবে নিযুক্ত তথ্যসংগ্রহকারী (প্রায় ৩.৭০ লক্ষ), যারা স্থানীয় শিক্ষিত যুবক/যুব মহিলা প্রতিটি খানা ও জনসাধারণের তথ্য ট্যাবলেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। ডিজিটাল এ শুমারি বাস্তবায়নে সারা দেশে একযোগে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হবে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ট্যাবলেট। এর পাশাপাশি IT Infrasrtucture যেমন : CAPI Apps, ক্লাউড সার্ভার, ওরাকল এক্সাডাটা সার্ভার, লোড ব্যালেন্সার, ১০ Gbps ইন্টারনেট, ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল ইত্যাদি প্রস্তুত ও ইনস্টল করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত ট্যাবলেটসমূহ MDM (Mobile Device Management) software ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেডের (বিডিসিসিএল) TIER IV Security সমৃদ্ধ ডাটা সেন্টার ব্যবহার করা হবে। মাঠ পর্যায় থেকে বিডিসিসিএল হয়ে বিবিএস সার্ভারে ডাটা আসার পূর্ব পর্যন্ত সকল পর্যায়ে ডাটা encrypted অবস্থায় থাকবে; যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের

অগ্রগতি মনিটর করার জন্য শুমারি পর্যবেক্ষণ অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দৈনন্দিন তথ্য সংগ্রহের পরিমাণ যে কোনো পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা যাবে, যা নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ফলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সহজতর হবে এবং স্বল্পতম সময়ে শুমারির রিপোর্ট প্রকাশ সম্ভব হবে। শুমারি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক Integrated Census Management System (ICMS) প্রস্তুত করা হয়েছে। শুমারি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পুরো দেশকে ১৬৩টি শুমারি জেলা, ৩৮০১টি জোন ও ৩৮০৯৪৫টি গণনা এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। এ শুমারিতে প্রথমবারের মতো স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে প্রতিটি প্রশাসনিক এলাকা ও গণনা এলকার জন্য ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শুমারি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ওয়েববেইজড জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করে শুমারির সকল প্রশাসনিক স্তরের তথ্য স্বল্পতম সময়ে প্রকাশ ও প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।

প্রায় প্রতিটি গণনা এলাকার জন্য স্থানীয় শিক্ষিত যুবক/যুব মহিলাগণের মধ্য হতে ০১ (এক) জন গণনাকারী এবং ৫-৬ জন গণনাকারীর জন্য ০১ (এক) জন সুপারভাইজার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের (গড়ে ১২০ জন) কার্যক্রম তদারকির জন্য ০১ (এক) জন জোনাল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যারা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য দপ্তরের নিয়মিত কর্মচারী। জোনাল অফিসারদের কার্যক্রম তদারকির জন্য উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী, উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীর কার্যক্রম তদারকির জন্য জেলা শুমারি সমন্বয়কারী, জেলা শুমারি সমন্বয়কারীর কার্যক্রম তদারকির জন্য বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সকল পর্যায়ের সমন্বয়কারীগণ বিবিএসের সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা। অর্থাৎ শুমারির গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে ০৬ স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গণনাকারী থেকে বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী পর্যন্ত সকলের জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক GIS (Geographic Information System) বেইজড ডিজিটাল ম্যাপ ইতোমধ্যে প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়েছে।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এ দেশের সকল জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৭ জুন ২০২২ তারিখে শুমারির স্মারক ডাকটিকিট

অবমুক্ত করেছেন। শুমারির প্রাক্কালে যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করবেন, যা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। শুমারির প্রথম দিন জাতীয় দৈনিকসমূহে এতদ্বিষয়ক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। প্রচারের অংশ হিসেবে TV স্ক্রলিং, TVC (Television Commercial), RDC (Radio Commercial), PSA (Public Service Announcement), ডকুড্রামা, জিঙ্গেল ইত্যাদি টেলিভিশন ও বেতারে সম্প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া প্রথাগতভাবে র‌্যালি, মাইকিং, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই শুমারিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা, অধিদপ্তরের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন (বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) ও জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিগত ১০ বছরে জনসংখ্যা ও দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের সার্বিক চিত্র ফুটে উঠবে, যা পরবর্তী ১০ বছরের যে কোনো ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক : সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পদ্মা মহাসেতু : জাতীয় প্রত্যয়, শৌর্য এবং অগ্রযাত্রার সোপান

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

প্রমত্তা পদ্মাকে নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষ শত শত বছর ধরে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে আসছে। পদ্মাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সুখজাগানিয়া গান যেমন আছে, খরস্রোতা পদ্মার ভাঙন ও দুর্ঘটনার বিষাদ স্মৃতিও রয়েছে। পদ্মার একূল ভাঙে ওকূল গড়ে, আবার এই পদ্মায় ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ভাসে, যার স্বাদ নিতে মানুষ মুখিয়ে থাকে। পদ্মা বাংলা ও বাঙালির জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস হয়ে আছে। আবার এই পদ্মাই এপার-ওপারের মানুষের জীবনকে বিভাজিত করে রেখেছিল। সে কারণেই শুধু পদ্মাপারের মানুষই নয়, দুই অঞ্চলের মানুষজনও দেখা-সাক্ষাৎ ও যাতায়াত করতে পারছিল না সহজে কিংবা ইচ্ছেমতো। একসময় নৌকা, পরবর্তীকালে স্টিমার আর ফেরি ছাড়া, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চলের তথা গোটা দেশের মানুষের যোগাযোগ ও যাতায়াত ছিল খুবই কষ্টের এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সে কারণেই পদ্মাকে কেন্দ্র করে মানুষের স্বপ্ন দেখা নানা জটিল বাস্তবতায় মিলিয়ে যেতে থাকে। কবে ঘুচবে পদ্মার এপার-ওপারের মানুষের দূরত্ব, কবে যাতায়াত হবে সহজ–সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই এত বছর কেটে গেল। কেউ কল্পনা করতে পারেনি প্রমত্তা পদ্মার উত্তাল স্রোত আর প্রস্থের বিশালতাকে জয় করা যাবে। স্বাধীনতার পর থেকে কেউ কেউ স্বপ্ন দেখেছেন এই পদ্মার ওপর দিয়ে একদিন সত্যি সত্যি ব্রিজ উঠবে, গাড়ি চলবে, মানুষ সহজে যাতায়াত করবে; কিন্তু এটি দীর্ঘদিন স্বপ্নেই থেকে গিয়েছিল। কারণ প্রমত্তা পদ্মার ওপর সেতু করার চ্যালেঞ্জ নেওয়া মোটেও সহজ ব্যাপার ছিল না। তার পরও দক্ষিণ বাংলার মানুষ বারবার দাবি জানিয়ে আসছিল পদ্মার ওপর একটি সেতু নির্মাণের। বিশেষত বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতি যমুনা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার পর পদ্মা সেতুর চিন্তা ধীরে ধীরে স্থান করে নিতে থাকে। তবে যমুনার ওপর সেতু নির্মাণ করতেই আমাদের ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সময় কেটে গিয়েছিল। তখনই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া ঘাটে তিনি পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এরপর পদ্মা নদীতে প্রবাহিত হয়েছে অনেক স্রোত; কিন্তু পদ্মার ওপর সেতু করার উদ্যোগ ২০০৮ সাল পর্যন্ত তেমন এগোয়নি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় গেলে তিনি পদ্মা সেতু নির্মাণ করবেন। পদ্মা সেতু নিয়ে

সত্যিকার অর্থে অগ্রসর হওয়া মোটেও সহজ কাজ নয়। এটি কোনো সাধারণ সেতু হওয়ার নয়—এমনকি বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু প্রযুক্তি, কারিগরি জ্ঞান এবং সেতু সম্পর্কীয়, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, আর্থিক সক্ষমতা ইত্যাদি জটিলতা পদ্মার বিশালতার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কত বড়ো চ্যালেঞ্জ সেটি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞগণই উপলব্ধি করতে পারছিলেন। তবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারের দৃঢ়তা কতখানি জরুরি, সেটিও উপলব্ধির বিষয়। ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০১১ সালের ২৮ এপ্রিল বিশ্বব্যাংক ১২০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার চুক্তি স্বাক্ষর করে। ওই বছরের ১৮ মে জাইকা ৪০ কোটি ডলার, ২৪ মে আইডিবি ১৪ কোটি ডলার এবং ৬ জুন এডিবি ৬২ কোটি ডলারের ঋণ চুক্তি করে। তখন থেকে গোটা জাতি পদ্মা সেতুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের চিন্তা শুরু করে। কিন্তু এই চিন্তার মধ্যেই গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো কাল্পনিক দুর্নীতির। এর পেছনে ছিল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। দেশের গণমাধ্যমে তখন দুর্নীতির নানা কল্পকাহিনি নিয়ে লেখালেখি, আলোচনা, সমালোচনা ডালপালা বিস্তার করছিল। অথচ কেউ তলিয়ে দেখেনি প্রচারিত কল্পিত দুর্নীতি গুজব, নাকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছড়ানো হচ্ছিল। দুর্নীতির বিষয়টি এতটাই প্রাধান্য পাচ্ছিল যে পদ্মা সেতু তখন গৌণ হয়ে গেল। এর ফাঁকেই বিশ্বব্যাংক কৌশলে ঋণ প্রদান স্থগিত করে দিল। উসকে দেওয়া হলো দুর্নীতির প্রচার-প্রচারণাকে। রাজনীতি, গণমাধ্যম, সমাজ সব কিছুতেই তখন পদ্মা সেতুর দুর্নীতি প্রাধান্য পেয়েছিল! সরকার থেকে যতই এসব কাল্পনিক দুর্নীতির কথা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল, গণমাধ্যম ও রাজনীতির কোথাও থেকে তা মানা হয়নি। চারদিকের প্রচার-প্রচারণায় অনেকেই ঢোল বাজাতে বাজাতে মাতম করছিলেন। এরপর ২০১২ সালের ২৯ জুলাই বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু ঋণদান চুক্তি বাতিল করে দেয়। বিশ্বব্যাংকের পর অন্যরাও পিছিয়ে যায়। এ নিয়ে কানাডার আদালতে দুর্নীতি প্রমাণের মামলাও হয়। মামলায় দুর্নীতির প্রমাণ না পাওয়ার পরও অনেকে তা বিশ্বাস করতে চায়নি। সবাই ধরে নিয়েছিল পদ্মা সেতু আর হচ্ছে না, অনেকেই খুশি হলো; কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন পদ্মা সেতু হবেই। তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি; কিন্তু আমাদের দেশে অনেকেই তা অসম্ভব ব্যাপার কিংবা দেশের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করছিলেন। এঁরা আসলে

বাংলাদেশের সক্ষমতাকে মোটেও উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। বাংলাদেশ এই সময়ে অর্থনৈতিকভাবে যেমন ঘুরে দাঁড়াতে থাকে, একইভাবে পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে ’৭১-এর মতো প্রতিকূলতাকে জয় করতে দৃঢ় নেতৃত্বের পদক্ষেপও দেখতে পারছিল। শেখ হাসিনা সেই দৃঢ়তা ও সতর্ক পদক্ষেপ গুনে গুনে গ্রহণ করতে থাকেন। পদ্মা সেতুর নির্মাণ আয়োজনে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ, কারিগরি, প্রকৌশলী, প্রমত্তা পদ্মার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানকে একাত্ম করা হয়। পদ্মার ভবিষ্যৎ সেতু রূপ নিতে থাকে এক মহাসেতুতে। বিশ্বের ১১তম বৃহত্তম এবং অন্যতম প্রধান প্রমত্তা খরস্রোতা নদীর ওপর এই মহাসেতুটি অসম্ভব এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করায় শেখ হাসিনার সরকারকে। কিন্তু তিনি সেই চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত ভিশনারি মিশনারি নেতৃত্বের অবস্থান থেকে গ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের ১৭ জুন চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সই করা হয় এবং ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর মূল কাঠামো নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেই থেকে পদ্মা তীরে নির্মিত হতে থাকে নতুন এক সেতু, যাকে মহাসেতু নামে আখ্যায়িত করাই শ্রেয়। এই সেতুর নির্মাণশৈলী, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষজ্ঞগণ সঞ্চয় করেছেন বিশ্বের বড়ো বড়ো মহাসেতু থেকে। পদ্মার পলিবাহিত স্রোত আমাজন নদীর মতোই ভয়াবহ। তবে আমাজনের ওপর এখনো কোনো সেতু বা মহাসেতু হয়নি। সে কারণে একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খরস্রোতা পদ্মার ওপর মহাসেতু তৈরি এক দুঃসাধ্য বিষয়। সেই দুঃসাধ্যকে বিশেষজ্ঞগণ আয়ত্তে আনতে এর প্রতিটি পিলারকে ১০ হাজার টন রড ও সমপরিমাণ সিমেন্ট ও বালি দ্বারা স্থাপন করেছেন, যা ৩৮৩ ফুট মাটির গভীরে গিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এই ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর এতটাই মজবুত করা হয়েছে, যা রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলেও ধসে পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। তেমন শক্তপোক্ত মজবুত ৪২টি বিশালাকার পিলারের ওপর ৪১টি স্প্যান বসানো হয়েছে। দৈর্ঘ্যে ৬.১৫ কিলোমিটার ও প্রস্থে ১৮.১০ মিটারের এই মহাসেতুটি বাস্তবে সকলের চোখের সামনে দৃশ্যমান হলো। এ যেন এক স্বপ্নের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার বাস্তবতা। বাংলাদেশ ও চীনের ৭০০ প্রকৌশলী রাত-দিন এর নির্মাণকাজে ২০১৫-এর ডিসেম্বর থেকে যুক্ত ছিলেন। দুই তীরে দিনে ১২-১৩ হাজার শ্রমিক ও সহযোগী নির্মাণযজ্ঞে কর্মরত ছিলেন। এই মহাসেতুর সঙ্গে জাইকার সহযোগিতায় রেল সেতুর নির্মাণের কাজও অব্যাহত আছে। যাঁর হাত ধরে এই সেতুর নির্মাণ শুরু হয়েছিল সেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বসাধারণের যান চলাচলের জন্য ২৫ জুন তারিখ সেটি

আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। পদ্মার এপার-ওপার ২৫ জুন থেকে দুই তীরের মানুষের জন্য এক নতুন সোপানের সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

মহাসেতু পদ্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ দেশি এবং বিদেশি সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাংকসহ অনেকেই এখন বাংলাদেশের এই আত্মপ্রত্যয় দেখে বিস্মিত হচ্ছে; কিন্তু ১৯৭১ সালে আমরা এর চেয়েও বড়ো আত্মপ্রত্যয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। এ ধরনের বিজয়ের জন্য চাই যথার্থ নেতৃত্ব। ১৯৭১-এ ছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর নিকটতম সহযোগীরা, এবার নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দৃঢ়তা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে অব্যাহত থাকার কারণেই দুই বছর অতিমারি করোনার সংক্রমণকালেও মহাসেতু পদ্মার কাজ থেমে থাকেনি, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাও থেমে থাকেনি।

মহাসেতু পদ্মার উদ্বোধন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার নতুন প্রভাতেরই শুভ উদ্বোধন করছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে বাকি সব জেলার মানুষের সংযোগ ও যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবে গতিময়তা পেতে যাচ্ছে। দুই অঞ্চলের মধ্যে হাজারো বছরের বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতি নতুনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। আবার রাজধানীসহ সারা দেশের শিল্প, কৃষি, ব্যাবসাবাণিজ্য একসঙ্গে নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পাবে। শুধু তা-ই নয়, মহাসেতু পদ্মা প্রতিবেশী ভারত, নেপাল, ভুটানের সঙ্গেও বাংলাদেশের যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে নতুন দিগন্ত রচনা করতে যাচ্ছে। ফলে এই মহাসেতু হয়ে উঠবে শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, এমনকি বিশ্বের জন্যও একটি নতুন অর্জন। পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশকে ১৯৭১ সালে একবার চিনেছে, এবার মহাসেতু পদ্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বার জানতে সুযোগ পেয়েছে। মহাসেতু পদ্মা তাই আমাদের কাছে আরেক প্রত্যয়, শৌর্য-বীর্য এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রার নতুন এক সোপান হয়ে উঠেছে।

লেখক : শিক্ষাবিদ

কোভিড-১৯ বিশ্বমারি মোকাবিলায় টিকা ও বাংলাদেশ

মুশতাক হোসেন

কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। নতুন ভাইরাসের জিনগত বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করার এক বছর কম সময়ের মধ্যেই এর বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কার হয়েছে। সর্বশেষ (২৫.০২.২২) খবর অনুযায়ী, ৯টি টিকা এ পর্যন্ত মানবদেহে প্রয়োগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদন দিয়েছে। মানবদেহে পরীক্ষা হচ্ছে ১৪৬টি টিকা, প্রাণিদেহে পরীক্ষা হচ্ছে ১৯৫টি টিকা। বাংলাদেশে একটি টিকা প্রাণিদেহে পরীক্ষা শেষে এখন মানবদেহে পরীক্ষার অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখ্য, টিকাগুলো কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে শতভাগ কার্যকর না হলেও বা গোষ্ঠীগত প্রতিরোধ (পপুলেশন ইমিউনিটি) গড়ে না তুললেও তা নিশ্চিতভাবেই মানুষকে গুরুতর অসুস্থতা থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে।

আবিষ্কৃত টিকাগুলোর উৎপাদনকারী দেশ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যখন একের পর এক টিকার অনুমোদন দিতে থাকে, তখন থেকেই বাংলাদেশ টিকা আনার প্রস্তুতি নেয়। বাংলাদেশ সরকার প্রধানত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) প্রথম থেকেই বিশ্বব্যাপী টিকার সমবণ্টনের ওপর জোর দিয়ে আসছিল এবং সে উদ্দেশ্যে বৈশ্বিক টিকা সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য কোভ্যাক্স গঠন করে। এর আগে সেপি (কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রি-প্যারডনেস ইনোভেশনস) এ উদ্যোগ শুরু করলে বাংলাদেশ শুরুতেই এতে চাঁদা প্রদান করে। সেপ্টি পরে কোভ্যাক্সে যুক্ত হয়।

শুরু থেকেই টিকা উদ্ভাবনকারী দেশগুলোর বেশির ভাগই তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি ছিল না। তবে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীগণ ঘোষণা দেন যে তাঁরা তাদের টিকা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করবেন না। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা ব্রিটেন ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন দেশে এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও উৎপাদনের অনুমতি দেন। তাঁরা মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে আয় অনুযায়ী হ্রাসকৃত মূল্যে টিকা সরবরাহ করবেন বলে ঘোষণা দেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ অন্যান্য নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশের মতোই অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকোর টিকা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ

ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুবিধা ছিল প্রতিবেশ দেশ ভারতে এ টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও উৎপাদনের সুযোগ। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট ঝুঁকি নিয়ে টিকার তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হতেই টিকা উৎপাদনে শুরু করে। অন্যান্য দেশে টিকা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এর ফলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের সাথে সাথে এটা মানবদেহে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, দ্রুততম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ এ টিকাগুলো ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে, যা ছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে বাংলাদেশের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর মাধ্যমে টিকা সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শুরুটা ভালোই হয়েছিল; কিন্তু ভারতে কোভিড-১৯ বিশ্বমারি ডেল্টার ভয়াবহ বিস্তারের কারণে ভারতের নিজস্ব চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে সেরামের টিকা সরবরাহ স্থগিত হয়ে যায়। সারা বিশ্বে ডেল্টার প্রকোপ বিস্তৃত হয়। ফলে বিকল্প কোনো উৎস থেকে টিকা সংগ্রহ করতে বাংলাদেশের কিছুটা সময় লাগে। এরপর প্রধানত চীন থেকে বাংলাদেশে সিনোফার্ম ও সিনোভ্যাকের টিকা সরবরাহ শুরু হয়। এটাই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোভিড-১৯ টিকার সবচেয়ে বড়ো উৎস। এরপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভ্যাক্স ও বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ধরনের টিকা আসতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে পুনরায় টিকা সরবরাহ শুরু হয়। এখন বাংলাদেশে টিকার প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা নেই। সারা বিশ্বে এখন চাহিদা অনুযায়ী টিকা উৎপাদন হয়েছে, যদিও অন্তত ২৫টি দেশে এখনো টিকা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা থেকে দূরে রয়েছে। প্রধানত প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতি, টিকা সংরক্ষণের সমস্যা, প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এসব দেশ এখনো পিছিয়ে আছে।

আমরা এখন টিকা পাচ্ছি, কিন্তু কতটা ন্যায্যতার সাথে পাচ্ছি, সেটা এখনো অজানাই থেকে যাচ্ছে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা কোনো কোনো টিকার ক্ষেত্রে। কোভ্যাক্সের মাধ্যমে আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে অনুদানের মাধ্যমে টিকা পাচ্ছি। কত খরচ হচ্ছে, সেটা জানা যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী অতি উচ্চ আয়ের দেশগুলো উচ্চমূল্যে, মধ্যম আয়ের দেশগুলো মাঝারি মূল্যে এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলো সর্বনিম্ন মূল্যে টিকা পাচ্ছে কোভ্যাক্স থেকে। কিন্তু দ্বিপক্ষীয় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী,

কোনো কোনো দেশ থেকে আনা টিকার মূল্যটা জানা যাচ্ছে না। কারণ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী দেশ তাদের বিবেচনা অনুযায়ী একেকটি দেশকে একেক দামে টিকা সরবরাহ করছে। এটা তাদের জন্য স্পর্শকাতর কূটনৈতিক বিষয়। তবে কোভ্যাক্স থেকে যে নীতিমালা অনুযায়ী যে ধরনের মূল্যে বাংলাদেশ টিকা পাচ্ছে সে নীতিমালা অনুসৃত হলেই ভালো।

পাশ্চাত্যের দেশ থেকে আসা মডার্না ও ফাইজারের টিকা অতি শীতল তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়, বিশেষ করে ফাইজারের টিকা -৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও মডার্নার টিকা -২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ হামের টিকার জন্য অতি শীতল তাপমাত্রার (-২০ থেকে -৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) সংরক্ষণাগার জেলা পর্যায়ে থাকলেও সেটা ফাইজার টিকার জন্য অতটা শীতল নয়। শুধু সংরক্ষণই নয়, ঢাকার অতি শীতল সংরক্ষণাগার থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পরিবহণের জন্যও অতি শীতল তাপমাত্রার ফ্রিজারযুক্ত যানবাহন দরকার। এ দেশের কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা করছে। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীর অব্যাহত সহযোগিতা তো রয়েছেই। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অতি শীতল তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণের তেমন বড়ো কোনো সমস্যা নেই। দেশের প্রতিটি জেলাতেই প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বারো বছর থেকে আঠারো বছর বয়সি সকলকে ফাইজারের টিকা দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন পর্যন্ত বারো বছর থেকে সতেরো বছর বয়সিদের কেবলমাত্র ফাইজারের টিকা দেওয়ার বৈজ্ঞানিক অনুমোদন দিয়েছে।

টিকা প্রদান শুরুর আগে যখন এ দেশে টিকা এসে পৌঁছায়নি, তখন মানুষের মধ্যে বড়ো ধরনের আগ্রহ ছিল টিকা নিয়ে। মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসা ছিল কেন টিকা আনা যাচ্ছে না! কিন্তু যখন টিকা এসে পৌঁছাল তখন টিকার চাহিদা কমতে শুরু করল। এক টিকার বিরুদ্ধে আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী টিকা কোম্পানির বিরূপ প্রচারণা, বিজ্ঞানে আস্থাহীন রক্ষণশীল গোষ্ঠীবিশেষের অপপ্রচার, কুতথ্য প্রচার প্রভৃতি টিকা গ্রহণে মানুষের ভাটার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এটা বলা দরকার যে, এসব প্রচার প্রধানত পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে এ দেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে পৌঁছায়। তবে দেশের ভেতরেও এ ধরনের অপপ্রচারের উদ্যোগ ছিল। এ ধরনের ভাটার পরিস্থিতির মাঝে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে টিকা সরবরাহ স্থগিত হলো, সেখানে বিশ্বমারি পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ

করাতে। তখন আবার চাহিদা বাড়তে থাকল। কয়েক মাস পরে বাংলাদেশ টিকা সংগ্রহে সমর্থ হলো। মানুষের চাহিদা ও আগ্রহে আর তেমন ভাটা পড়েনি। তবে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী টিকা গ্রহণের সুযোগ নিতে পারেনি একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত। এ জন্য মাঝে মাঝেই বিশেষ টিকা অভিযান পরিচালিত হয়েছে, যখন মানুষ ইলেকট্রনিক নিবন্ধন ছাড়াই সরাসরি টিকা দিতে পেরেছে। তখন মানুষের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে টিকাকেন্দ্রগুলোতে।

এ ধরনের সর্বশেষ টিকা প্রদানের অভিযান হয়ে গেল গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ শনিবার। লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক দিনে এক কোটি টিকা প্রদানের। মানুষের প্রচণ্ড আগ্রহে সে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ওই দিন এক কোটিকে ছাড়িয়ে আরও প্রায় বারো লক্ষ মানুষ টিকা নিয়েছে। মানুষের আগ্রহ বিবেচনায় নিয়ে তার পরও দুই দিন ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি টিকা অভিযান অব্যাহত ছিল। টিকার প্রথম ডোজ দেশের সমগ্র জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, যদিও টিকাগুলো কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে শতভাগ কার্যকর নয়, কিন্তু গুরুতর অসুস্থতা ঠেকায়, তাই টিকা কর্মসূচি আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সংক্রমণ ঠেকাতে শতভাগ কার্যকর টিকা হাতে না পাই। সে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বিদ্যমান টিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে মেসেঞ্জোর আরএনএ। মডার্না ও ফাইজার এ প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীগণ এখন চেষ্টা করছেন এ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমন একটি টিকা তৈরি করা যেন তা দিয়ে সকল ধরনের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো যায়। এর মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর বদলে যাওয়া নানা ধরন (ভেরিয়্যান্ট) ও উপধরনকেও (যেমন–আলফা, বিটা, ডেল্টা, ওমিক্রন, ওমিক্রন বিএ২) যেন ঠেকানো যায় সে চেষ্টা চলছে। একে প্যান করোনাভাইরাস বা প্যান সার্বিকোভাইরাস টিকা বলা যেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে দক্ষিণ আফ্রিকাতে মেসেঞ্জোর আরএনএ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে টিকা উৎপাদনের একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেখান থেকে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ এ প্রযুক্তি প্রয়োগ টিকা উৎপাদনের পথে এগাচ্ছে। বাংলাদেশকেও একই ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠান মেসেঞ্জোর আরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিকা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মানবদেহে এ টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হওয়ার পথে। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দাবি করেছে, সাধারণ ফ্রিজের ঠান্ডার তাপমাত্রাতেই

(৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এটি সংরক্ষণ করা যাবে। এটা আমাদের জন্য আশার খবর।

টিকার পাশাপশি সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে কোনো প্রকার শিথিলতা দেখানো হবে বিপজ্জনক। ষাট বছরের বেশি বয়সি, শরীরের ওজন বেশি, দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস-উচ্চ রক্তচাপ-ক্যান্সার-শ্বাসকষ্ট-কিডনি প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় ভুগছেন ও এ রোগ নিয়ন্ত্রণে নেই, কেমোথেরাপি বা ডায়ালিসিস চলছে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল রয়েছে–এমন অবস্থায় আছেন তাঁরা কোভিড-১৯সহ অন্যান্য রোগের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিসহ সবাইকেই স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে। কারণ কম ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ কোভিড-১৯ ভাইরাস বহন করে অতি ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে সংক্রমিত করতে পারে। যারা এখন সুস্থ আছে তারা নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম বিশেষ করে শ্বাসের ব্যায়াম করে শরীরকে রোগ প্রতিরোধী করে গড়ে তুলতে পারে। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে। খাবারে অতিরিক্ত চিনি, লবণ ও তেল বাদ দিতে হবে। কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার পরে বিভিন্ন ভিটামিন ঔষধাকারে সেবন করে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদগ্রীব হয় কেউ কেউ, যেটা খুব একটা কাজে দেয় না। সে আকাঙ্ক্ষা কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার আগেই পূরণ করা উচিত। তাহলেই সেটা কাজে দেবে। তবে ভিটামিন ঔষধের মাধ্যমে সেবন না করে খাবারের মাধ্যমেই সেবন করা উচিত। যাদের শরীরে সুনির্দিষ্ট ভিটামিনের অভাব আছে বলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শে তারা সে নির্দিষ্ট ভিটামিন খেলে কাজে দেবে। নতুবা তা অপচয় ও কোনো ক্ষেত্রে শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

আমরা একদিন কোভিড-১৯ বিশ্বমারি কাটিয়ে উঠব সন্দেহ নেই; কিন্তু এ বিশ্বমারি যে শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছে সেটাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। সেটা হচ্ছে জনস্বাস্থ্যকে কেন্দ্রে রেখে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিকশিত করা। কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থা হবে এর কেন্দ্রবিন্দু। এ জন্য গ্রামাঞ্চলের মতো বড়ো বড়ো শহরেও এলাকাভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে। এভাবে আমরা যদি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাই, তাহলে বাংলাদেশে করোনা বিশ্বমারি মোকাবিলায় যতটুকু অপূর্ণতা দেখা গেছে তা আমরা পূরণ করতে পারব। ভবিষ্যৎ বিশ্বমারি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।

লেখক : উপদেষ্টা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)

জনবান্ধব জনপ্রশাসন

মো. ফিরোজ মিয়া

‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য’–গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এ মূলমন্ত্র সংযোজনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল জনপ্রশাসন যেন কর্তৃত্ববাদী প্রশাসন না হয়ে জনবান্ধব প্রশাসন হয়। এছাড়া এই মূলমন্ত্রের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, এ মূলমন্ত্রকে ধারণ ও কার্যে পরিণত করে যেন বাংলাদেশের জনপ্রশাসন আদর্শ জনবান্ধব জনপ্রশাসন হিসেবে গড়ে ওঠে এবং সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়কে বাস্তবে রূপ দেয়।

জনপ্রশাসনের কাজ বহুমাত্রিক। জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ কখনো সহায়তাকারী, কখনো সাহায্যকারী, কখনো সমন্বয়কারী, কখনো নিয়ন্ত্রণকারী, কখনো নির্দেশনাদাতা, কখনো ব্যবস্থাপক এবং কখনো-বা তদারককারী। এককথায় বলতে গেলে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ হচ্ছেন, সরকার পরিচালনায় রাষ্ট্রনিযুক্ত সহায়তাকারী। জনপ্রশাসন রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় তাঁদের প্রদান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণ বা জনসেবামূলক কার্যাদিতে সরকারকে সহায়তা করা। এছাড়া জনপ্রশাসনের দায়িত্ব হচ্ছে, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা, অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা, পরিবেশ সংরক্ষণ করা, উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এছাড়া জনপ্রশাসন যে সব দায়িত্ব পালন করে, তা হচ্ছে সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান, সাংগঠনিক কর্মপন্থা নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ, জনবল কাঠামো সুষম করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনশক্তির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধকরণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত উন্নয়নের দ্বারা সরকারি কার্যক্রমে মিতব্যয়িতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাজেটারি প্ল্যানিং ও নিয়ন্ত্রণের সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ। প্রকৃত উন্নয়নের দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার গুণগতমান উন্নয়ন করে জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধনে সরকারকে সহায়তা করাও জনপ্রশাসনের কাজ।

জনগণের সামাজিক, আর্থিক নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বও জনপ্রশাসনের ওপর ন্যস্ত। এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন সুশাসন প্রতিষ্ঠা। যে জন্য বলা হয়, জনবান্ধব জনপ্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুশাসনের সহায়ক আইন প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করাও জনপ্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

জনবান্ধব প্রশাসন সর্বদাই শক্তিশালী প্রশাসন, যারা ব্যর্থতার দায় ও ভুল স্বীকার করে তা সংশোধনের চেষ্টা করে। তারা তাদের চিন্তা, জ্ঞান, দক্ষতা ও সততার ঘাটতি আড়াল করার চেষ্টা করে না। এ প্রশাসন সর্বদাই যে কোনো শ্রেণি বা পেশার সুপরামর্শ গ্রহণ করে। তারা নিজেদের মতামতকেই সর্বোচ্চ সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করে না। তারা অন্যের ভালো মতের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হয়। তারা নিজেদের জনগণের প্রভু না ভেবে জনগণের বন্ধু ভাবে এবং জনগণও তাদের সহায়তাকারী বন্ধু ভাবে।

নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনবলই আদর্শ জনবান্ধব প্রশাসনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আদর্শ জনবান্ধব জনপ্রশাসন সর্বদাই নিজস্ব বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। সংবিধান ও আইনকে সমুন্নত রেখে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। সামাজিক বৈষম্যদূরীকরণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে। জনসমস্যা অনুধাবন এবং তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করে। নিজস্ব স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শনের দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করে।

জনপ্রশাসনকে কাজ করতে হয় সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, থাকতে হয় সেবামূলক মানসিকতাও। জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের গুণসম্পন্নও হতে হয়, থাকতে হয় কৃত কাজের ভবিষ্যতের ফলাফল অনুধাবনের সক্ষমতাও। সরকারি পরিষেবামূলক কার্যক্রমের দক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপর জনপ্রশাসনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। জনপ্রশাসনকে এমন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়, যাতে করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়, পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করে কার্যকর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটে; সর্বোপরি জনস্বার্থের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

নীতিনির্ধারণে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন এবং গৃহীত নীতির বাস্তবায়নের দায়িত্ব জনপ্রশাসনের ওপরই ন্যস্ত থাকে। অনেক সময় প্রশাসনিক বিভিন্ন আইন ও আমলাতান্ত্রিক জনবল কাঠামো উক্ত দায়িত্ব পালনে এবং জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে প্রশাসনিক আইন ও জনবল কাঠামোকে সময় সময় যুগোপযোগী করতে হয়। সরকার এ ব্যাপারে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রশাসনিক আইন যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা নতুনভাবে জারি করা হয়েছে। বহু প্রত্যাশিত

সরকারি চাকরি আইনও জারি করা হয়েছে। যদিও উল্লেখিত বিধি ও আইনে কিছু ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, যা সরকারের জারিকৃত শুদ্ধাচার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় জনবান্ধব প্রশাসন গড়ার পথে অন্তরায় হতে পারে। তাছাড়া এমন কিছু বিধান সংযোজিত হয়েছে, যা জনপ্রশাসনের ভাবমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া এরূপ বিধান জনগণ ও জনপ্রশাসনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। এসব ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যতা দূর করা হলে উক্ত আইন ও বিধি জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ায় নিশ্চিতভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ার জন্য জনপ্রশাসনের সদস্যদের স্বচ্ছতার কোনো বিকল্প নেই। জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য শুদ্ধাচার কৌশল জারি করা ছাড়াও সরকার কর্মচারীদের প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে সম্পদের হিসাব দাখিলের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দাখিলে অনেকটা অনীহা থাকায় সম্পদের হিসাব দাখিলের ব্যাপারে একাধিকবার নির্দেশনাও জারি করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পত্তির হিসাব দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারকে আরও কঠোর অবস্থান নিতে হবে। কেননা একজন কর্মচারীর আর্থিক স্বচ্ছতা নিরুপণের মাপকাঠি তার সম্পদ বৃদ্ধির আনুপাতিক হার। জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়টি যদি জনগণের কাছে অস্পষ্ট থাকে বা প্রশ্নবিদ্ধ থাকে, তাহলে জনগণ কখনোই জনপ্রশাসনকে বান্ধব হিসেবে বিবেচনা করবে না।

জনপ্রশাসনের জনবল কাঠামো যুগোপযোগী করার বিষয়ে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনাও জারি করা হয়েছে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। জনবল কাঠামো যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জনস্বার্থের চেয়ে কর্মচারীদের স্বার্থকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া না হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার আইনকানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করে। আর এসবের বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকে জনপ্রশাসনের ওপর। এছাড়া এসব প্রণয়ন ও প্রয়োগের দ্বারাই কেবল সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সামগ্রিক ও নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, যা করার দায়িত্ব জনপ্রশাসনের ওপরই ন্যস্ত। তাই জনপ্রশাসনকে হতে হয় প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা, সামাজিক বৈষম্য দূর করে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম।

জনপ্রশাসনকে জনবান্ধব হওয়ার জন্য কতকগুলো নৈতিক নীতি অনুসরণ করতে হয়। সততা যেমন জনপ্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক নীতি, তেমনি শুদ্ধতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যও গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক নীতি। এছাড়া জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণকে হতে হয় নিঃস্বার্থ, কর্তব্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, আত্মবিশ্বাসী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দক্ষ, তৎপর, মিতব্যয়ী এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ এসব নৈতিক নীতির অনুশীলন করলে তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে, যা জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ার পক্ষে সহায়ক হবে।

সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে স্বল্প ব্যয়ে এবং ভোগান্তি ছাড়া সেবা প্রদান এবং কর্মচারীদের মাঝে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার মনোবৃত্তির বিকাশের লক্ষ্যে সরকার ২০১৫ সালে অভিযোগ প্রতিকার নির্দেশিকা জারি করে স্বল্প পরিসরে হলেও এর বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এছাড়া সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেন চার্টারও প্রতিটি দপ্তরে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে প্রতিটি সরকারি দপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করে এর বাস্তবায়নে অধিক মনোযোগী হলে জনবান্ধব প্রশাসন গড়ায় তা যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

অভিযোগ প্রতিকার নির্দেশিকা ছাড়াও সরকার সরকারি চাকরি আইনে নির্ধারিত সময়ে সরকারি সেবা প্রদানের বিধান সংযোজন করে জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করেছে। কোনো কর্মচারী যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সরকারি কোনো কার্য বা সেবাপ্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি না করলে বা যুক্তিসংগত কোনো কারণ ছাড়া প্রার্থিত সেবা সরবরাহ বা অনুরূপ আবেদন নিষ্পত্তি না করলে বা প্রত্যাখ্যান করলে সেবাপ্রার্থী প্রতিকার চাইতে পারবেন এবং ক্ষতিপূরণও আদায় করতে পারবেন। কিন্তু সরকারি আইনের উক্ত বিধানে কিছু অসংগতি থাকায় এবং উক্ত বিধান বাস্তবায়নের জন্য এসংক্রান্ত বিধিমালা অদ্যাবধি জারি না হওয়ায় উক্ত বিধানের আওতায় সেবাপ্রার্থীরা এখনো তেমন সুফল পাচ্ছেন না। আইনের বিধানের অসংগতি দূর করে এসংক্রান্ত বিধিমালা জারি করা হলে তা থেকে সেবাপ্রার্থীরা উপকৃত হবে। এছাড়া জনপ্রশাসনের কর্মচারীরাও তাদের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনে এবং ভোগান্তি ছাড়া সেবা প্রদানে বাধ্য হবে। তবে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য জনপ্রশাসনকে কেবল আর্থিক দুর্নীতিমুক্ত হলেই চলবে না, বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতিমুক্তও হতে হবে।

লেখক : সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও চাকরির বিধানাবলি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা

যে কারণে ইতিহাসে অমর তিনি

মুহাম্মদ শামসুল হক

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে নিজস্ব রীতিনীতি, স্বকীয়তা অটুট রেখে স্বজাতির ম্যান্ডেট নিয়ে জনপ্রতিনিধির শাসনে পরিচালিত হতে পারার গ্যারান্টিই হচ্ছে স্বাধীনতা। যে কোনো দেশের স্বাধীনতা এমন একটি অমূল্য সম্পদ, যা কুড়িয়ে পাওয়া যায় না কিংবা ইচ্ছে করলে অথবা 'স্বাধীন হয়ে যাও' বললেই হয়ে যাওয়ার বিষয় নয়। অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদের ভাষায় 'স্বাধীনতা মামার বাড়ির আবদার নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ কোনো অর্বাচীন যুবকের হঠকারিতা নয়।' সাধারণভাবে রাষ্ট্র একটি স্থায়ী ধারণা, সার্বভৌমত্বের প্রতীক ও প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র ছাড়া স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণও আত্মতৃপ্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না।

যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্য বহু বছর ধরে নানা আন্দোলনের এক পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে ১৯৪৭ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত ও পাকিস্তানের মতো এশিয়া এবং আফ্রিকায় অনেক ঔপনিবেশিক দেশ (কলোনি) সমঝোতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ৮০-৯০-এর দশকে পরাক্রমশালী সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সমঝোতার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, লাটভিয়াসহ সাতটি সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য।

তবে অনেক ক্ষেত্রে হাজারো বৈপরীত্য সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নানা কলাকৌশলে অস্বীকার কিংবা অস্ত্রের মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে একই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে, একই কাতারে শামিল হয়ে, বিনা প্রশ্নে নিঃস্বার্থভাবে জানমাল সমর্পণ করার প্রস্তুতি নিতে হয়। আর এরকম প্রস্তুতির জন্য জনগণকে মানসিক ও সাংগঠনিকভাবে উপযুক্ত করতে প্রয়োজন কৌশলী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতার। কারণ স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রক্রিয়া যেমন দীর্ঘ, যুদ্ধের ফলাফলও তেমন অনিশ্চিত। উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে। আরব ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি-জাতি প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরও স্বাধীনতা পায়নি। ইয়ান

স্মিথ রোডেশিয়ার শেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৬৫ সালের ১১ নভেম্বর রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সংখ্যালঘু সরকার কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনের বিরোধী থাকার কারণে ব্রিটিশ সরকার, কমনওয়েলথ এবং জাতিসংঘ এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে অবৈধ ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮০ সালে রোডেশিয়া জিম্বাবুয়ে নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

১৯১৬ সালে ইস্টার অভ্যুত্থানের সময় ডাবলিনে কিছু আইরিশ বিদ্রোহী জনগণের পক্ষ থেকে সমগ্র আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি সম্পৃক্ত না থাকায় সেই ঘোষণাটি ৬ বছর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। পরবর্তী সময়ে আইরিশ ফ্রি স্টেট ১৯২২ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়ারল্যান্ডের উত্তরাংশ এই রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

আজকের স্বাধীন সার্বভৌম সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১ সালে। জাতি হিসেবে বাঙালি ও নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি বিশ্বে আমাদের পরিচয়। কিন্তু এখন থেকে অর্ধশত বছর আগেও জাতি হিসেবে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না। একাত্তরের আগে ২৪ বছর ধরে আমরা ছিলাম পাকিস্তান নামক একটি দেশের পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের বাসিন্দা। শাসন-শোষণ, বৈষম্য ও অধিকারহীনতায় আমাদের অবস্থান ছিল মূলত উপনিবেশের শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের মতো। তারও আগে প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশ শাসনসহ যুগে যুগে নানা জাতিগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের জাঁতাকলে বাঙালিরা পিষ্ঠ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ২৩ বছর নিয়মতান্ত্রিক ও সাড়ে ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আর এ লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে এক কাতারে শামিল করে এগিয়ে নেওয়ার কঠিন কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ধর্মীয় জাতিসত্তাবিশিষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আওতায় শাসিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা থেকে বাঙালি জাতির অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ কেউ আঁচ করতে পেরেছিলেন। যতই দিন যায় ততই তাঁদের উপলব্ধি তীব্র হতে থাকে। রাজনীতিক, ছাত্রসমাজ, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শ্রেণি-পেশার লোকজনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে থাকে। সব শ্রেণির মানুষের স্বপ্নকে নিজের স্বপ্ন ও চেতনার সাথে মিশিয়ে বঙ্গবন্ধু এমনভাবে স্বাধীনতার সোপান তৈরি করেন, যা সমসাময়িক অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

শেখ মুজিব ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গণতান্ত্রিক নেতা ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো মাঠচষা নেতাদের ভাবশিষ্য। বলা যায়, তাঁদের হাত ধরেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু তারুণ্য-যৌবনের জয়যাত্রায় তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল ওই দুই নেতার তুলনায় অগ্রসর, আধুনিক এবং স্পষ্ট, বিশেষ করে বাংলার স্বাধিকার-স্বাধীনতার প্রশ্নে। চীনের সাথে সম্পর্কের কারণে পাকিস্তানের অখণ্ডতার ব্যাপারে ভাসানী ছিলেন দোদুল্যমান, আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে। জানা যায়, ৬১ সালে লন্ডনের এক হোটেলে শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে 'পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন হতে হবে' বললে সোহরাওয়ার্দী রেগে গিয়েছিলেন। আগে থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং মুসলিম লীগের ছায়াতলে থেকে রাজনীতি করা এবং পরে আওয়ামী লীগে শামিল হওয়া অনেক নেতাকর্মীও পাকিস্তানকে ভাঙার মতো চিন্তা-ভাবনা মেনে নিতে পারেননি। বিষয়টির প্রতি খেয়াল রেখেই মুজিব প্রবীণ নেতাদের ছায়ার নিচে থেকে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেন সবার মাঝে।

১৯৫৬ সালে গণপরিষদে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করার প্রস্তাব করে পাকিস্তান সরকার। এর আগে এই প্রদেশের নাম ছিল পূর্ব বাংলা। বঙ্গবন্ধু সে সময় গণপরিষদে দেওয়া বক্তৃতায় 'পূর্ব বাংলা' নাম পাল্টানোর বিরোধিতা করে এর নাম শুধু 'বেঙ্গল' (বাংলা) করার প্রস্তাব করেন। ওই অধিবেশনেই তিনি বাঙালিদের ওপর জুলুম-শোষণ বন্ধ না হলে জনগণ সংবিধানবিরোধী অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করে দেন। ষাটের দশকের শুরুতে (১৯৬১ সালে) আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির এক গোপন সভায় শেখ মুজিব খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার দাবিকে আন্দোলনের কর্মসূচিতে রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন কমরেড মণি সিংহের প্রতি। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই, আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন এসব কোনো দাবিই পাঞ্জাবিরা মানবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালিদের মুক্তি নেই।' ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিসনদ হিসেবে ছয় দফা ঘোষণা করলে পাকিস্তান সরকার একে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত হিসেবে প্রচার চালায়। দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক সফর

ও ছয় দফার প্রচার-আন্দোলনে জনসমর্থন দেখে তা দমানোর জন্য সরকার বঙ্গবন্ধুসহ দলের নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার ও দলন, নিপীড়ন চালাতে থকে।

ছয় দফার মধ্যে প্রকৃতই স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত ছিল। সেটা বুঝতে পেরেই কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে শেষ করে দিতে চেয়েছিল আইয়ুব খান সরকার। কিন্তু এরই মধ্যে শেখ মুজিবের ওপর জনগণের আস্থা আরও বেড়ে যায়। ছয় দফা ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে সৃষ্ট তীব্র গণ-আন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সামরিক সরকার সেই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তরা মুক্তি পান। ২৩ ফেব্রুয়ারি পল্টনে ছাত্র-গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। জনগণের কাছে এই মামলা মিথ্যা প্রতীয়মান হওয়ার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। একই সঙ্গে তৈরি হয় স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্যে দাবি তোলার পটভূমি। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছয় দফার ভিত্তিতে এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য নানা চক্রান্ত শুরু করে। পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্চের ১ তারিখ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাতিল করলে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং স্বাধীনতার দাবি জোরালো হয়। ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম সমাবেশে তাঁর কালজয়ী ভাষণে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ভাষণে তিনি 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উল্লেখ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান। ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সমস্ত প্রশাসন চলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুলিশ, বিডিআরসহ নিরস্ত্র জনতার ওপর গণহত্যা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসহ একাধিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর রাত প্রায় দেড়টার দিকে সেনাবাহিনী তাঁর বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাসে এবং

পরদিন পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই পূর্বনির্দেশনা অনুযায়ী তাঁর সহযোগী নেতাদের পরিচালনায় ছাত্র-জনতা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে প্রবাসী সরকার। তাঁর প্রতিকৃতি ও নির্দেশনাকে স্মরণ করেই ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করার মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনে বাঙালিরা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রায় ৫৫ বছর জীবনকালে প্রায় ১৩ বছরই কারাগারে কাটিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও শ্বাসরুদ্ধকর ২৮৯ দিনের বন্দিজীবন কেটেছে তাঁর–মুক্তিযুদ্ধকালে, পাকিস্তানের কারাগারে। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সামরিক আইনে এক প্রহসনের বিচারে তাঁকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বাঙালি জাতির দৃঢ় প্রত্যয়, আন্তর্জাতিক মহলের চাপ ও নিজেদের স্বার্থ বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। অবশেষে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের শ্বাসরুদ্ধকর প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে তিনি তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন জাতির পিতা হয়ে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার প্রয়োজনের কথা অনেকেই আকারে-ইঙ্গিতে, ঘরোয়া আলোচনায় বিভিন্ন সময় বললেও কেউ এই লক্ষ্যে জনগণকে একত্রিত বা সংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যক্রম হাতে নিতে পারেননি। জেল-জুলুম সহ্য করে, মৃত্যুঝুঁকি মাথায় নিয়ে সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধাপে ধাপে একেকটি বাধা অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ দিয়েছেন, যা আর কারো সাহসে কুলায়নি। তাঁর নেতৃত্বে এই সংগ্রামের ফলেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। বিশ্বদরবারে বাঙালি পরিচিতি পায় আলাদা জাতি হিসেবে। এজনই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ও বিশ্বদরবারে বাঙালিদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণাকর্মী, সম্পাদক, ইতিহাসের খসড়া

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং আমাদের করণীয়

প্রকৌশলী জুলকারনাইন

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবী। জগৎজুড়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি আমাদের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। বিদায় হচ্ছে পুরনো ধ্যান-ধারণা। নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের দক্ষতা শিখতে হচ্ছে বিশ্ববাসীকে। প্রযুক্তির ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের থেকে প্রযুক্তিবদলের গতি আরও অনেক দ্রুত হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তিবদলের সাথে তাল মেলাতে বিশ্ববাসীর সামনে দেখা দিয়েছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ। নতুন নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ও বিস্তার আমরা চাই বা না চাই আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, তা না হলে এই বিশ্বে আমরা পিছিয়ে পড়ব। বর্তমান বিশ্বে উৎকর্ষের সাথে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। আমরা খুব সহজেই ধারণা করতে পারি আগামী দশকগুলোতে প্রযুক্তিচালিত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে পুরাতন কাঠামোকে বদলে দেবে নতুনভাবে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বর্তমান চাকরির অনেকই আর থাকবে না। সেখানে প্রযুক্তির কল্যাণে যেসব নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে তার ধরন এখনো আমাদের অজানা। রোবোটিকস, অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বক চেইন টেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, জিন প্রকৌশল ও অন্যান্য প্রযুক্তি বিশ্বকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে। এছাড়া পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের এবং সম্পূর্ণ স্বশাসিত যানবাহনের ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তির যুগান্তকারী যুগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এখন বাস্তবতা, অস্বীকার করার উপায় নেই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে না পারলে নতুন শিল্পবিপ্লব আমাদের ফেলে এগিয়ে যাবে। আমাদের জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, তেরো বছর ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি অনেক শক্ত হয়েছে। সারা দেশের সকল ক্ষেত্রেই এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব ফেলেছে। মানুষ এককথায় অভ্যস্ত হয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে, মাথাপিছু আয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে সাময়িক হিসেবে মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয়েছে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের কমবেশি তিন কোটি মানুষের মাথাপিছু আয় প্রায় পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার। আইসিটি খাতে রপ্তানি আয় বছরে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আউটসোর্সিং খাতে বছরে

আয় ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনলাইন শ্রমশক্তিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। ফিল্যান্সিংয়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লাখ। হাইটেক পার্কে সরাসরি কর্মসংস্থান প্রায় ২১ হাজার। স্কুলগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম আছে ৫৮ হাজারেরও বেশি। দিন দিন এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। দেশে এখন শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সরকারের ২০৪১ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ১৫ হাজার মার্কিন ডলারের পাশাপাশি জনগণকে সমানভাবে ক্ষমতায়ন করে একটি ধনী দেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকলেই এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০৪১ সালে বাংলাদেশের জিডিপির আকার হবে ৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বের ৯৩তম অবস্থানে, আর জনসংখ্যার দিক দিয়ে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। এ এরকম একটা জনবহুল দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করা খুব সহজ নয়। তবে আজ থেকে ১৩ বছর আগে এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়েছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের রোডম্যাপ ঘোষণা করে ছিলেন। তারপর থেকেই ধারাবাহিকভাবে ডিজিটাল শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ এখনো ‘ফাইভজি’ চালুর বিষয় চিন্তাও করেনি। অথচ বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ‘ফাইভজি’ চালু হয়েছে। ২০২৩ সালে আসছে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল। সরকার ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট উচ্চগতির ডেটা দিচ্ছে, যার মাধ্যমে প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে। আগামীর পৃথিবী হবে ডেটানির্ভর। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকবে। ডেটার চাহিদা পূরণে ইকো সিস্টেম দাঁড় করাতে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এবং গ্রাহক স্বাচ্ছন্দ্যে তা গ্রহণ করছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটকে সাশ্রয়ী ও জনবান্ধব করার জন্য ইতিমধ্যে সরকার ‘এক দেশ এক রেট’ প্যাকেজ চালু করেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যাকে মেশিন ইন্টেলিজেন্সও বলা হয়। কম্পিউটার সায়েন্সের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি

প্রধানত যে চারটি কাজ করে তা হলো কথা শুনে চিনতে পারা, নতুন জিনিস শেখা, পরিকল্পনা করা এবং সমস্যার সমাধান করা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স স্মার্টফোনে ব্যবহার হচ্ছে সুন্দর সেলফি তুলতে, গ্রাহকের অভ্যাস ও প্রয়োজনীয়তা মনে রেখে কাস্টমাইজড সেবা প্রদান করা, ভয়েস শুনে বিভিন্ন সেবা প্রদান ইত্যাদি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত বছর বিজয় দিবসে সিটি ব্যাংক বিকাশের সাথে যৌথভাবে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এই ঋণ প্রদানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিকাশ হিসাবধারী বিকাশ অ্যাপ ব্যবহার করে ঋণের জন্য আবেদন করলে সিটি ব্যাংক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণ মঞ্জুর করে দেবে। এখানে কোনো মানুষের সাহায্য লাগবে না। আবেদন করার সাথে সাথে লোন পাওয়া যাচ্ছে। কোনো জামানত ও কাগজপত্র লাগছে না। ব্যাংকের কোনো ঋণ প্রসেসিং ফিও নেই। বিকাশ অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স থেকে মাসিক ভিত্তিতে ঋণ আদায় করা হয়ে থাকে। ইন্টারেস্ট রেটও সহনীয়। ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা এই সুবিধা গ্রাহকরা পাচ্ছেন। ব্যাংকিং খাতে এটা একটা যুগান্তকারী কার্যক্রম। এছাড়া গার্মেন্ট কারখানায় রোবটের ব্যবহার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। ওয়ালটন কারখানায় ফ্রিজের কম্প্রেসার অ্যাসেম্বেল করতে ব্যবহার করা হচ্ছে রোবোটিক প্রযুক্তি। আইসিডিডিআরবি ‘কারা’ নামে টেলি অপথালমোলজি প্রযুক্তি দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যান্সি শনাক্তের একটি আধুনিক পদ্ধতি চালু করেছে। ‘বন্ডস্টাইন’ সফলভাবে মেডিক্যালের প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানোর জন্য আইওটি ডিভাইসের মাধ্যমে স্মার্ট ট্র্যাকিং ব্যবহার করে আসছে।

ব্লক চেইন টেকনোলজি হলো তথ্য স্থানান্তর ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ প্রযুক্তি। এই পদ্ধতিতে একটির পর একটি চেইন আকারে বিভিন্ন ব্লকে সংগ্রহ করে প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কোনো কাজ করা যায়। এটা এমন একটি বণ্টনযোগ্য ডাটাবেইস, যাতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর মধ্যে সব লেনদেনের তথ্য নথি আকারে সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিটি লেনদেন আবার সিস্টেমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা যাচাই করা যায়। একবার কোনো তথ্য সিস্টেমে গেলে তা স্থায়ীভাবে থেকে যায়, তা ডিলিট করা যায় না। এটি নির্ভুলভাবে কাজ করে। বর্তমানে নেটওয়ার্ক সুরক্ষা এবং ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ব্লক চেইন খুবই জনপ্রিয় ও কার্যকর। দেশের দুর্নীতি কমানো এবং

জনগণের তথ্য সংরক্ষণের জন্য, অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সব কাজে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশও ইতিমধ্যে এ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। তবে সেটা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে এটা যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল রেকর্ড ব্লক চেইনের মাধ্যমে স্টোর করা হয় এবং এ সকল তথ্য ডাক্তারদের চিকিৎসাসেবা প্রদানে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। আমাদের দেশে বেসরকারি বড়ো বড়ো হাসপাতালে সীমিতভাবে এই প্রযুক্তিগত সেবা দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফৌজদারি আদালতে প্রবেশন, জামিন, সাজার মেয়াদ নির্ধারণ ও অপরাধপ্রবণতা নিরূপণে সহায়ক হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে জব মার্কেটে। অটোমেশনের ফলে শিল্প-কলকারখানা হয়ে পড়বে যন্ত্রনির্ভর। একদিকে প্রচলিত শ্রমবাজারের অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ কর্মীরা চাকরি হারাবে, অন্যদিকে নতুন ধারার শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্পবিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই বেশি মূল্যবান হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে অফ-শেয়ারিংয়ের পরিবর্তে রি-শেয়ারিং প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবে। অর্থাৎ যেসব উৎপাদনপ্রক্রিয়া আগে উন্নয়নশীল দেশে হস্তান্তর করা হয়েছিল সেগুলো আবার উন্নত দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মানুষকে ১০০ বছর সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এখনকার প্রজন্ম আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত ও সচেতন হচ্ছে। আমাদের শিশু-কিশোররা জন্ম থেকেই টেকনোলজির দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিশ্ববাসীর দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ ইতিবাচকভাবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে নিজেকে পরিচিত করতে সক্ষম হবে—এটাই প্রত্যাশা।

লেখক : ফ্রিল্যান্সার

ওমিক্রনে ভয় নয়, সচেতনতা জরুরি

অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ

২০১৯ সালের ১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে সর্বপ্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী শনাক্ত হয়। সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশেও এ ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ২০২০ সালের ৮ মার্চ। ইতোমধ্যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে ভাইরাসটি। বিশ্বে এখনো দাপট দেখাচ্ছে, করোনাভাইরাসের ডেল্টা কিংবা বিটা ভেরিয়্যান্ট। এরই মধ্যে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে এবং বিশ্বের শতাধিক দেশে শনাক্ত হয়েছে করোনার নতুন ভেরিয়্যান্ট অতিসংক্রমক ওমিক্রন।

ওমিক্রনের উৎপত্তি সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত করে কিছু জানা না গেলেও এটুকু জানা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে এই ভেরিয়্যান্ট সম্পর্কে প্রথম জানানো হয় ২৪ নভেম্বর। বর্তমানে যেসব ভেরিয়্যান্ট রয়েছে সেগুলোর সাথে ওমিক্রনের বড়ো ধরনের পার্থক্য রয়েছে। জেনেটিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এটি একেবারেই ভিন্ন একটি শাখা থেকে এসেছে।

ওমিক্রন দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী। ডেল্টার চেয়ে মৃত্যুর হার কম হলেও এটি সংক্রমণের দিক থেকে করোনাভাইরাসের আগের যে কোনো ভেরিয়্যান্ট বা ধরনকে ছাড়িয়ে গেছে। ওমিক্রন নিয়ে দুশ্চিন্তা যেমন আছে, তেমনি আছে স্বস্তির কারণও। আর সেটা হলো ওমিক্রন ডেল্টার মতো প্রাণঘাতী নয়। ডেল্টায় আক্রান্ত হলে যেখানে মৃত্যুর হার শতকরা ২ থেকে ৩ জন। সেখানে ওমিক্রনে আক্রান্তের মধ্যে মৃত্যুর হার শতকরা ০.০৩ শতাংশ। অর্থাৎ ওমিক্রনে আক্রান্ত হলে প্রায় ৩৩০০ জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। করোনায় আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রেও ওমিক্রন অনেক স্বস্তিকর। কারণ যেখানে ডেল্টায় আক্রান্তদের একটা বড়ো অংশই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, সেখানে ওমিক্রনে আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তির হার মাত্র ০.৩৯ শতাংশ।

গত ১৮ জানুয়ারি কোভিড-১৯-এর জিনোম সিকোয়েন্সি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছি। গত ৮ ডিসেম্বর থেকে গত ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সংগৃহীত স্যাম্পলের ২০ শতাংশ ওমিক্রন ভেরিয়্যান্ট এবং ৮০ শতাংশ ডেল্টা ভেরিয়্যান্ট পাওয়া যায়। গবেষণায় মোট ৭৬৯ কোভিড পজিটিভ রোগীর ন্যাযোফ্যারিনজিয়াল সোয়াব স্যাম্পল থেকে নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সির

মাধ্যমে করোনাভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। গবেষণায় ৯ মাস থেকে ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত রোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ২১ থেকে ৫৮ বছর বয়সের রোগীদের সংখ্যা বেশি। কোভিড আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাদের কো-মরবিডিটি রয়েছে, যেমন–ক্যান্সার, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস তাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। পাশাপাশি ষাটোর্ধ্ব বয়সের রোগীদের দ্বিতীয়বার সংক্রমণ হলে সে ক্ষেত্রে মৃত্যুঝুঁকি বেশি পরিলক্ষিত হয়।

জিনোম সিকোয়েন্সির প্রাপ্ত ফলাফল সর্বশেষ ৮ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সংগৃহীত স্যাম্পলের ২০% ওমিক্রন ভেরিয়্যান্ট এবং ৮০% ডেল্টা ভেরিয়্যান্ট পাওয়া যায়। এই ওমিক্রন ভেরিয়্যান্ট ৪ গুণ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লাখ। মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার জনের। বিশ্বে এ পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি, মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৫৮ লক্ষ।

ডেল্টা ভেরিয়্যান্টের চেয়ে ওমিক্রন ভেরিয়্যান্টে অনেক বেশি infection ছড়াচ্ছে বলে প্রতীয়মান। ওমিক্রন ভেরিয়্যান্ট ভাইরাসের জেনেটিক কোডে ডেল্টা ভেরিয়্যান্টের চেয়ে বেশি ডিলিশন মিউটেশন পাওয়া গেছে, যার বেশির ভাগ ভাইরাসটির স্পাইক প্রোটিন রয়েছে। এই স্পাইক প্রোটিনের ওপর ভিত্তি করে বেশির ভাগ ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। স্পাইক প্রোটিনের বদলের জন্যই প্রচলিত ভ্যাকসিনেশনের পরেও ওমিক্রন সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে কোনো কোনো ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর দুই ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়া ছিল। তৃতীয়বারের মতো সংক্রমণ রোগী পাওয়া গেছে। হাসপাতালে ভর্তি রোগী থেকে সংগৃহীত স্যাম্পলে জিনোম সিকোয়েন্স করে ডেল্টা ভেরিয়্যান্ট পাওয়া গেছে। যেহেতু ওমিক্রন সংক্রমণে মৃদু উপসর্গ রয়েছে, সেটা হাসপাতালে ভর্তি রোগীতে ওমিক্রন না পাওয়ার কারণ হতে পারে। পাশাপাশি মৃদু উপসর্গের রোগীদের মধ্যে টেস্ট না করার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। তাই প্রাপ্ত ফলাফলের চেয়েও অনেক বেশি ওমিক্রন আক্রান্ত রোগী undetected অবস্থায় আছে। প্রত্যেক করোনাভাইরাস ভেরিয়্যান্ট বিপজ্জনক এবং মারাত্মক অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যু হতে পারে। পাশাপাশি ভাইরাসের নিয়মিত মিউটেশনের আমাদের প্রচলিত স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে। তাই করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

ওমিক্রনের উপসর্গ এবং ওমিক্রনে নাক দিয়ে পানি পড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ৭৩ শতাংশের; মাথা ব্যথা থাকছে ৬৮ শতাংশ ক্ষেত্রে; ক্লান্তিতে অবসন্ন অনুভব

করছে ৬৪ শতাংশ রোগী; ৬০ শতাংশ রোগীর হাঁচি হচ্ছে; গলা ব্যথাও হচ্ছে ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে; ৪৪ শতাংশ রোগীর খুব কাশি থাকছে; ঠান্ডায় গলা ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা ৩৬ শতাংশের; কাঁপুনি হচ্ছে ৩০ শতাংশ রোগীর; জ্বর আসছে ২৯ শতাংশ রোগীর; মাথা ঝিমঝিম করার প্রবণতা ২৮ শতাংশের; মস্তিষ্কে ধোঁয়াশার প্রবণতা আছে ২৪ শতাংশের; ২৩ শতাংশের পেশিতে ব্যথা, টান ধরছে এবং এবার গন্ধের অনুভূতি হারাচ্ছে মাত্র ১৯ শতাংশ রোগী এবং ১৯ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা দেখা যায়।

ডেল্টার চেয়ে ওমিক্রনে আক্রান্ত রোগীর অসুস্থতা তুলনামূলক কম হলেও ওমিক্রন বিপজ্জনক হতে পারে। বিশেষ করে যারা টিকা গ্রহণ করেনি তাদের জন্য। নিজেকে, পরিবারকে এবং দেশবাসীকে করোনার ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি বাসার বাহিরে গেলে নিয়মিত মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। করোনা পরীক্ষার পরিমাণ বাড়াতে হবে। পরীক্ষার পর রোগ শনাক্ত হলে দ্রুত কোয়ারেন্টিনে বা আইসোলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। টিকা গ্রহণকারীদের সংক্রমণের হার খুব কম। তাই টিকা কার্যক্রমে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। সকল ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে।

সর্বশেষ সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি সবাইকে মেনে চলতে হবে। ওমিক্রন বা ডেল্টা যে ধরনই হোক না কেন, সবাইকে সতর্ক থাকতেই হবে। তা না হলে অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে আমাদের সবাইকে। আগামীতে করোনামুক্ত হোক ধরণি–এই প্রত্যাশা করি।

লেখক : উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে পদ্মা সেতু

ইয়াকুব আলী

ডিসেম্বর, ১৯৯৬। জীবনের প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর শেষে ঢাকায় ফিরছিলাম। তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না। আমার হাতে ঘড়িও ছিল না। শীতের পড়ন্ত বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেট থেকে রওনা করে নগরবাড়ী ঘাটে পৌঁছার পর এশার আজান হয়। ঘাটে বাস-ট্রাকের দীর্ঘ সারি। একাই ভ্রমণ করছিলাম। ঠগ-বাটপারের খপ্পরেই পড়ি কিনা ভেবে পেটে ক্ষুধা নিয়ে বাসেই বসে থাকি। কখনো ঝিমুনি আসে, আসে তন্দ্রা। ফেরিঘাটের নৈমিত্তিক হইচইসহ নানারকম শব্দে ঘুমানোর উপায়ও নেই। মনে পড়ে, আমাদের বাস যখন ফেরিতে মাঝনদীতে তখন দূরের মসজিদের মাইক থেকে ভেসে আসছিল ফজরের আজান। এভাবে রাতটি কেটে গিয়েছিল ফেরি পার হতে। এর দেড় বছর পর ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় ৪.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু। একটি সেতুর কারণে বদলে গেছে গোটা উত্তরবঙ্গের জনজীবন। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছে লাখ লাখ মানুষ। শস্যাবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে কৃষিজমিতে। ফল, ফসল, সবজি থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গে উৎপাদিত সব ধরনের পণ্য ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। গতি সঞ্চারিত হয়েছে দেশের অর্থনীতিতে।

রো রো ফেরিতে কেবল পদ্মা নদী পাড়ি দিতে লাগে প্রায় আড়াই ঘণ্টা; কিন্তু ফেরিতে ওঠার সিরিয়ালের অপেক্ষা? দুই-তিন ঘণ্টা থেকে সাত-আট ঘণ্টা। ঈদসহ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনো তার চেয়েও বেশি সময় কেটে যায় ফেরিঘাটে। ফেরির অপেক্ষায় ঢাকার হাসপাতালে রেফার করা কত মুমূর্ষু রোগী প্রাণ ত্যাগ করেছে পদ্মার ওপার! আবার আবহাওয়ার মর্জি ভালো না থাকলে অনিশ্চয়তার শেষ নেই। কখনো দুই-তিন দিনও বন্ধ থাকে ফেরি সার্ভিস। এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আর যা-ই হোক ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটতে পারে না। এছাড়া নদী পারাপারে ফেরি দুর্ঘটনাসহ নৌডুবিতে কত প্রাণহানির ঘটনাই না ঘটেছে। এখানেই পদ্মা সেতুর গুরুত্ব নিহিত।

বঙ্গবন্ধু (যমুনা) সেতুর চেয়েও আরও বেশি সম্ভাবনা নিয়ে জাতির জন্য উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে পদ্মা সেতু। এপারে মুন্সীগঞ্জের মাওয়া আর ওপারে শরীয়তপুরের জাজিরা। দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার ও প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। ২৫ জুন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। যমুনা সেতুর কাজ শুরু হওয়ার

আগে পদ্মার ওপর সেতুর কথা কারো মাথায় আসেনি। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় বসেই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯৯৯ সালেই হয় প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ফলে সরাসরি উপকৃত হবে তিন বিভাগের ২১ জেলার মানুষ। এগুলো হলো খুলনা বিভাগের খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা; বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি এবং ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী। বহু পথ ঘুরে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে কোনো কোনো জেলার ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। পদ্মা সেতু খুলে দিলে চাপ কমবে পাটুরিয়া ঘাট ও বঙ্গবন্ধু (যমুনা) সেতুর ওপর। এই প্রথম শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুরসহ আরও কয়েকটি জেলার সঙ্গে ঢাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর দূরত্বও কমে যাবে বহুলাংশে। ঢাকা থেকে বরিশালের দূরত্বই কমবে প্রায় ১০০ কিলোমিটার। ঢাকার গাবতলী থেকে আরিচা হয়ে বরিশালের দূরত্ব ২৪২ কিলোমিটার। সায়েদাবাদ থেকে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে এই শহরটির দূরত্ব হবে ১৫৬ কিলোমিটার। আবার গাবতলী থেকে আরিচা হয়ে ঝিনাইদহ-যশোর হয়ে খুলনার দূরত্ব ২৯২ কিলোমিটার। পদ্মা সেতুর রুটে হবে ২৪৭ কিলোমিটার। বরিশাল থেকে তিন ঘণ্টায়, খুলনা থেকে চার ঘণ্টায়, ফরিদপুর থেকে দুই ঘণ্টায়, যশোর থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছানো যাবে।

কেবল মানুষের চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্যই নয়, মালামাল পরিবহণেও আসছে গতি। যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর, সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর, বাগেরহাটের মোংলা বন্দর, পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরের পণ্য ঢাকা ও অন্যান্য জেলা কিংবা বিভাগীয় শহরে পৌঁছে যাবে সহজেই। মোংলা ও পায়রা বন্দরের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভারি শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টির কথা বলছেন অর্থনীতিবিদরা। মোংলা বন্দর এলাকায় বেশ কয়েকটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে এবং গড়ে উঠছে গার্মেন্টসহ রপ্তানিমুখী শিল্প। একদিকে বন্দর আর অন্যদিকে ঢাকার সাথে সরাসরি যোগাযোগে সময় কমে আসায় পুরো অঞ্চলের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেও মনে করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ওপরও চাপ কমবে।

খুলনা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুরের মাছ, যশোরের সবজি আর ফুল, বরিশালের ধান ও পান, সাতক্ষীরার আম-লিচুসহ অন্য ফলফলাদি

ও দেশি হাঁস-মুরগি সহজেই নিয়ে আসা যাবে ঢাকায়। এসব এলাকার বহু পণ্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাইরে যেত না। বৃহত্তর ফরিদপুরের মাছ ঢাকার বাজারে পাঠানোর কথা চিন্তাও করা যেত না। অথচ গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও ফরিদপুরের বিল ও নিম্নাঞ্চলগুলো মুক্ত জলাশয়ের মাছের জন্য বিখ্যাত। সেতুর কারণে এসব জেলার সব ধরনের কৃষিপণ্য তাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বাজারে দ্রুত যেতে পারবে। শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম-সিলেটসহ বড়ো জেলা শহরগুলোতেও এসব পণ্য প্রবেশের সুযোগ পেতে যাচ্ছে। যশোরের ফুল রাজধানীসহ সারা দেশে বাজারজাত করা হয়। দেশে ফুলের বাজার দিন দিন বড়ো হচ্ছে। সেতু চালু হলে বিদেশে ফুল রপ্তানিরও দ্বারোন্মোচন ঘটবে। মোটকথা, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে কৃষি খাতে বড়ো ধরনের গতিশীলতা আসছে।

পর্যটকদের কাছে বড়ো আকর্ষণের নাম সুন্দরবন ও কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের প্রতি অদম্য আগ্রহ রয়েছে শিক্ষার্থী ও পর্যটকদের মাঝে। এতদিন আসা-যাওয়ার দীর্ঘ সময়ের ঝক্কি এবং অনিশ্চিত পদ্মা পাড়ি দেওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের অনেকেই সুন্দরবন ভ্রমণের উৎসাহ হারাতেন। পর্যটনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মানুষের কাছে কুয়াকাটা-সুন্দরবন আর ‘দিল্লি দূর-অস্ত’ থাকছে না। বাস্তবতা হলো, পর্যটন কেবল শহুরেদের মধ্যে আটকে নেই। এখন কিন্তু মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের লোকজনও দল বেঁধে গাড়ি ভাড়া করে অহরহই কক্সবাজার, সিলেট যাওয়া-আসা করছেন। তাঁদের তালিকায় নতুন করে যুক্ত হবে সুন্দরবন ও কুয়াকাটা। আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন আগ্রহী হবেন পর্যটন বিস্ময় কক্সবাজার, পাহাড়-অরণ্যের লীলাভূমি সিলেট এবং ভাটির হাওর পরিদর্শনে। আর সারা দেশের মানুষ ছুটবে একবারের জন্য হলেও নিজের চোখে দেশের দীর্ঘতম সেতুটি দেখতে। দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা পদ্মা সেতুকে আলোকিত করে রাখবে রাতেও। বিশেষ দিনগুলোতে সেতুর লাইটিং ছড়াবে আলোর ছটা। শুধু পদ্মাপারের মানুষ নয়, আলোকসজ্জা বা আর্কিটেকচারাল লাইটিং দেখার জন্য সারা দেশ থেকে ছুটে আসবে সৌন্দর্যপিপাসু মানুষ। সেতুর নানা বৈচিত্র্যের অন্যতম আকর্ষণ এই লাইটিং। ফলে সেতুকে কেন্দ্র করেও পর্যটন খাতে বিরাট প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার হবে।

প্রমত্তা পদ্মার ওপর সেতু নির্মাণে প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক। একে তো প্রবল স্রোত। তার ওপর ঢেউ। এসবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে প্রকৌশলীদের। মাটির স্তর না পেয়ে পাইলিং করতে গিয়েও ছিল প্রতিবন্ধকতা। মূল নদীর

মধ্যে ১৫০ মিটার পর পর বসানো হয়েছে ৪২টি পিলার। তবে সড়কের সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে দুই প্রান্তে আরও অনেক খুঁটিই রয়েছে। দু'পাশে সড়কের সঙ্গে সংযোগ মিলিয়ে সেতুটি ৯.৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। পদ্মা নদীর পানির স্তর থেকে ৫০ ফুট উঁচুতে বসানো হয়েছে প্রতিটি স্প্যান। একেকটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। স্প্যান বসেছে মোট ৪১টি। স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের বেশি হলে কনক্রিটের পরিবর্তে কাঠামোতে স্টিল ব্যবহার করা হয়। স্টিল কাঠামোর কারণে সেতুর ওজন কম হয়। ফলে ভূমিকম্পে তা ঘাত সহনীয় হয়। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ৮ মাত্রার ভূমিকম্পেও সেতুর কিছুই হবে না। নির্মাণকালে ভাসমান ক্রেনের সাহায্যে সেতুতে স্টিলের স্প্যান বসানো হয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী হাতুড়ি ব্যবহারের কথা আমরা জেনেছি পত্রপত্রিকায়। সেতুর স্থায়িত্ব হবে ১০০ বছরেরও বেশি। ব্যবহৃত টেকনিকে নতুনত্ব আছে বলেই পদ্মা সেতু নিয়ে স্টাডি করবেন প্রকৌশল বিষয়ের বিদেশি ছাত্র ও গবেষকগণ। এটি আমাদের জন্য গৌরবের। এটি দ্বিতল একটি সেতু। ওপরে চার লেনের সড়কে চলবে বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার, মোটরসাইকেল ইত্যাদি। আর নিচে থাকছে রেলপথ। যান চলাচল শুরু হওয়ার পর পর শুরু হবে সেতুতে রেললাইন স্থাপনের কাজ। সেতুতে টোলের হার এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে ১৫-১৬ বছরের মধ্যেই নির্মাণ ব্যয় উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, সেতু পুরোপুরি চালু হলে দেশের জিডিপিতে এটি ১.২ শতাংশ অবদান রাখবে। বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পদ্মা সেতুর অবদান ২ শতাংশের কাছাকাছি চলে যাবে।

এই সেতু কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নয়, বরং সারা দেশের সংযোগ সেতু। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে বাকি অংশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করছে এই সেতু। শেখ হাসিনার অনড় মনোভাবের কারণেই অনেক পানি ঘোলা হওয়ার পরও ২০১৪ সালের ৭ ডিসেম্বর শুরু হয় দেশের বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্পের নির্মাণকাজ। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও চোখ রাঙানিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রোজ্জ্বল হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে প্রমাণিত হয়েছে 'আমরাও পারি'। আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী রাষ্ট্রনেতা হিসেবে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু আমাদের স্বনির্ভরতার প্রতীক। এটি বাংলাদেশের একটি বড়ো সম্পদ। আমাদের অহংকার। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতীক।

লেখক : সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (চ.দা), তথ্য অধিদফতর

Role of media in implementing National Integrity Strategy

Md. Abdul Jalil

The National Integrity Strategy (NIS) is a comprehensive set of goals, strategies, and action plans aimed at increasing the level of independence to perform with accountability, efficiency, transparency, and effectiveness of state and non-state institutions in a sustained manner. It is a holistic approach toward good governance, which is very much related to the concept of a corruption-free service system in public and non-public institutions.

Although ‘Corruption’ is a frequently used word, most commonly it is defined as ‘abuse of entrusted power for private gain’. General people believe that in many cases public offices at all levels misuse their positions for personal gain or to serve a few people.

Keeping the citizens’ perception in mind about corruption, the government of Bangladesh formulated NIS outlining the vision titled ‘A happy and prosperous Golden Bengal’ and the mission identified as ‘Establishment of good governance in the state and the society’.

Bangladesh first introduced NIS in 2012 in line with the guidance and directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. After the independence of the country, Bangabandhu, while addressing a public meeting advised to citizens ‘The nation must be united against corruption. If public opinion is not mobilized, corruption cannot be stopped by enforcement of law alone.’

This directive of the Father of the Nation became the intrinsic spirit of our NIS focused on establishing a corruption-free welfare state aiming to ensure equal opportunity for every citizen enjoying the benefits of prompt public service delivery without any hindrance.

NIS is an exclusive approach to fighting against corruption or abuse of entrusted power. We must have the courage to say ‘Wrong is wrong even if everybodz is doing it’. On the other hand, we should have that much mental strength in promoting the spirit ‘Right is right even if no one is doing it’.

The spirit of the Constitution is that Bangladesh would be a just and fair society. Meantime, several laws have been enacted, organizations set up and systems and processes developed for the prevention of corruption. But all those initiatives couldn't reduce corruption at the desired level. That's why the necessity of comprehensive preventive measures was perceived.

The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) treaty also recognizes the importance of both preventive and punitive measures in this regard. According to article 5.1 of the UNCAC, a comprehensive approach must be taken at the national level to prevent corruption. As a signatory to the UNCAC, it has become obligatory for Bangladesh to formulate a strategy to combat corruption.

NIS is a strategy of the government of Bangladesh to prevent corruption and promote integrity in all affairs of individuals, organizations, society, and the state. It is a social movement against corruption. Integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. NIS document expresses 'integrity' as behavioral excellence influenced by ethics, morality, and honesty which is supported by time-tested norms, values, customs, and principles of a society.

It has always been a common perception that the media is a watchdog of the government. This means the media holds government officials and governments accountable. Media checks on the government for possible corruption and/or wrongful or illegal acts. This watchful function of media is what labels it the fourth estate.

Media reflects the norms, culture, and values of a society. Media can lead to evolution and revolution of mind and heart of the people fostering information, literacy, and awareness in the nation. Broadly speaking, the relationship between culture and the media is one of inclusion.

For a better understanding of the role of the media in implementing the NIS, discussion about some facets of public-society- government-media dznamics is essential. Similarly, it is very important to clarifz and find out how media influences government and society and how media forms and cultivates public opinion in favor of implementing NIS through using different tools.

To my understanding, there are three essential roles of mass media in government. First of all, mass media helps people understand the operations of government; secondly, mass media participates in political decisions; and thirdly, mass media holds government officials accountable.

The present government under the prudent leadership of Hon'ble Prime Minister Her Excellency Sheikh Hasina is working relentlessly to bring about a positive change in the society and the governance. To that ends, the government firmly values the freedom of the press as the fourth estate after the executive, legislature, and judiciary in running the statecraft.

And, therefore, the media industry in the country is flourishing day by day. Currently, more than 1300 dailies, 1900 periodicals, 45 TV channels, hundreds of radio stations, and online news portals are operating across the country in meeting citizens' demand for information under the policy support of the Ministry of Information and Broadcasting.

Press Information Department (PID), one of the vital organizations under the Ministry of Information and Broadcasting, has been working sincerely to bridge between the government and the media since its inception. PID, along with other responsibilities demarcated in its citizens charter, is shouldering the responsibility of registering online media including online news portals, online news portals of daily newspapers, e-Paper, online news portals of radio channels, and online portals of private TV channels, which have strategic contributions to creating mass awareness about continuous social changes happening by the influence of different political, economic, socio-cultural and technological factors.

Our mass media is enjoying the full right of expression and free flow of information. The people are also enjoying the right to information in the true sense. To materialize the commitment of the government to the Right to Information for every citizen, the Ministry of Information and Broadcasting enacted 'The Right to Information Act, 2009' and the National Online Mass Media Policy 2017. The Press Accreditation Policy, 2022 is also readz for final approval. As a result, mass media is flourishing as a booming industry catering to the citizen's demands for information.

The role of mass media in nation-building and development is becoming a much-talked-about issue not only in Bangladesh but also all over the world. As the technology and tools of ICT is gradually updating due to influenced by the innovation of the fourth industrial revolution (4IR), a different form of non-conventional media like-satellite television channel, internet protocol television (IPTV), Internet Protocol Radio (IP Radio), Community Radio (CR), YouTube, Facebook, mobile app, online social media, etc. are getting popular in our country. They are also playing a pivotal role in creating social awareness as a change agent. This sort of mass media including social media is playing a very significant role in developing people's opinions and promoting creativity and innovation.

The mass media is playing a critical role in accelerating good governance and controlling corruption as well. They are also fiddling an important role in creating awareness, informing, and educating the public on various issues. Particularly, the mass media can strengthen the implementation process of NIS by raising awareness among citizens through proper reporting on the incidence of corruption, its causes and consequences, and possible remedies.

Citizens' sensitization is an essential part of the motivation process, which needs to focus on. The media can sensitize the citizen about their rights with the emphasis on the Right to Information, Citizens' Charter, and Grievance Redress System of the government. Reporting on the incidence of integrity to recognize the honest people of the society by the media, especially social media can play a catalytic role. This will heighten the confidence and trust levels of the society for maintaining and applauding integrity, honesty, and dedication. Unfortunately, there is a deep-rooted attitude of normalization of corruption in people's daily experience and thus stands as a major obstacle against the attempt to counter corruption. Considering the importance of challenging such widespread attitudes of civic passivity and disenchantment against corruption and malpractice, media can play a vital role by creating a national discourse on positive terms about the value of integrity, transparency, and accountability.

The Cabinet Division is encouraging the different stakeholders by arranging seminars and symposiums, workshops, and independent studies on the issue of NIS implementation and its various tools. Among the stakeholders, the media workers particularly the

journalists are considered as one the frontliners. Arrangement of multi-sectoral meetings including the seminar for the mass media representatives will be an effective platform to continue the effort of motivating government officials and journalists to work together in implementing NIS for the betterment of our society.

Japan International Corporation Agency (JICA) is working closely with the government of Bangladesh to introduce the concept of NIS through multi-sectoral involvement. As a trustworthy development partner, JICA is extending its continuous financial and technical support and partnership with the Cabinet Division to popularize the concept of NIS in our bureaucracy to ensure transparency, accountability, and good governance while rendering public service. To ensure accountability and transparency of the government, the Cabinet Division is implementing some social accountability tools like the Citizens' Charter, Grievance Redress System (GRS), Right to Information (RTI), etc. which contribute effectively to implementing the NIS program.

It is firmly believed that greater collaboration between media and government would create new avenues for the cooperation and dznamic further in achieving our common goal of establishing a just, fair, and corruption-free society in line with the political philosophy, ideal, and spirit of the Father of the Nation,

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The mass media including social media has a great responsibility to be aware of the common people about their rights and duties as citizens. The role and contribution of journalists in implementing NIS by raising people's awareness about its tools and strategies is a significant issue. As an enlightened section of society and a watchdog of the government, journalists from the print, electronic, and online media must play a crucial role in educating people on how to cope with changing scenarios and their mindset in favor of nurturing honesty, integrity, and a corruption-free value system in the society for the greater interest of the country and the future generation.

Writer : Senior Deputy Principal Information Officer, Press Information Department

মেঘের আড়ালে সূর্যের হাসি

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

মাওয়া পুরাতন ঘাটের এক চায়ের দোকানে বসে ষাটোর্ধ্ব আসাদুলের সাথে কথা হচ্ছিল। পরিশ্রমে ভেঙে যাওয়া শরীর। আদি বাড়ি ঝিনাইদহ। প্রায় দশ বছর যাবত এঅঞ্চলে বসতি গেড়েছেন এই ভাঙাড়ি ব্যবসায়ী। মধ্য দুপুরে বসে জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে বনরুটি আর চা খাচ্ছিলেন। এই এলাকায় এখন এমনিতেই লোকজনের আনাগোনা কম। তারওপর মধ্য দুপুর। মাথার ওপর সূর্যের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। এমন অবস্থায় চায়ের দোকানের ছাউনি বড়ো শান্তির জায়গা। খোশ গল্পের একফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, পদ্মা ব্রিজ হয়ে গেল। এখন উদ্বোধনের পালা। কেমন লাগছে আপনার?

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, বছর দশেক ধইরে দেখতাসি মানুষের লঞ্চ আর ফেরিপার হওয়ার কষ্ট। বিশেষ কইরা ঈদের সময়। লাখ লাখ মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতো ফেরির জন্য। লঞ্চ, স্পিডবোটও সময়মতো পাইতো না।স্বচক্ষে দেখসি মানুষের ভোগান্তি। মহিলাদের বাথরুমের ভালো ব্যবস্থাও নাই। আমি কতজনরে বলসি, কিছু মনে না করলে আমার ভাঙা ঘরে আইসা বাথ রুম সারেন। শুধু আমি না, এই এলাকার প্রায় সব মানুষই এমন সাহায্য করসে।

একটু থামলেন আসাদুল। তারপর যেদিকে পদ্মাসেতু, সেদিকে হাত দেখিয়ে বললেন, দক্ষিণের কোটি কোটি মানুষের জন্য সরকার যে কি বানাইয়া দিসে, তা বইলা বোঝানো যাবে না। কত্ত বছরের চাওয়া। কোনো সরকার পারলো না। এই সরকারই জেদ দেখাইয়া শুরু করলো, শেষও করলো। এবার যেন গলাটা ধরে এলো আসাদুলের। জিজ্ঞেস করলাম, কিসের জেদ। কার জেদ? কার ওপর জেদ? কণ্ঠনালীতে আবেগের যে দলা পাকিয়ে উঠেছিল, তা ঝেড়ে ফেলতেই যেন হালকা কাশি দিলেন পোড় খাওয়া এই মানুষটি। থুতনির নিচে বেড়ে ওঠা হালকা দাড়িতে আঙুল বোলালেন।

এতক্ষণ হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসে ছিলেন। এবার দাঁড়ালেন। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটি দোকানির হাতে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আরও ছয়-সাত জন লোক বসেছিলেন। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন, আমার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। একাত্তরের যুদ্ধ আমি দেখসি। দেখসি মুক্তিবাহিনীর জেদ। চোখে মুখে জেদ। বাংলার মানুষ এই জেদ পাইসিলো শেখের কাছ থেইকা। শেখ সাহেব শেখাইসিলো কেমন কইরা মরণ হাতে নিয়া লড়াই করতে হয়। সাথে সাথে চা দোকানি কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো, হেই শেখের

বেটি হইসে বাপের মতোই। দ্যাশের অপমান সহ্য করলো না। মাথা উঁচা রাইখাই বিরিজ বানাইয়া ছাড়লো। এই রকম ভালা ভালা জেদ একজন প্রধান মন্ত্রীর থাকা দরকার, তাইলে দেখবেন দ্যাশটারে কোথায় নিয়া যাইবো।

দোকানির উদ্দেশ্যে বললাম, ভাই ব্রিজ চালু হলে তো আপনার এখানে ঘাট বন্ধ হবে। আপনার চায়ের ব্যবসার ক্ষতি হবে না? দ্রুত জবাব পেলাম, রিজিকের মালিক আল্লাহ। সত্যি কথা কি, এখনই ব্যবসা অর্ধেক হইয়া গেসে। তবে ব্রিজ চালু হইলে দেখার জন্য লোক আসবে, নদীতে ঘুরতে আসবে। তাই বেশি চিন্তা করিনা। দ্যাশের জন্য বিরাট একটা কাজ হইসে, এইডাই বড়ো শোকর। আমার মত এক-দেড়শো মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে যদি কোটি কোটি মানুষের উপকার হয়, অসুবিধা কি? দরকার হইলে সবজি চাষ করুম। সরকার ঢাকা থেকে মাওয়া যেই রাস্তা বানাইসে, ঢাকায় জিনিসপত্র পাঠাইতে লাগে মাত্র তিরিশ মিনিট। সবজি চাষ কইরা ভালোই পেট চালান যাইবো।

ওপাশের বেঞ্চিতে বসা এক যুবক তাকে থামিয়েব ললেন, শোনেন, আমরা বাঙালিরা ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে পারসি, এটাই বড়ো কথা। তাঁর বলার ঢংয়ে মনে হলো, লোকটি শিক্ষিত। জিজ্ঞেস করলাম, কি করেন ভাই? রাস্তার উল্টো পাশে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই কাঠের দোকান আমার আব্বার। এখন আমিই দেখা শোনা করি। আমরা মাওয়াবাসীরা গর্ব করে বলতে পারবো, বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু আমাদের এখানে। ১৬ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খা, আবেগ, স্বপ্ন বাস্তবায়নের নতুন রূপ দেখতে চাইলে মাওয়া আসবেন। দেখেন, আমরা বাঙালিরাও পারি।

চোখের ভিতর থেকে যেন এক অন্যরকম জ্যোতি বেরিয়ে আসছে যুবকটির। চোয়াল শক্ত হয়ে এল তার। বলে চললেন, এই সেতু নিয়া কত ষড়যন্ত্র হইসে। দেশের ভিতরে বাইরে কত পানি ঘোলা করা হইসে যেন সেতুটা না হয়। কত চোখ রাঙানি। কিন্তু আমাদের প্রধান মন্ত্রী ঠিক তাঁর বাবার মতই, দেশের স্বার্থে যা যা করা দরকার তাই করে ফেলেন, কারো মুখের দিকে তাকানোর দরকার মনে করেন নাই। সাথে সাথে দোকানিও বলে উঠল, একদম ঠিক কথা। এই এলাকায় বিরিজ দরকার ছিল, বানাইয়া ফেলসে।

এ সময় তিন তরুণ দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে একজন পকেট থেকে টিস্যু বের করে মুখ মুছে দোকানির দিকে তাকিয়ে বললো, মামা, দুধ চিনি দিয়া তিন কাপ চা দেন। একটি খালি বেঞ্চি দেখে তিনজনই বসে পড়লো। এক কোণায় বসে আমাদের আলোচনা শুনছিলেন এক মাঝ বয়সি লোক। এবার বলে উঠলেন, আমি বরিশালে সবজি চাষ করি। সময় বেশি লাগে

বইলা এই সবজি ঢাকায় পাঠাইতে পারিনা। ফেরি সময়মত পাইলে কম পক্ষে ছয় থেইকা সাত ঘন্টা লাগে। হেই সবজির অবস্থা কি দাঁড়ায় বুঝেন। আর এখন লাগবো মাত্র তিনঘন্টা। আমার মত কৃষকদের বিশাল সুবিধা হইসে। একই রকম সুবিধা পাবে মাছের খামারিরা। আমি যোগ করলাম, শুধু বরিশাল না, দক্ষিণ অঞ্চলের একুশ জেলার অর্থনীতি ও সমাজে আসবে অকল্পনীয় পরিবর্তন। এ সেতু চালু হওয়ার পর সড়ক ও রেল-দুই পথেই দক্ষিণ বাংলার মানুষ স্বল্পতম সময়ে ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবেন। সবজি মাছের ট্রাকগুলোকে দিনের পর দিন আর ফেরি পারাপারের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবেনা। ঝড়বৃষ্টিতে ফেরি বন্ধ থাকার কারণে যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয় তাও থাকবে না। এ অঞ্চলের কৃষক, মাছের খামারি, তাঁতি, ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ী রাজধানী ঢাকার সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারবে। আবার তারা রাজধানী থেকে কাঁচামাল জোগাড় করে নিয়ে আসতে পারবে সহজে।। আপনারা কি জানেন, এরই মধ্যে পদ্মা সেতু হবে শুনে দক্ষিণ অঞ্চলে নতুন নতুন ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পকারখানা, আবাসন প্রকল্প, রিসোর্ট, ইউনিভার্সিটি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, মানব সম্পদ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রেস্টুরেন্ট ও নানা ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে তোলার হিড়িক পড়ে গেছে। খুলনা ও বরিশালে জাহাজ বানানোর শিল্পের প্রসার ঘটতে শুরু করেছে। বরিশাল শহরের আশপাশের জমির দাম দ্বিগুণ হয়ে গেছে। পদ্মা সেতুর দুই পাড়ে এক্সপ্রেসওয়ের পাশের জমির দাম তিন-চারগুণ বেড়ে গেছে। আগামী পাঁচ বছরে শুধু বরিশাল বিভাগেই পাঁচশ থেকে এক হাজার নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে।

নবাগত তিন তরুণের একজন বলে উঠলো, আমরা সিলেট থেকে আসছি। আমরা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমার বাড়ি দিনাজপুর। পাশের বন্ধুদের দিকে দেখিয়ে বললো, ওদের একজনের বাড়ি সিলেট, আরেক জনের বাড়ি চট্টগ্রাম। আমরা পদ্মা ব্রিজ দেখতে আসছি । নৌকায় ঘুরে ঘুরে ব্রিজ দেখব। আমাদের প্ল্যান, এই ব্রিজ উদ্বোধন হয়ে গেলে আমরা কুয়াকাটা বেড়াতে যাবো। পরে আবার যাবো সুন্দরবন। আমাদের ওই অঞ্চলের মানুষরা ফেরির যন্ত্রণায় দক্ষিণ বঙ্গে ঘোরার ইচ্ছা বুকের ভিতরেই রাখতো। এবার তাদের ইচ্ছা পূরণ হবে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি যেটা বলছিলেন, পদ্মা ব্রিজের ফলে একটা সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হলো।

আমি আরো যোগ করলাম, পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে রেলের পাশাপাশি গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট অবকাঠামোও স্থাপিত হবে। এর ফলে ঢাকার সঙ্গে কলকাতা, ভুটান ও নেপালের যোগাযোগের সময় প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে। এর প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ একটা সুবিধাজনক অবস্থায় চলে

আসবে। পায়রা ও মোংলা সমুদ্র বন্দরের কাজও অনেক বাড়বে। নতুন নতুন জাহাজ ভিড়বে।

আমি দেখলাম আড্ডায় যোগ দেওয়া প্রতিটি মানুষের চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে। গল্প শুনছে আর এক একটি নতুন স্বপ্ন যেন খেলা করছে চোখের তারায় তারায়। বুঝতে পারলাম, আমার কথাগুলো খুব কঠিন মনে হচ্ছে না ওদের কাছে। সাহস করে একধাপ এগিয়ে আলোচনায় একটু কঠিন বিষয় ঢুকিয়ে দিলাম। বললাম, পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ হারে মোট দেশজ উৎপাদন যাকে সংক্ষেপে বলে জিডিপি, তা বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। এটা সহজ বা ছোট খাটো বিষয় না কিন্তু দেশের উন্নয়নের জন্য বিশাল এক হাইজাম্প।

শাহজালাল ইউনিভার্সিটির ছাত্রটি আবার বলা শুরু করল, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। পদ্মার যে প্রবল স্রোত, তাতে এই নদীতে ব্রিজ বানানো মোটেও সহজ কাজ না। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই পদ্মা সেতুর কাজ শেষ হয়েছে। সে বলে চললো, এই সেতু আমাদের জন্য এক শিক্ষণীয় উদাহরণ। আমরা এর থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের অর্থে, নিজেদের যোগ্যতায় বড়ো বড়ো আরও জটিল প্রযুক্তির ব্রিজ বানাবো। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ থেকে আমাদের প্রযুক্তিবিদ, প্রকৌশলী, সরকারি কর্মকর্তারা অনেক কিছুই শিখেছেন। এই আড্ডার প্রথম বক্তা আসাদুল অনেকক্ষণ পর ফের কথা বললনে, শুনতাসি সরকার নাকি এরই মধ্যে পদ্মার দুই পাড় উন্নত করার জন্য কাজ হাতে নিসে।। কী কী জানি বানাইবো, সবগুলার নামও কইতে পারিনা। তাকে সাহায্য করলাম, পদ্মার দুই পাড়ে অলিম্পিক ভিলেজ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি, হাইটেক পার্ক, আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, বিমান বন্দরসহ নানা উন্নয়ন কাজের কথা ভাবছে সরকার।

যুবক ব্যবসায়ী সাথে সাথে আমার কথা কেড়ে নিল, ওই পাড়ে একটা তাঁতের পল্লি গড়ে উঠতাসে শুনসি। বললাম, হ্যাঁ। পদ্মা সেতুর কাছেই দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে শেখ হাসিনা তাঁত পল্লী গড়ে উঠছে। এখানে থাকবে আধুনিক আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সব সুযোগ সুবিধা। পদ্মা সেতুর আশপাশে গার্মেন্ট ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়বে। সবাই জানে, লাখ লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় এসে কাজকর্ম করতে বাধ্য হচ্ছে। এখন তাদের সংখ্যা কমে আসবে। দক্ষিণ বাংলায় নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে। এখানেই তারা নতুন নতুন শহরও বানাবে।

আমি বললাম, পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর আগামী পাঁচ বছরে দশ লাখ অর্থাৎ বছরে দুই লাখ মানুষের নতুন করে আয়-রোজগারের সুযোগ ঘটবে। দশ বছর

পর এ সংখ্যা তিনগুণ হয়ে যাবে। দিনাজপুরের সেই তরুণ মোবাইল ফোন দেখিয়ে বললো, মোবাইলের ফেইসবুক আর ইউটিউবে হাজার হাজার গুজব ছড়ানো হয়েছে। বলা হয়েছে, পদ্মাব্রিজ হবে না, মজবুত হবেনা। যত্তসব বিভ্রান্তি ছড়ানো। কোনটাই ধোপে টিকে নাই। এখন বলছে, খরচ বেশি হয়েছে। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো তার। বলে চললো, আরে ভাই, জাপানিরা বলছে, ১৬ থেকে ১৭ বছরের মধ্যেই টাকাটা উঠে আসবে।

অনেকক্ষণ পর দোকানি আবার মুখ খুললো। আড্ডা জমে গেলে তার চা বিক্রিও বেড়ে যায়। মুখে বিস্তৃত হাসি নিয়ে বললো, সরকার পদ্মা সেতুর উপর যে লাইটিং করতাসে শুনলাম, এইডা দেখার জন্য এই অঞ্চলে মানুষের আনাগোণা আরও বাড়বো।

'হ। তোমার তাইলে আর চিন্তা কি? তোমার ব্যবসা তো মিয়া জমজমাটই থাকবো।' আসাদুলের তড়িৎ মন্তব্য।

আমার অর্ধেক চাও খাওয়া হয়নি। টের পেলাম চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। চায়ের কাপ ফেরত দিয়ে দোকানিকে টাকা দিলাম। অনেক গল্প হলো। আমার সঙ্গী যারা আশেপাশে ছিল, তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তারা, যাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছে। তথ্য অধিফতরের এই দলটি এসেছে ঢাকা-মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেস পরিদর্শনে।

ফেরার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিলাম ঢাকার দিকে। আকাশে তখন মেঘ জমতে শুরু করেছে।

ঢাকা আসতে আসতে মাথায় ঘুরতে থাকলো আড্ডার কথা। কি আবেগ আর স্বপ্ন নিয়ে মানুষগুলো পদ্মা সেতুকে ভাবে। পদ্মা সেতু নিয়ে যে চোখ রাঙানিগুলো ছিল মানুষেরা বুঝে গেছে, সব পিছনে ফেলে পদ্মাসেতু আজ সত্যি। আকাশের কালো মেঘের মতোই।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি মানবের অসাধ্য সাধন ও দুরূহ বাধা অতিক্রমের অদম্য শক্তির প্রতি পূর্ণ আস্থার কথা আবার ঘোষণা করতে চাই।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমনটি বলেছিলেন, 'আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজেদের শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা', (আত্মশক্তি)।

নিজেদের শক্তিকে পরখ করার জন্য পদ্মা সেতুর নির্মাণ ছিল জনযুদ্ধ। যে যুদ্ধে দেশবাসীকে এক করতে পেরেছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। একাত্তরে জাতির পিতা যেমনটি করে ছিলেন।

লেখক- সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

Green financing on boom

A H M Masum Billah

Ensuring the balance of the environment is crucial to ensure the sustainable development of an economy. At the heart of our journey from a least developed country to a developing country over the past five decades has been the development of the industry. Especially the labor-intensive manufacturing sector has flourished after independence in 1971 under the leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Following this, the industrial sector is in a strong position in the economy of the country as guided by the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. The government is working to increase the contribution of the industrial sector to GDP from 35.38 percent to 40 percent, as a part of endeavor of the Government to materialize Vision 2041.

However, while striving hard for rapid economic development of the country, the government has also emphasized on maintaining the balance of the environment. Because, if the climate and the natural environment are endangered, then the economy is also endangered. Imbalances in climate and natural environment and catastrophic natural disasters are taking place as a result of global industrialization and the development of urban civilization. This scenario has forced the countries to adopt remedial measures. And Bangladesh is no exception.

It is difficult to protect the environment without the expansion of green industry in the economy. For this reason, the whole world is now leaning towards green investment and sustainable business. The establishment of eco-friendly green factories is being given worldwide priority to prevent environmental pollution and protect the interests of factory workers.Green or sustainable banking encompasses all the three foundations of sustainable development, likely economic development, social development and environmental protection. Bangladesh started its journey in the field of green financing in 2009. After this, Bangladesh Bank has formulated Green Banking Policy Guidelines in 2011 and started Sustainable Finance Department in Bangladesh Bank in 2015.

The policy in its preamble defines the sustainability in the context of financing by the banks and Non-bank financial institutions (NBFI). 'Sustainability in this context means the quality of not being harmful to the environment or depleting natural resources, and thereby supporting long-term ecological, social balance and governance (ESG).To fulfil this objective, the policy will observe the trends and practices of environment friendly banking, climate financing, carbon financing, green bond, sustainable financing and corporate social responsibilities performed by the banks.The policy covers about 172-billion-dollar financing in renewable energy, green building, transportation, urban solid waste management, urban water management and agriculture in Bangladesh from 2018 to 2030.

The policy considers promotes green financing of 8 products in renewable energy sector, 3 products of energy and resource efficiency, 1 product alternative energy, 1 product of solid waste management, 6 products of recycling and manufacturing of recyclable goods, 5 products of environment friendly brick production and environment friendly establishments for financing wages or direct labor costs. Financing can be done for liquid and solid waste management project by the government or local government. Green finance will be available for trading of 12 renewable energy products, 4 energy and resource efficiency products and I alternative energy product. 23 eco-friendly products have been given priority for trading in the guideline. The policy also urges the banks and non-bank financial institutions for financing to include technological advancement and featured machineries and technologies in 11 sectors to minimize waste and emissions and recycling of energy and material in the production process.Green Banking Policy Guidelines have allowed term financing for 68 green products, projects and initiatives under 11 categories.

However, few environmentally friendly green initiatives are being financed and invested by the banks and other financial institutions. Though the policy envisions to finance at least 5 per cent of the total financing to be disbursed in the field of green projects, less than one and a half percent of the bank financing is being spent on green projects at present, a report from the Daily Samakal says.

Bangladesh is one of the strongest countries in the world in terms of green financing. Bangladesh is ahead in this sector as compared to many Asian countries including neighboring India, Pakistan

and Sri Lanka. A report by Sustainable Banking Network under the International Finance Corporation (IFC) reveals this progress recently. Establishing and operating a green factory has so many benefits. It reduces operating costs and foreign buyers are usually attracted to green products and services. There are incentives from the side of the government as well. At present corporate tax for green garments industries has been reduced to 10 percent.

At present most of the green factories of the country are garments industries. 155 numbers of green garments industries are operating in the country. These factories are doing well even through the ongoing Covid-19 pandemic situation. These factories have achieved internationally recognized Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) form the USA. With this number Bangladesh has become the country with the highest number of green garments factories. Of these factories, 48 have received Platinum, 95 Gold, 10 Silver and 4 Certified certificates. Besides, about 500 eco-friendly factories under construction in the country. However, journey of green industrialization should be extended to other promising industries as well. For example, Bangladesh has potential in tannery and leather industry.

Unfortunately, still there is a lack of interest of the industry entrepreneurs about transforming the existing industries into green ones. This scenario is more striking in the non-garments industries. Competent industry owners working in other industries should actively consider to transform their factories and banks (including non-banking financial institutions) should actively consider these factories also. Green projects, which are getting financial support, should be monitored and evaluated properly to ensure that the 'green' values is properly maintained.

In the context of achieving SDGs by 2030 and reaching the dream of an industrial and developed country by 2041 we have no choice but to strengthen the process green transformation in the industrial sector. We just hope a concerted effort of all the stake holders in this regard.

Writer : Senior Information Officer, Press Information Department

হজের গুরুত্ব ও করণীয়
মুফতি মাওলানা রুহুল আমিন

কাবা শরিফ বা বায়তুল্লাহ শরিফের ঘরই আল্লাহ তায়ালার ঘর। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকে এই পবিত্র ঘর এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আকাশের ফেরেশতা যেমন বায়তুল মামুর তাওয়াফ করেন, দুনিয়ার ফেরেশতাও তদ্রূপ বায়তুল মামুর সাদৃশ্য দুনিয়ার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতেন। আদম (আ.)ও এই ঘর তাওয়াফ করতেন। তারপর সমস্ত পয়গম্বরই এই ঘর দর্শন ও তাওয়াফ করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক পেয়ারা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই ঘরের কাছে প্রেরণ কররেছেন, এই মহান ঘরের জিয়ারত ও তাওয়াফের জন্য সমগ্র বিশ্বের মুসলমানকে হুকুম করেছেন এবং পাপমুক্তির স্থান নির্বাচিত করেছেন। বিবেকের বিচারে এবং মহব্বতের আইনে প্রত্যেক মুসলমানের এই কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে হজ করা প্রয়োজন ছিল; কিন্তু আল্লাহর রহমতে শরিয়তের হুকুম সহজ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেছেন, আল্লাহর উদ্দেশে আল্লাহর ঘর জিয়ারত করা সেই সমস্ত মানুষের ওপর ফরজ, যাদের সেখানে পৌঁছানোর মতো অসংগতি রয়েছে। এ কারণেই সমস্ত ফিকহের কিতাবে হজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত লাগানো হয়েছে।

হজের সফরের কদমে কদমে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের অভ্যাস হয়। আল্লাহর অবারিত রহমতের স্থান কেন্দ্রীয় দরবার বায়তুল্লাহে গিয়ে যেন মানুষ নিজেকে সঁপে দিতে পারে। তাই আত্মশুদ্ধির জন্য এই সফর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষ যদি একটু খেয়াল করে, তবে এই সফরে অনেক কিছু অর্জন করতে সক্ষম হয়। 'সবর ঈমানের অর্ধেক'–এই সফরে মানুষের সবরের অভ্যাস খুব ভালোভাবে হয়। সবর অর্থ নফসের মতের বিরুদ্ধে নফসকে বাধ্য করা। খাওয়াদাওয়া, ওঠাবসা, কথাবার্তা–সব ক্ষেত্রেই নফসকে তার মতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করা। ফলকথা এই যে বিভিন্ন অসহনীয় কাজকে সহনীয় করে নফসকে পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। মুজাহাদাই মুশাহাদা অর্জন করার সোপান যেহেতু বাড়ির চিন্তা, বিষয়-সম্পত্তির চিন্তা ইত্যাদি সাংসারিক সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করেই মানুষ হজে গমন করার ইচ্ছা

করে। বাকি থাকে শুধু এক নফসের বিষয়। তা দমন করার উত্তম সুযোগ এই সফরে পাওয়া যায়। অবশ্য বান্দার কোনো কাজই ইরাদা ও চেষ্টা ছাড়া হাসিল হয় না। কাজেই আত্মশুদ্ধির ইচ্ছা ও চেষ্টা করা দরকার। শরিয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকামের মধ্যে আল্লাহর হুকুম পালন করে, আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি হাসিল করে আখিরাতের মুক্তি লাভ করাই হজের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য। হজের মধ্যে হজরত আদম (আ.) হতে শুরু করে যত পয়গম্বর, গাউস, কুতুব, আবদাল, সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালেহিন ওই পবিত্র স্থানসমূহে তাশরিফ রেখেছেন তাঁদের মাজার এবং স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, যা অবলোকন করলে তাঁদের কামালিয়াত ও মহৎ গুণাবলি স্মরণ হয়। মানুষ ইচ্ছা করলে সেই সমস্ত কামালিয়াত ও গুণাবলি নিজের মধ্যেও অনেকটা আয়ত্ত করতে পারে। যে মৃত্যুকে স্মরণ করলে মানুষের জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায়, তা অর্জন করার প্রধান উপায় হলো হজের এই সফর। মানুষ যখন এই সফরে রওনা হয়, তখন যেন মৃত্যুরই নমুনাস্বরূপ সংসারের মায়া ত্যাগ করে এবং পরিপূর্ণ আত্মশুদ্ধি অর্জন করার এক চেষ্টায় মনোনিবেশ করে।

হজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে কিছু হাদিস রয়েছে সেগুলো হলো নবী আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, (যার ওপর হজ ফরজ হয়েছে তার হজের নিয়ত করা আবশ্যক) এবং যে হজ করার ইচ্ছা করেছে, তার দ্রুত হজ করা প্রয়োজন, তিনি আরও বলেছেন, যার প্রকাশ্য শরয়ী কোনো ওজর বা অভাব নেই, জালেম বাদশাহ যাকে বন্দি করে রাখেনি কিংবা অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী হয়নি সে যদি হজ না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে (তার মৃত্যু মুসলমানের মৃত্যু হবে না) সে ইহুদি হয়ে বা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করুক। (দারেমি); আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কী ভয়ংকর সর্তকবাণী! হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, বান্দার কোনো আমলটি সর্বশ্রেষ্ঠ? হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর রাসুলকে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ 'ঈমান'। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করেন, তারপর কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? হজরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহর পথে যুদ্ধ। তারপর কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? এর উত্তরে হজরত (সা.) বলেছেন, হজে মকবুল, অর্থাৎ যে হজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। (বুখারি ও মুসলিম); নবী আলাইহি অসাল্লাম বলেন, এক ওমরাহ হতে অন্য ওমরাহ পর্যন্ত যা (সগিরা) গোনাহ হয়েছে, ওমরাহ তার জন্য কাফফারা এবং হজে মকবুলের পুরস্কার বেহেশত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। হযরত

(সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ করবে এবং হজের মধ্যে কোনো প্রকার গোনাহের কাজ না করবে এবং কোনো ফায়েশা কথা, ঝগড়া, গালাগালি অথবা কোনো নফসানি খাহেশের (নাফরমানির) কাজ না করবে। সে যখন হজ করে ফিরে আসবে, তখন সে সমস্ত গোনাহ হতে এমন পবিত্র হয়ে যাবে, যেমন নবজাত শিশু হয়ে থাকে। হজ আল্লাহর দরবারে কবুল হলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়, এ কথাই এ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। সগিরা গোনাহ তো মাফ হয়ই, অনেক আলেমের মতে, হজে মাবরুরের দ্বারা কবিরা গোনাহও মাফ হয়ে যায়। কারণ হজের মধ্যে বহু তওবা-এস্তেগফার করা হয়। কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি করে মাফ চাওয়া হয়। যার কারণে গোনাহে কবিরাও মাফ হয়ে যায়। কিন্তু হক্কুল এবাদ, অর্থাৎ পরের দেনা মাফ হয় না। আল্লাহ পাকের কত বড়ো রহমত যে বান্দা ফরজ আদায় করলে সে তার কর্তব্য পালন করে; কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে আরও কত পুরস্কার দান করেন।

হজ থেকে ফিরে আসার পর প্রত্যেক হাজি সাহেবকে অত্যন্ত সতর্কতা ও পরহেজগারির সাথে জীবনযাপন করতে হবে। হজের নাম দিয়ে হাজি পদবি লাগিয়ে কোনো ধরনের সুবিধা ভোগ করা যাবে না। অপ্রয়োজনে হজের গল্প, মোয়াল্লেমদের দোষ-ত্রুটি বা ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করা যাবে না। হজে যা টাকাপয়সা খরচ হয়েছে তার জন্য আফসোস থেকে বিরত থাকতে হবে। এসব কাজে হজের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে আবার হজ করে এসে, হালাল কাজকর্মও করতে চায় না, এটাও ভুল। হালাল জীবিকা নির্বাহে কোনো দোষ নেই। কিন্তু খবরদার! হালাল করতে গিয়ে হারামের মধ্যে, লোভের মধ্যে ও পাপের মধ্যে অভ্যস্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন এবং হজে মাবরুর নসিব করুন।

লেখক : খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

ডিজিটাল টাকা ওড়ে

মুস্তাফা মাসুদ

করিম সাহেব দুই দিন ধরে ভারি দুশ্চিন্তায় আছেন। একটি সমস্যার কোনো কূলকিনারা একা একা করতে পারছেন না। স্ত্রী সুফিয়া বেগম বাতের ব্যথায় কোঁ কোঁ করছেন, তাঁর সাথেও আলাপ করা যাচ্ছে না। টানা বৃষ্টির কারণে বাড়ি থেকে বেরোনো যাচ্ছে না, তাই সবজান্তা নকিব সাহেবের সাথে আলাপ করে সমস্যাটার সমাধানও করতে পারছেন না। ওদিকে রোজকার মতো নকিব সাহেবও আসছেন না, তা-ও ওই বৃষ্টির কারণেই। এজন্য খুব টেনশন করছেন করিম সাহেব।

তাঁর সমস্যাটা কী? করিম সাহেব একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আড়াই বছর আগে তিনি গ্রামের বাড়ি চলে এসেছেন সস্ত্রীক। সিদ্ধান্ত আগেই ছিল গ্রামেই সেটেলড হবেন। ছেলেমেয়েরা ঢাকাতেই আছে আর তারা থাকবেন গ্রামে। শুধু মাঝে মাঝে তাদের ওখানে বেড়াতে যাবেন।

গ্রামে এসে ভালোই কাটছিল দিনকাল; কিন্তু করোনা মহামারি সব গুবলেট করে দিল। করিম সাহেবের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, পেনশনার সঞ্চয়পত্রের অ্যাকাউন্ট সবই ঢাকার ব্যাংকে। আগে মাস ছয়েক পর পর ঢাকায় যেতেন সঞ্চয়পত্রের মুনাফা তুলতে। তাতে ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনিদের সাথে এবং বন্ধুদের সাথে দেখা হতো, আবার সঞ্চয়পত্রের মুনাফা তোলার কাজও হতো। কিন্তু এখন করোনার মহামারিকালে ঢাকায় যাওয়া অসুবিধা বলে পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফা তোলা যাচ্ছে না। বৃদ্ধ বয়সে ঢাকায় যাওয়ার ঝুঁকি নিতেও সাহস পাচ্ছেন না তিনি। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অবশ্য সমস্যা নেই, উপজেলা সদরের ব্যাংক থেকে অনলাইনে টাকা তোলা যায়। সমস্যা হয়েছে তিন মাস অন্তর পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফা, অর্থাৎ তাঁর মূল রুটিরুজির টাকা তোলার ক্ষেত্রে। বর্তমানে অবশ্য এটিও অনলাইনে চলে গেছে, কিন্তু করিম সাহেবের অ্যাকাউন্ট পুরোনো (২০১৮ সালের) বলে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না; কারণ ম্যাচিউরড না হওয়া পর্যন্ত (২০২৩) এই স্কিমের জন্য নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা যাচ্ছে না; ফলে তা অনলাইনেও যেতে পারবে না। এখন সশরীরে ব্যাংকে হাজির হয়ে কিংবা অথ রাইজড পারসন দিয়ে সরাসরি ব্যাংক থেকে মুনাফার টাকা তোলার বিকল্প নেই।

সুতরাং বুঝেই দেখুন, করিম সাহেবের দুশ্চিন্তা কোথায়। প্রথম দিকে করোনার সংক্রমণ কম থাকায় দুবার ঢাকায় গিয়েছেন টাকা তুলতে; কিন্তু সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়ে যাওয়ায় গত এক বছর নট নড়নচড়ন–একবারও ঢাকায় যাননি। এদিকে

স্ত্রীর একার পেনশনে কত আর চলে! তাই বাধ্য হয়েই 'পুঁটির তেলে পুঁটি ভাজার মতো করে সংসার চালাতে হচ্ছে। ফলে টেনশন আর মেজাজ খারাপ এখন সহজেই হচ্ছে তাঁর। আজ সেটি সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে পৌঁছে গেছে।

এই 'সুপারলেটিভ' অবস্থায় করিম সাহেব দারুণ অস্বস্তিতে বারান্দায় পায়চারি করছেন। হঠাৎ দেখেন 'সবজান্তা' নকিব সাহেব আসছেন ছাতা মাথায় দিয়ে। পরনে হাঁটার পোশাক, পায়ে কেডস। তিনিও অবসরপ্রাপ্ত, করিম সাহেবের প্রায় সমবয়সি। কিন্তু তাঁর হাবভাব, বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ আর তেজি চলাফেরা দেখলে বয়স অনেক কম বলেই মনে হয়। তিনি এসেই হাসতে হাসতে বলেন : করিম ভাই, আজ একটা অন্যরকম কবিতা লিখেছি, শুনবেন? বলেই শুরু করেন কবিতা।

নকিব সাহেবের কবিতা শেষ হতে পারে না। তিরিক্ষি মেজাজে করিম সাহেব বলেন : রাখুন আপনার 'হাওয়ায় ওড়ে টাকা'! কোথায় টাকা উড়ছে? দেখান আমাকে, আমি লাফিয়ে লাফিয়ে ধরি আর ট্যাঁকের মধ্যে ভরি! আমি মরছি আমার জ্বালায় আর উনি করিম সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে নকিব সাহেব বলেন : কী ব্যাপার, করিম ভাই? এনি প্রবলেম? স্যরি, ভেরি স্যরি। আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারিনি। কী হয়েছে, ভাই? নো চিন্তা, আমি তো আছি নাকি! করিম সাহেব সব খুলে বলেন নকিব সাহেবের কাছে। নকিব সাহেব বলেন : পুরোনো অ্যাকাউন্টে পেনশনার স্কিমের মুনাফার টাকা তোলা যাচ্ছে না, ঠিকই। এই সাময়িক অসুবিধা মেনে নিয়ে কাউকে অথরাইজ করে ঢাকায় পাঠানো যাবে, টাকাও তোলা যাবে। সেই সমস্যা সিঙ্গেল এবং সমাধানযোগ্যও। কিন্তু অন্য অঢেল সুবিধার দিকে একবার তাকান, দেখবেন টাকা সত্যিই উড়ছে! আমার কবিতার 'টাকা ওড়া'টা অবশ্য শ্লেষার্থক, ব্যঙ্গার্থক বা কদর্থক; সেটা ধান্ধাবাজ অসৎ লোকদের উদ্দেশে লেখা। কিন্তু আমি যে 'টাকা ওড়ার' কথা এখন বলছি তা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল অগ্রগতির এক সফল ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। ই-প্রযুক্তির কারণে এখন টাকা শুধু ওড়েই না; ভাসে, ছোটে দ্রুত এক স্থান থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করে দেশে কিংবা বিদেশে; কিন্তু মানুষ তার অবস্থানেই থাকে। কোথাও দৌড়াদৌড়ির ভোগান্তি পোহাতে হয় না। সব তেলেসমাতি দু'আঙুলের টোকায় কম্পিউটার নামের এক আশ্চর্য বাক্সের মধ্যেই সব 'জাদুর মূল' আর তা ঘটাচ্ছেন বাংলাদেশের এক্সপার্ট পারসনরা; আর তার নেপথ্যের মূল শক্তি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈপ্লবিক ডিজিটাল কর্মসূচি তথা তাঁর তথ্য উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তীক্ষ্ণ মেধা, নিরলস প্রচেষ্টা এবং অদম্য সদিচ্ছা। কী অবাক কাণ্ড, তাই না? আপনার টাকা যেখানে যে ব্যাংকেই জমা থাকুক না কেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনি সেই ব্যাংকের স্থানীয়, অর্থাৎ আপনার কাছাকাছি শাখায় যান এবং চেক কেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তুলে নিন। নগদ টাকা জমাও দিতে পারেন এভাবে। তাছাড়া বেশ কয়েক বছর থেকে

মাসিক পেনশনের টাকাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হয়ে যাচ্ছে পেনশনধারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই ব্যাংকের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন। সেখান থেকে পেনশনধারীরা অনায়াসে টাকা তুলতে পারছেন। কিছুদিন থেকে পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার টাকাও অনলাইনে তোলা যাচ্ছে কী মজা তাই না? আপনারটাও ম্যাচিউরড হয়ে গেলে আর চিন্তার কিছু থাকবে না।

নকিব সাহেবের দীর্ঘ লেকচারের মাঝে এতক্ষণ ডুবে ছিলেন করিম সাহেব। আগের সেই রাগ, সেই টেনশনের ছিটেফোঁটাও আর নেই তাঁর চোখেমুখে। তিনি স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন নকিব সাহেবের মুখের দিকে। তা দেখে নকিব সাহেবেরও খুব ভালো লাগে। তিনি পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আবার বলেন : ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যায় কোথায় পৌঁছে গেছি আমরা! দেখুন করোনাকালে বাইরে বেরোনো, সমাবেশে যোগদান কিংবা বড়ো কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন সশরীরে করা ঝুঁকিপূর্ণ; সরকারিভাবে নিষিদ্ধও তা। কিন্তু ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে সেসব করাও সম্ভব হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমেই তা সম্পন্ন হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষের মতো একটা বিশাল কর্মসূচি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেই সম্পন্ন হচ্ছে এ তো আমার চোখের সামনেই ঘটছে!

করোনাকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকলেও আজ অনেক প্রতিষ্ঠান অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে, পরীক্ষা নিচ্ছে এবং প্রমোশনও দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের; অবশ্য সব প্রতিষ্ঠানে এই সুযোগ নেই; তবে অদূর-ভবিষ্যতে এই ই-লার্নিং কার্যক্রম প্রয়োজনে যে সারা দেশের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে তা অনুমান করা কি খুব কঠিন? আরও দেখুন এই প্রযুক্তি এখন নানা প্রয়োজনে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে; যার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন নিবন্ধন, টিকাকার্ড ও টিকা সনদ সবই সম্ভব হচ্ছে এই ডিজিটাল বিস্ময়ের কারণে। ১০-১২ বছর আগের বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশের অবস্থার কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, নানারকম বিল পরিশোধ, অনলাইন কেনাকাটাসহ অন্যান্য ই-কর্মসূচির দিকে তাকালে তা অনুধাবন করা যায়। টেকসই ভৌত অবকাঠামো এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি এই আইটি সেক্টরের বিস্ময়কর অগ্রগতি নিকট-ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে শামিল করতে কার্যকর অবদান রাখবে, এ আশা আমরা করতেই পারি। আর তখনই সফল হবে বঙ্গবন্ধুর আজন্মলালিত 'সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তিনি সফল হোন, সার্থক হোন–এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

লেখক : শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, অনুবাদক ও প্রাক্তন সাংবাদিক

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

ড. মাহিন খান

জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৬ নম্বর অভীষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে 'নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন : পরিকল্পিত পানির উৎস সংরক্ষণ উদ্যোগ ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সকলের জন্য, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা।' এই অভীষ্টটি বাস্তবায়নে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ও অধিদপ্তর বিশেষ করে তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে নানা ধরনের প্রচার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করছে। শুধু তা-ই নয়, এ বিষয়ে জনগণের মতামত ও সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের নিকট যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছে।

আমরা সবাই জানি, জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশ স্বাধীনের সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি, আর বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ১৬ কোটি অতিক্রম করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ এ দেশের জনসংখ্যা ২০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এতে পরিবেশের পরিবর্তনজনিত উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য নগরায়ণ ও শিল্পায়ন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। এতে করে পানি, বায়ু ও মাটির দূষণ বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দেবে।

বর্ধিত হারে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনের ফলে পানিদূষণ এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি। পানি দূষণরোধে বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে, যা কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। সারা দেশে যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান পানি দূষণ করে চলছে তাদের সকলকে পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে নিয়মিত মনিটর করা পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে এটা প্রয়োজন। এজন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার,

পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের পানিদূষণের জন্য মূলত দায়ী শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য, নগর এলাকার বর্জ্য, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক বর্জ্য, নৌযান থেকে চোয়ানো তেল, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও আর্সেনিক। এসব দূষণের বিষয় বছরের পর বছর কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণে আমাদের নদীগুলোর পানির মান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের নদীগুলোর পানিদূষণের মাত্রা শীতকালে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বর্ষা মৌসুমে পানির মান কিছুটা উন্নতি হলেও তা মানসম্মত হয় না। দেশের শিল্পায়ন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও কুমিল্লার মতো গুটিকয়েক এলাকায় সীমাবদ্ধ। সে কারণে এসব এলাকার নদীগুলোর পানি বেশি দূষণের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকার প্রধান দুটি নদী বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ তীরে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানার বর্জ্যের কারণে এ নদী দুটির পানি মারাত্মক দূষণের শিকার হচ্ছে। এ নদী দুটির পানি এখন আর ব্যবহার উপযোগী নয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নর্দমার নোংরা পানি ও নগরীর কঠিন বর্জ্যের চূড়ান্ত গন্তব্যে পরিণত হয় নদী। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬০ জেলার এক লাখ ২৬ হাজার ১৩৪ বর্গকিলোমিটার এলাকার খাবার পানি আর্সেনিক দূষণের শিকার। বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে টেকসই উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় দেশের পানি নিরাপত্তা খাতে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। চর, হাওর, পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা পরিষেবা বিরাজমান। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট। দুর্গম এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের জাতীয় কৌশল ২০১১ অনুযায়ী, পাহাড়ি অঞ্চলের পর উপকূলীয় এলাকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চসংখ্যক দুর্গম ইউনিয়ন অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় এলাকা মারাত্মক ভঙ্গুরতার শিকার। ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এসব এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাড়তি দুর্ভোগের কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার প্রায় ২৫ লাখ মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানির চরম সংকটে ভুগছে। ২০৫০ সাল নাগাদ ওই অঞ্চলের ৫২ লাখ দরিদ্র ও ৩২ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্য ও পানিসংকটের সম্মুখীন হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের এলাকার লবণাক্ত পানি ব্যবহার উপযোগী না হওয়ায় তারা বিভিন্ন

অরক্ষিত স্বাদুপানির উৎস যেমন পুকুরের পানি ব্যবহার করে থাকে। এতে করে ওই এলাকার জনগোষ্ঠী মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবন এলাকার স্কুলগুলোতে কিশোরী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে। কারণ এসব কিশোরী শিক্ষার্থীকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পরিবারের জন্য নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে হয়।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় উপকূলীয় এলাকার ন্যায় পাহাড়ি এলাকা, হাওরাঞ্চল, চরাঞ্চল ও বস্তিবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সব সময়ই একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। আমাদের দেশের বেশির ভাগ বস্তিই নিচু ভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় সেখানকার জনগণ জলাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পাশাপাশি স্বাদুপানির সংকট ও খাবার পানির সমস্যা বস্তিবাসীসহ চরাঞ্চল, হাওরাঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জন্য সব সময় একটি বড়ো ইস্যু। এসব এলাকার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যঝুঁকি অন্য যে কোনো এলাকার মানুষের থেকে বেশি। এসব এলাকায় পানিবাহিত রোগ বিশেষ করে ডায়রিয়া, আমাশয়ের মতো রোগ এবং ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগ বেশি দেখা যায়। দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষিত জলাশয় পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রাম ও শহর এলাকার সব মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিমধ্যেই দেশের ৯৮.৩ শতাংশ জনগণকে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহুরে মানুষের জন্য শতভাগ এবং গ্রামের মানুষের জন্য ৯০ শতাংশ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিমধ্যেই দেশের ৮১.৫ শতাংশ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এসডিজির এ লক্ষ্যমাত্রাটি ২০৩০-এর আগেই বাস্তবায়ন সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

দেশ স্বাধীনের পর থেকেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে এক যুগ আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। আজকের বাংলাদেশ সকল সমস্যাকে সফলভাবে সমাধান করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা আপার সম্ভাবনার এক বাংলাদেশ। ২০৪১-এর উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ।

লেখক : সমাজকর্মী

বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত বাংলাদেশ

ড. আজাদ শাহরিয়ার

একছটা আলো বদলে দিয়েছে সমগ্র বাংলাদেশকে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, কর্মময় জীবন ও জীবিকার অবধারিত পথ উন্মোচন—এ সবই সম্ভব হয়েছে বিদ্যুৎপ্রাপ্তির সহজলভ্যতার কারণে। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের সর্বত্র বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। দেশের শতভাগ মানুষ এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০০৯ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে দেশে সাকল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ৪২০০ মেগাওয়াট। তখন দিনের অধিকাংশ সময় লোডশেডিং হতো। বিদ্যুৎ সুবিধা খুব কম পাওয়া যেত। বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৫ হাজার ৫৫৬ মেগাওয়াট। আর গত ১৬ এপ্রিল ২০২২-এ দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১৪ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো বিবেচনায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অর্জন বিদ্যুৎ খাত। যেখানে শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আজ থেকে দুই দশক আগেও অনেকেই বিশ্বাস করেনি ২০২১ সালের মধ্যে ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকারের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের এ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব সদ্য স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দায়িত্ব নিয়েই তিনটি মৌলিক কাজ করেছিলেন। সেগুলো হলো জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা নিশ্চিত করা, জ্বালানি অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং এসব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য দক্ষ নেতৃত্ব, জনবল তৈরিসহ তাদের ক্ষমতায়িত করা। বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশের হাজারো সমস্যার মাঝেও তিনি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি পেট্রোবাংলাকে গড়ে তুলে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তেল গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণনের। আর পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে একত্রিত করে গঠন করে ছিলেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। আর খনিজসম্পদ কয়লা, কঠিন শিলাসহ অন্যান্য অনুসন্ধান, উন্নয়নকাজ করার জন্য গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ মিনারেল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই

প্রথম 'মেরিটাইম বাউন্ডারি আইন' প্রণয়ন করে। বঙ্গবন্ধু তেল-গ্যাসসহ নানা সম্পদ বঙ্গোপসাগরে পাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু যখন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন তখন দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো ২০০ মেগাওয়াটের কিছু বেশি, যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল ছিল। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশের সব মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার। আর তাই তিনি মানুষের বিদ্যুৎ পাওয়ার বিষয়টিকে অধিকার হিসেবে সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছিলেন। তৎকালীন বিশ্বে যা ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানির সহায়তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশালে বিদ্যুৎ উৎপাদন হাব স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। বিগত এক দশক ধরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত হারে বেড়েছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এশিয়ার সকল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ছিল সবচেয়ে বেশি ৮.১৫ শতাংশ। দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সময়ে, অর্থাৎ ২০৩০ সালে বাংলাদেশের বিদ্যুতের সম্ভাব্য চাহিদা হবে ৩৩ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪০ সম্ভাব্য চাহিদা বাড়বে ৫২ হাজার মেগাওয়াট। ২০০৯ সালে মাথাপিছু বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ২২০ কিলোহার্জ, বর্তমান মাথাপিছু বিদ্যুতের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬০ কিলোহার্জ। যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭০০ কিলোহার্জ। ২০৩০-এ লক্ষ্যমাত্রা ৮১৫ এবং ২০৪১-এ লক্ষ্যমাত্রা ১৪৭৫ কিলোহার্জ। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। যার মাধ্যমে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করা সম্ভব। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, শিল্পায়ন, কৃষি ও সেবা খাতের বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা যেমন–সৌরবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে এ বর্ধিত চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে তিনটি সোর্স থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বেসরকারি সোর্স এবং গ্রামীণ বিদ্যুৎ কোম্পানি থেকে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কাজটি করে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)। আর বিতরণের কাজ করে ছয়টি প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো–বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি), বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (আরইবি), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

(ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডাব্লিউজেডপিডিসি), ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (এনইএসকো)।

২০১০ সালের পরিকল্পনা অনুযায়ী, কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরের পরিকল্পনায় কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে গ্যাসনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৬ হাজার ৮৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন, ২ হাজার ৯৬১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২০টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সরকারের আরও ১৫ হাজার ৬৬৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৯টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১৪.৩৩ শতাংশ থেকে কমে ৮.৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ২২ লাখ। প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে ৪৮ লাখ ৩১ হাজার ৬০৭টি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে গৃহীত মেগাপ্রকল্পসমূহের অন্যতম রামপাল ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রাসুপার ক্রিটিকাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, রূপপুর ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পায়রা ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ইতিমধ্যে উৎপাদন শুরু করেছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৭০০ মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। সোলার সিস্টেম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬০ লাখ। দেশে মোট সঞ্চালন লাইন আছে ১৩ হাজার ৪০২ কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন আছে ৬.২২ লাখ কিলোমিটার। ২০৩০ সালের মধ্যে সঞ্চালন লাইন ২৮ হাজার কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন ৬.৬ লক্ষ কিলোমিটারে উন্নীত করার লক্ষ্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা বাংলাদেশের জন্য এক মাইলফলক। এর মাধ্যমে সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের বিদ্যুৎ পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার পূরণ করতে সক্ষম হলো। এখন বৈষম্যহীনভাবে দেশের সব মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০৩০ সালে এসডিজি এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব হবে–এটাই প্রত্যাশা।

লেখক : উন্নয়নকর্মী ও ফ্রিল্যান্সার

গুজব থেকে সচেতন হই

ইমদাদ ইসলাম

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলা আরও ১০ দিনের মতো স্বাভাবিকভাবেই চলছিল ২ মার্চ ২০১৩ দিবাগত মধ্যরাত পর্যন্ত সবকিছু। হঠাৎ করে কিছু দুষ্কৃতকারী চারদিকে ছড়িয়ে দিল চাঁদে সাঈদীকে দেখা গেছে। মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল এ ঘটনা। চাঁদে সাঈদীকে দেখা গেছে, কিন্তু কে দেখেছে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এ নিয়ে সৃষ্ট দাঙ্গায় ১৩ জন নিরীহ মানুষ মারা গেল, আহত হলো অনেকে। বাড়িঘর, ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়া হলো। দেশব্যাপী ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হলো। অথচ একটিবারও কেউ ভেবে দেখল না বাস্তবে কোনো ব্যক্তিকে চাঁদে দেখা সম্ভব কিনা। কিছু দুষ্কৃতকারীর দুষ্কর্মে অনেক মানুষের ক্ষতি হয়ে গেল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হলেও কোনোভাবেই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হলো না। এ গুজব যারা রটিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মামলা করলেও সে মামলা আজও নিষ্পত্তি হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ন্যায়বিচার এখনো পায়নি।

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ফেসবুকে গুজব ছড়িয়ে উগ্র, ধর্মান্ধ গোষ্ঠী অগ্নিসংযোগ ও হামলা চালিয়ে ধ্বংস করেছিল কক্সবাজারের রামুর ১২টি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও আশপাশের বসতি। ব্যাপক লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে এক বিরান ভূমিতে পরিণত করে এলাকাটিকে। উত্তম বড়ুয়া নামের এক যুবকের ফেসবুক আইডিতে পবিত্র কোরআন শরিফের অবমাননার ছবি পোস্ট করা হয়েছিল পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনের দাঙ্গায় অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু যারা এই দুষ্কর্মটি করেছিল একবারও তারা ভেবে দেখেনি এটা সত্যি না মিথ্যা।

২০১৬ সালের নাসিরনগরের ঘটনাও একইরকম। রসরাজ নামের এক ব্যক্তির ফেসবুক আইডি থেকে ইসলাম বিদ্বেষী এক পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সূত্রপাত। ৫টি মন্দির ও ৮টি হিন্দুপাড়া জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা গেল রসরাজ একজন নিরক্ষর দরিদ্র মানুষ, ফেসবুক কী তা-ই তিনি জানেন না। সবকটি ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে সমর্থ হলেও বন্ধ করতে পারেনি।

এরও আগে পদ্মা সেতু নির্মাণের শুরুতে গুজবের শেষ ছিল না। প্রতিদিন কোনো না কোনো গুজব কোনোা যেত। করোনাকালে, অর্থাৎ আগস্ট ২০২০ সালে হঠাৎ গুজব রটল পদ্মা সেতুতে শিশুর কাটা মাথা ও রক্ত লাগবে। সেতুর আশপাশের এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। পরবর্তীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে জনমনে স্বস্তি ফিরে এলো।

করোনা নিয়েও কম গুজব ছড়ায়নি। করোনা টিকা নিলে মানুষের ডিএনএ পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং বন্ধ্যাত্ব ডেকে আনতে পারে, এরকম একটা গুজব সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়। এছাড়া দেশি-বিদেশি বিখ্যাত ডাক্তারের নামে করোনার নানারকম চিকিৎসাপত্র ও উপদেশ সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আমরা দেখেছি। এসব ব্যবস্থাপত্র ওই সকল ডাক্তারের না, এমনটা অনেকেই পত্রিকায় জানিয়েছেন। ৬ মার্চ ২০২১ সালে আরও একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সেটি হলো সরকার করোনাকালে শিক্ষার্থীদের ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রত্যয়ন লাগবে। এ গুজবটি সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি ইউটিউবে দেওয়া হয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কারণে এটি বেশিদূর এগোতে পারেনি।

ওপরের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গুজব দুই ধরনের লোকের মাধ্যমে ছড়ায়। এক ধরনের লোক খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এই ঘৃণ্য পথটি বেছে নেয়। এর মাধ্যমে সমাজ বা দেশের কী ক্ষতি হলো সেটা বিবেচনায় না এনে নিজের এবং তাদের লাভবান হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর অন্য এক ধরনের মানুষ আছে, যারা বোকার মতো কোনো কিছু না বুঝেই এ ধরনের ক্ষতিকর কাজে জড়িয়ে পড়ে। এখানে তাদের সরাসরি কোনো লাভ হয় না বরং পরবর্তীতে ক্ষতি হয়।

গুজব ছড়ানোর উদ্দেশ্য সাধারণত চারটি। রাজনৈতিক স্বার্থে, কোনো কনটেন্টকে ভাইরাল করার উদ্দেশ্যে, টাকা কামানোর উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিস্বার্থে। সাধারণত ছয়টি উপায়ে গুজব ছড়ানো হয়ে থাকে। এগুলো হলো : ছবি সম্পাদনা বা টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে, বানোয়াট বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে, সত্য ঘটনার বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমে, নকল অথবা কাল্পনিক বিশেষজ্ঞের ভুয়া বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে, গণমাধ্যমের অপব্যবহারের মাধ্যমে এবং তথ্যের বিকৃতির মাধ্যমে।

ছবি সম্পাদনা বা টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি গুজব ছড়ানো হয়। ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধমন্দিরে হামলা, ২০১৬ সালে নাসিরনগরে মন্দিরে হামলাসহ বেশ কিছু দাঙ্গা অসৎ উদ্দেশ্যে ছবি সম্পাদনা করে ফেইক আইডি ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে করা হয়েছিল। বানোয়াট বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হয়। বর্তমানে বাংলাদেশবিরোধী একটি চক্র অসৎ উদ্দেশ্যে বিদেশে অবস্থান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এমপিসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নামে কুৎসা রটনার অপপ্রচারে লিপ্ত আছে। এটাও এক ধরনের তথ্য সন্ত্রাস। আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার করে তারা এই জঘন্যতম মিথ্যাচারে লিপ্ত রয়েছে। সত্যের বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমেও গুজব ছড়ানো হয়। সাধারণত মানুষ পুরো সংবাদটি পড়ে না, অধিকাংশ মানুষ সংবাদের হেডলাইনটি দেখে সাথে দু-একটি লাইন পড়ে। এখানে অসৎ উদ্দেশ্যে সংবাদের শিরোনাম পরিবর্তন করা হয়, যা মূল সংবাদের সাথে অসংগতিপূর্ণ হয় না। নকল অথবা কাল্পনিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করা হয়। করোনাকালে ভারতের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠির নামে কোভিড-১৯ বিষয়ক পরামর্শ ফেসবুকে দেখা গেছে তার সবই গুজব। জনাব শেঠি সাংবাদিকদের নিজে থেকে জানিয়েছেন, তিনি এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ দেননি। এছাড়া চেনা বিশেষজ্ঞ অচেনা প্রতিষ্ঠানের হয়ে মতামত দেওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের কোনো অস্তিত্ব নেই বলা হয় জনৈক বিশেষজ্ঞ, আবার হয়তো বিশেষজ্ঞ সঠিক আছে মতামত বিকৃত, বিশেষজ্ঞের মতামতের ভুল অনুবাদের মাধ্যমেও গুজব ছড়ানো হয়। গণমাধ্যমের অপব্যবহারের মাধ্যমেও গুজব ছড়ানো হয়। মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ হত্যার পরে অনেক গণমাধ্যমে তাঁর ন্যায়বিচার নিয়ে নানারকম মন্তব্য এসেছিল। ঠিক একইভাবে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন নিয়েও অনেক গণমাধ্যমে সে সময় সঠিক তথ্য আসেনি। সর্বশেষ তথ্যের বিকৃতির মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হয়। এগুলো হয় সাধারণত গবেষণার পদ্ধতিগত বিকৃতির মাধ্যমে, ফলাফলের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং অকার্যকর তুলনার মাধ্যমে।

গুজবের মূল উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে প্রভাবিত করে নিজের বা নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিল করা। এখানে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করা হয় না। গুজবে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর সামান্য কিছু মানুষ অনৈতিকভাবে লাভবান হয়। এতে সমাজ ও দেশের ক্ষতি হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় বলা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করে, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়িলে বা দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয় তাহলে তার এ কাজ হবে একটি অপরাধ। আর এ অপরাধ করলে অপরাধীকে বিজ্ঞ আদালত অনধিক ১৪ বছর ও অন্যূন ৭ বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। তাই সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

দেশ যখন উন্নয়নের মহাসড়ক বেয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে তখন ৩০ লাখ শহিদের রক্তের সাথে বেঈমানি করে হাতে গোনা কয়েকজন দেশে-বিদেশে বসে আধুনিক প্রযুক্তিকে অপব্যবহার করে গুজব ছড়ানোর মাধ্যমে দেশের ক্ষতি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। এরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে কখনোই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না–এটাই হোক মুজিবশতবর্ষে আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

সাম্প্রতিক সময়ে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের উপায়

ডা. সিরাজুম মুনিরা

বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ ডায়রিয়াজনিত রোগ। WHO-এর তথ্য মতে, প্রতিবছর ডায়রিয়ায় পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রায় ৫,২৫,০০০ শিশু মারা যায়। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ১.৭ বিলিয়ন শিশু ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়, অথচ ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য।

বাংলাদেশে প্রতিবছরই সাধারণত শীতের শুরু ও গরম মৌসুমে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই বছর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ডায়রিয়া দেখা দিয়েছে এবং মার্চের মাঝামাঝি থেকে বেশ ব্যাপকহারে তা বাড়তে শুরু করেছে। সাধারণত প্রতিবছর এর প্রকোপ শুরু হয় এপ্রিলের শুরু থেকে এবং ছয় থেকে আট সপ্তাহ তা চলতে থাকে। কিন্তু এই বছর ডায়রিয়া যে শুধু আগেভাগেই শুরু হয়েছে তা-ই নয়, রোগীর সংখ্যা আগের যে কোনো বছরের চেয়ে অনেক বেশি। এ বছর গরম একটু আগেই শুরু হয়েছে। মার্চ মাসে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেখা গেছে, এই ধরনের তাপমাত্রায় খাবারে দ্রুত জীবাণু জন্ম নেয়। এছাড়া করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমে আসার জন্য করোনাভাইরাস বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি পুরো শিথিল হয়ে যাওয়ায় মানুষজনের ঘন ঘন হাত ধোয়া এবং জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করার প্রবণতা কমে আসছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুম প্রদত্ত সারা দেশে ডায়রিয়ার রোগী জানুয়ারি থেকে মার্চ–এই তিন মাসের তথ্যে জানা গেছে, হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া মোট রোগী ৪ লাখ ৬১ হাজার ৬১১ জন। এর মধ্যে মারা গেছে দুজন। ডায়রিয়ায় সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এই বিভাগে আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৫৯ হাজার ২৪৭ জন। দেশের ৮টি বিভাগের হিসাবে দেখা যায়, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ফেব্রুয়ারির চেয়ে মার্চে কমেছে। অন্য সব বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। মার্চ মাসে আইসিডিডিআরবিতে প্রতিদিন গড়ে ১ হাজারের বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে, যা সর্বমোট ২৯ হাজার ৬৮১ জন। রোগী সামলাতে আইসিডিডিআরবি হাসপাতালের বাইরে অস্থায়ী তাঁবু টানানো হয়েছে, যা এখানে সাম্প্রতিক কোনো বছরে দেখা যায়নি। এই সপ্তাহের শুরুতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ডায়রিয়া

আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি। মেয়াদ অনুসারে ডায়রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : স্বল্প স্থায়ী জলের মতো ডায়রিয়া, স্বল্প স্থায়ী রক্তযুক্ত ডায়রিয়া এবং এটা যদি দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়, তবে তাকে বলা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া। স্বল্পস্থায়ী জলের মতো ডায়রিয়া কলেরা সংক্রমণের কারণে হতে পারে। যদি এর সাথে রক্ত থাকে, তাহলে এটাকে রক্ত আমাশয়ও বলা হয়।

ডায়রিয়াজনিত রোগ হয় মূলত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে, সাধারণভাবেই প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যে ডায়রিয়া হয় তার মধ্যে প্রধান কারণ ই-কোলাই ও ভিব্রিও কলেরি ব্যাকটেরিয়া। এগুলো ছড়ানোর মাধ্যমই হচ্ছে এসব জীবাণু দ্বারা দূষিত পানি ও পচাবাসি খাবার। অন্যদিকে শিশুদের মধ্যে শীতকালে রোটা ভাইরাসের কারণে ডায়রিয়া হয়ে থাকে। এই মৌসুমেও শিশুদের রোটা ভাইরাসের কারণে ডায়রিয়া হচ্ছে। এছাড়া শিগেলা ব্যাকটেরিয়াও একটি কারণ। প্যাথোজেনিক জীবাণুর সংক্রমণ ছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু কারণে ডায়রিয়া হতে পারে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে : হাইপারথাইরয়েডিজম, দুধের মধ্যকার ল্যাক্টোজ সহ্য করার অক্ষমতা, অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম ইত্যাদি। এছাড়া কিছু ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ডায়রিয়া হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক কারণ নিশ্চিতভাবে জানার জন্য স্টুল কালচার বা মল পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

ই-কোলাই থেকে যে ডায়রিয়া হয় তাতে বমি হবে, পেট কামড়াবে, তারপর পাতলা মল হবে, রোটা থেকে ডায়রিয়া হলে মলের রং সবুজাভ হবে। শিগেলার হলে অল্প করে নরম মল হবে তবে তাতে মিউকাস ও পরে রক্ত থাকতে পারে। গা-গোলানো ভাব থাকতে পারে। মারাত্মক ডায়রিয়া হলে রাইস ওয়াটার স্টুল, অর্থাৎ চাল-ধোয়ার পানির মতো দেখতে প্রচুর পাতলা পায়খানা হয়। মারাত্মক ডায়রিয়ার রোগীর শরীর থেকে দ্রুত পানি বের হয়ে যায়। চোখ গর্তে চলে যায়, জিহ্বা শুকিয়ে যায়, রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা চলে যায়, অর্থাৎ চিমটি দিলে ত্বক কুঁচকে থাকে, অল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে না। এসব লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে না হলে পানিশূন্যতার কারণে এসব রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি আছে।

কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণত পানি ও খাবারের মাধ্যমে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে পথে-ঘাটে, উন্মুক্ত হোটেল-রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য অনিরাপদ উৎস থেকে পানি ও খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে। নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস চালু রাখতে হবে। বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীরকে মুক্ত রাখার সবচেয়ে ‘কার্যকর টিকা’ হচ্ছে নিয়মিত হাত ধোয়া। রাস্তার পাশে এই সময় খোলা পরিবেশে চটপটি, ফুচকা, আচার, লেবুর শরবত,

আখের রস বা ফল কেটে বিক্রি করা হয়, এগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে এবং বাসিপচা খাবার খাওয়া যাবে না। অত্যধিক গরমে অধিক পানির পিপাসা লাগাই স্বাভাবিক, চেষ্টা করতে হবে নিরাপদ পানি সাথে বহন করার। যেখানে পয়ঃনিষ্কাশন বা স্যানিটেশনব্যবস্থা নিম্নমানের সেখানে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশি তাই উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন বা স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে, বাড়ির চারপাশে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে রোটা ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিতে হবে।

ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর বারবার পাতলা পায়খানা করার ফলে শরীর থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। এর ফলে রোগী পানিশূন্য হয়ে পড়ে। সে কারণে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। ডায়রিয়া শুরু হলে আধা সের/লিটার বিশুদ্ধ পানিতে এক প্যাকেট খাবার স্যালাইন ভালোভাবে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে। বয়স ২ বছরের নিচে হলে তাদের প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১০ থেকে ২০ চা-চামচ ২ বছরের বেশি হলে ২০ থেকে ৪০ চা-চামচ করে যতবার পাতলা পায়খানা হবে ততবারই খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। হাতে বানানো খাবার স্যালাইন ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে। মূলত গরমকালে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। ঠিকভাবে পানি ও লবণ পূরণ করা হলে এটি কখনো গুরুতর আকার ধারণ করে না। বেশির ভাগ ডায়রিয়া এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু ডায়রিয়া হলে ওরস্যালাইন খাওয়া, এমনকি এর চিকিৎসা নিয়ে এখনো রয়ে গেছে কিছু ভুল ধারণা :

উচ্চ রক্তচাপ আছে, এমন রোগীরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে ওরস্যালাইন খেতে বিভ্রান্তিতে ভোগেন। কেননা স্যালাইনে লবণ আছে, তাদের আশঙ্কা ওরস্যালাইন খেলে রক্তচাপ বাড়তে পারে। এটি গুরুতর ভুল ধারণা। প্রতিবার পাতলা পায়খানার সঙ্গে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও লবণ বের হয়ে যায় এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করা না হলে রোগীর পানিশূন্যতা, লবণশূন্যতা–এমনকি রক্তচাপ কমে গিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে মৃত্যুও হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে ওরস্যালাইন খেতে নিষেধ নেই। ওরস্যালাইনে চিনি বা গ্লুকোজ থাকে, তাই ডায়াবেটিসের রোগীরা ওরস্যালাইন খেতে ভয় পান। মনে করেন, ওরস্যালাইন খেলে ডায়াবেটিস বাড়তে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওরস্যালাইনে যে সামান্য চিনি বা গ্লুকোজ আছে, তা অন্ত্রে লবণ শোষণের কাজে ব্যয়িত হয়। সুতরাং ডায়রিয়ার সময় ডায়াবেটিস রোগীরা নির্দ্বিধায় ওরস্যালাইন খেতে পারবেন। যাঁরা কিডনির জটিলতায় ভোগেন তাঁরা অনেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন,

কারণ স্বাভাবিকভাবে তাঁদের নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি মেপে খেতে বলা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ডায়রিয়ার অধিক পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, ফলে পানিশূন্যতার ফলে কিডনি রোগ আরও বাড়তে পারে। সুতরাং প্রয়োজনে অতিরিক্ত তরল গ্রহণ করতে হবে। অনেকেই বিভ্রান্তিতে ভোগেন, ডায়রিয়া হলে স্বাভাবিক খাবার খেতে পারবেন কিনা। আসলে ঘরে তৈরি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত সব ধরনের স্বাভাবিক খাবারই খেতে মানা নেই। ভাত, মাছ, ডাল, সবজি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সহজপাচ্য খাবার খেতে কোনো বাধা নেই। স্তন্যপানরত শিশুরা কোনো অবস্থাতেই বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করবে না। রোগীকে কোমল পানীয় বা ফলের জুস বা আঙুর বা বেদানা খাওয়ানো যাবে না। ফিডারে শিশুকে কিছু খাওয়ানো স্বাস্থ্যকর নয়।

স্যালাইন কতটুকু খেতে হবে তা নির্ভর করবে কতবার পাতলা পায়খানা হচ্ছে বা কতটুকু পানি হারাচ্ছেন তার ওপর। ডায়রিয়ার কারণে একজন মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এক দেড় লিটারের বেশি পানি হারাতে পারেন। সবচেয়ে সহজ হিসাব হলো, প্রতিবার পায়খানা হওয়ার পর স্যালাইন খাওয়া এবং অল্প অল্প করে সারা দিন বারবার খাওয়া। এর বাইরে সারা দিন পানি ও তরল খাবার যেমন–স্যুপ, ডাবের পানি, ভাতের মাড় ইত্যাদি খেতে হবে। অনেক সময় ফুড পয়জনিংয়ের কারণে বমি বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। মানুষ স্বভাবতই ফার্মেসি থেকে বমি বা পাতলা পায়খানা দ্রুত বন্ধের জন্য ওষুধ খায়, যা একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না। সব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক জরুরি নয়। প্রয়োজন হলো, দেহের লবণ ও পানিশূন্যতা পূরণ। দরকার হলে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যেতে পারে।

অনেকে শিরায় স্যালাইন নিতে ভয় পান; কিন্তু ডায়রিয়ায় মাত্রা যদি তীব্র হয় তাহলে শুধু মুখে স্যালাইন পান করে শরীরে সৃষ্ট পানিশূন্যতা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনে শিরায় স্যালাইন নিতে হবে। ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে তৎপর আছে। বর্তমানে ডিজিএইচএস সারা দেশে ২২টি নজরদারি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন, আইভি ফ্লুইড স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, দেশের প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ডায়রিয়া চিকিৎসায় সক্ষম করে তোলা হয়েছে। স্কুল হেলথ প্রগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হচ্ছে। দেশের চলমান ডায়রিয়ার প্রকোপ মোকাবিলায় ২৩ লাখ মানুষকে মুখে খাওয়ার

মারাত্মক ডায়রিয়ার টিকা দেবে সরকার। গর্ভবতী নারী ছাড়া এক বছর বয়স থেকে বড়ো সব বয়সের মানুষ কে এটি দেওয়া হবে। দেশের চলমান ডায়রিয়া সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ডায়রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সারা দেশে একই, ঢাকার বাইরে থেকে একজন রোগীকে আইসিডিডিআরবিতে আনার যাত্রা তাদের অবস্থা আরও খারাপ করে দেয়। উপজেলা, জেলা হাসপাতালে ডায়রিয়া মোকাবিলার জন্য সমস্ত সংস্থান রয়েছে। অল্প ডায়রিয়া থাকতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সর্বস্তরের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আশা, বৃষ্টিপাত হলে বা কোনো কারণে তাপমাত্রা কমে এলে ব্যাকটেরিয়াজনিত ডায়রিয়ার প্রকোপ কমে আসবে, তবে আমরা মনে করি যতক্ষণ না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে, ততক্ষণ আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যমেরও উচিত ডায়রিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। মনে রাখতে হবে, 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর'।

লেখক : সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ঢাকা

গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার : বিশ্বে অনন্য নজির

ফারিহা হোসেন

একটি মানবিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং মানবিক আচরণ। বিশ্বেও উন্নত কোনো কোনো দেশ তাদের নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করলেও অনেক সময় মানবিক হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার আমাদের এই প্রিয় দেশকে একটি মানবিক, কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার মহতী বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই মানবিক এবং কল্যাণকর কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঠিকানাবিহীন, আশ্রয়হীন এবং গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণের ব্যবস্থা করা। একই সঙ্গে এসব মানুষের জন্য আশ্রয়ণের জন্য গৃহীত প্রকল্প এলাকায় তাদের কর্মসংস্থানে পশুপালন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব এলাকায় বিদ্যুৎ, পানি, রাস্তাঘাটসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেন। তাঁর দেখানো পথেই বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনের প্রবাল দ্বীপ এলাকায় একটি প্রকল্প শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ গত ২৬ এপ্রিল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩২ হাজার ৯০৪টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ঘর হস্তান্তর করা হয়। প্রত্যেক মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার হচ্ছে তাদের বাসস্থানের সুযাগে পাওয়া। নাগরিকের এই মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকারটি বাস্তবায়ন হলো, তাদের বাসস্থানের স্বপ্ন একটি বাড়ি পাওয়ার সেই স্বপ্ন সত্যি হলো। কেননা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি খরচে বাড়ি নির্মাণ করে তা তাদের কাছে হস্তান্তর করেছেন। যার মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫০,২৩৩ জন।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের আওতায় উপকারভোগীদের দুই শতক জমিতে টিনশেড আধাপাকা ঘর প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি নবনির্মিত বাড়ির দলিল ও চাবি বিতরণ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বক্তব্যও মানুষের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৩২ হাজার ৪০৯টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে জমি ও ঘর দিয়েছি। আমি

আসন্ন ঈদুল ফিতরের উপহার হিসেবে আজ এসব জমি ও ঘর দিয়েছি।' তাঁর সরকার মুজিববর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই দফায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসিত করেছে। তিনি বলেন, 'যারা ঘর পেয়েছে, তাদের মুখের হাসি আমি খুব পছন্দ করি' উল্লেখ করে তিনি সবাইকে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি উন্নত ও সুন্দর জীবন উপহার দিয়ে জনগণের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। মূলত এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সমাজের অবহেলিত, নিগৃহীত বেদে, তৃতীয় লিঙ্গ, চা-শ্রমিক, কুষ্ঠরোগী, ভিন্নভাবে সক্ষমসহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সুন্দর জীবন উপহার দিতে গৃহায়ণ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চারটি জেলার চারটি স্থানের সাথে যুক্ত হয়ে সুবিধাভোগী এবং অন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়ও করেন। স্থানসমূহ হলো : ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার পোড়াদিয়া বালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প, বরগুনা জেলার বরগুনা সদর উপজেলার খেজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার অধীনে খোকসাবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার হাজীগাঁও আশ্রয়ণ প্রকল্প।

মুজিববর্ষে দেশের প্রতিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে গৃহায়ণের আওতায় নিয়ে আসার সরকারি অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় তিন ধাপে এ পর্যন্ত ১৫০,২৩৩টি বাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি, ৬৩,৯৯৯টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার প্রথম ধাপের অধীনে ঘর পেয়েছিল এবং ৫৩,৩৩০টি পরিবার।

গত বছরের ২০ জুন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের মাথার ওপর একটি ছাদ পেয়েছে। এ কর্মসূচির তৃতীয় ধাপের আওতায় সারা দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে আরও ৬৫,৬৭৪টি ঘর বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ২৬ এপ্রিল ৩২,৯০৪টি বাড়ি হস্তান্তর করেছেন। সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলায় এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ১,১৭,৩২৯টি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২১-২০২২ সালের চলতি অর্থবছর পর্যন্ত ১,৮৩,০০৩টি বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ভূমিহীন, গৃহহীন, হতদরিদ্র পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে জমি ও বাড়ির মালিকানা দেওয়া হয়। প্রতিটি ইউনিটে দুটি কক্ষ, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে, যার মূল্য ২,৫৯,৫০০ টাকা কর ও ভ্যাট ছাড়াই। ট্যাক্স, ভ্যাটসহ এর পরিমাণ ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা। আশ্রয়ণ-

২-এর তৃতীয় পর্বে বাড়িগুলোকে আরও টেকসই এবং জলবায়ু সহনশীল করতে সরকার খরচ বাড়িয়েছে এবং নকশায় পরিবর্তন এনেছে। বাড়িগুলোকে আরও টেকসই করার জন্য শক্তিশালী গ্রেট-বিম, লিন্টেল এবং আরসিসি পিলারবিশিষ্ট বাড়িগুলো নির্মাণ করা হয়। চলতি অর্থবছর পর্যন্ত বাড়ি নির্মাণে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৯৭২ কোটি ৭ লাখ ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

খাসজমি ছাড়াও গৃহহীন ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার ১৬৮.৩২ একর জমি কিনেছে। ইতিমধ্যেই জমি কেনার জন্য ১১৫.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এসব বাড়ি নির্মাণে সারা দেশে অবৈধ দখল থেকে ২,৯৬৭ কোটি ৯ লাখ টাকা মূল্যের ৫,৫১২.০৪ একর খাসজমি উদ্ধার করেছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে, ১৯৯৭ থেকে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫,০৭,২৪৪ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং পুনর্বাসিত পরিবারগুলিকে তিন মাসের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনশীল এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে ব্যাবহারিক এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা যেমন–বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায়, মহিলা ও শিশু অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে বিতরণ করা হয়। পরিবারগুলোর জন্য বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের জায়গায় নিরাপদ পানির জন্য নলকূপ স্থাপন, পুকুর খনন, খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, প্রার্থনাঘর এবং কবরস্থান এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য রাস্তা দিয়ে আবাসন প্রকল্পগুলোকে সহজতর করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্য নিজে দুটি নকশিকাঁথা সেলাই করেছেন জানিয়ে রহিমা বলেন, 'আপনার দেওয়া ঘরে বসবাস করে দুইটা কাঁথা সেলাই করেছি। আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই এই কাঁথাগুলো নিতে হবে। আমার এর থেকে মূল্যবান আর কিছু দেওয়ার নাই। এই দুটি কাঁথা সেলাই করছি। আপনি নেবেন।' রহিমা আক্তার জানান, তিনি আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত অন্য বাচ্চাদের আরবি পড়ান এবং তাঁর মেয়ে বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক প্রাইভেট পড়ায়। নিজের স্বাবলম্বী হওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে রহিমা বলেন, 'সব মিলিয়ে আমাদের ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা ইনকাম হয়। এই আয় দিয়ে একটি ফ্রিজ কিনছি। প্রতিদিন আপনাকে যাতে দেখতে পারি তাই একটা টিভি নিয়েছি। একটা খাট নিয়েছি।' আরেক উপকারভোগী ইয়ার মোহাম্মদ বলেন, 'আমি একদম নিরাশ্রয় ছিলাম। আমার মা-বাবাও আশ্রয় দিতে পারে নাই। অ্যাঁর মতো জেলে মানুষকে টোঁয়ায়ে (খুঁজে) একটা ঘর দিছেন। অনেক কৃতজ্ঞ।'

তৃতীয় ধাপে এসব ঘর প্রদানের আগে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ঘর পেয়েছে ১ লাখ ১৭ হাজার ৩২৯টি পরিবার। তৃতীয় ধাপের আরও ৩২ হাজার ৭৭০টি ঘর নির্মাণাধীন। আশ্রয়ণের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের চেয়ে তৃতীয় ধাপের ঘরগুলো অনেক বেশি টেকসই। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন কবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে 'আশ্রয়ণ' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ থেকে ২০২২ সালে মার্চ পর্যন্ত ৫ লাখ ৭ হাজার ২৪৪ ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই মহতী ও মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে আগামীতেও। তবেই আমার পাব একটি মানবিক এবং কল্যাণকর রাষ্ট্র, যা জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিল।

লেখক : ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও শিক্ষার্থী

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা

লে. ক. (অব.) মহসীন আলী

চার বছর ১৩৩ দিনে দুই কোটি ১০ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত তখনো শেষ হয়নি। পৃথিবীজুড়ে চলছে এর হিসাব-নিকাশ। এর ঠিক এক বছর ১২৬ দিন পরে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ (বর্তমানে জেলা) মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘর আলোকিত করে জন্ম হলো এক শিশুর। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ (৩ চৈত্র ১৩২৭ বাংলা) জন্ম হলো শেখ মুজিবের। শেখ লুৎফর রহমান এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুন দম্পতির চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান হলো শেখ মুজিবর রহমান, মা-বাবার আদরের খোকা। সাত বছর বয়সে স্থানীয় গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু হলো খোকার। দুই বছর পর ৯ বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলো খোকা। ১৪ বছর বয়সে ১৯৩৪ সালে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। কলকাতার তৎকালীন স্বনামধন্য ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য এবং এ কে রায়ের কাছে তিনি দুই বছর চিকিৎসা নেন। এরপর ১৯৩৬ সালে চোখের অসুখের জন্য কলকাতার ডাক্তার টি কে আহমেদকে দেখান। পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চোখের অপারেশন হয়। এ সময়ে শেখ মুজিবের শিক্ষাজীবনের সাময়িক ছেদ পড়ে। এরপর ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন কিশোর মুজিব। ১৯৩৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে পারিবারিক আয়োজনে দূরসম্পর্কের আত্মীয় বেগম ফজিলাতুন নেছাকে বিবাহ করেন। এ বছরই হিন্দু-মুসলমান কোন্দলে হত্যাচেষ্টার মিথ্যা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার হয়ে প্রথমবারের মতো জেলে যেতে হয়।

১৯৩৯ সালের ১৬ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে এলে কিশোর মুজিব ছাত্রদের পক্ষ থেকে স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি তুলে ধরেন। ১৯৪০ সালে শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাঁকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত

করা হয়। ১৯৪২ সালে অসুস্থতার কারণে একটু বেশি বয়সে এন্ট্রাস পাস করে ওই বছরই কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হন। বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এ বছরই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রের দাবি নিয়ে বেশির ভাগ সময় কাটান। এ বছরই তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফরিদপুরের কর্ডনপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি জেল থেকে ছাড়া পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে জরিমানা করলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করে এবং ২০ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার সময় তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২৭ জুলাই জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তিনি গ্রেফতার হন এবং প্রায় আড়াই বছর জেল খাটেন। ১৯৫১ সালে জেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সময়ে তিনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শামসুদ্দিন ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লস্করের অধীনে চিকিৎসা নেন। ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলে থেকে নেতৃত্ব দেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে একটানা অনশনে যান এবং খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে সরকার বাধ্য হয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেয়। ৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। '৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা হিসেবে তিনি গোপালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে তের হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৫ মে প্রাদেশিক সরকারের

কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে এবং ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। একই বছর ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন তিনি গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন এবং ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৫৭ সালের ৩০ মে আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করতে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ’৬৫ সালে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় এক বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্তি পান। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করেন এবং ১ মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশব্যাপী ছয় দফার পক্ষে তিনিসহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালান। সরকার এসব প্রচার-প্রচারণায় পরিকল্পিতভাবে বাধা সৃষ্টি করে। ১৯৬৬ সালের প্রথম তিন মাসে শেখ মুজিবকে আটবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের কারণে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামিকে মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষে তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। পাকিস্তানের প্রথম দশ বছর, অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত নানারকম বিতর্ক থাকলেও রাজনীতিকরাই দেশ শাসন করেছেন। পরবর্তী দশ বছর, অর্থাৎ ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল ছিল সামরিক জান্তাদের। মানুষ সামরিক জান্তা সরকারে হাত থেকে মুক্তি চাচ্ছিল তাই ’৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ছয় দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট চায়। জনরায়ে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় লাভ করে। শুরু হয় পাকিস্তানিদের ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্চের ৩ তারিখ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে হঠাৎ করে মার্চের ১ তারিখ অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন স্থগিত করেন। এতে সারা বাংলার জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর কর্তৃক বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস যুদ্ধ শেষে এক সাগর রক্ত, দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জত আর হাজারো ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশ

স্বাধীন হয়। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। কাল বিলম্ব না করে দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে ’৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সপরিবারে শহিদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এ দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি। বঙ্গবন্ধু এ দেশকে স্বাধীন করে প্রথম লক্ষ্যটি পূরণ করে দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্যটি পূরণের দ্বারপ্রান্তে থাকা অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে হত্যা করে। ফলে তিনি এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে পারেননি। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।

লেখক : সাবেক সামরিক কর্মকর্তা

বঙ্গবন্ধু এক সম্মোহনী নেতা

পাশা মোস্তফা কামাল

নিজের ব্যক্তিত্ব, আবেগ ও যুক্তি দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারার ক্ষমতা সবার থাকে না। যাঁদের থাকে তাঁরা অনন্য, তাঁরাই সমাজের কাছে হয়ে ওঠেন অনুসরণীয়। সেই ব্যক্তিত্ব এবং আবেগের উপজীব্য যদি হয় সাধারণ মানুষের কল্যাণ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করা, আর একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও কর্মকৌশল–তাহলে সেই মানুষ হয়ে ওঠেন অবিসংবাদিত ও অপ্রতিরোধ্য নেতা। নেতৃত্বের যে কয়েকটি গুণ একজন নেতাকে সম্মোহনী শক্তি প্রদান করে তার সবই ছিল বঙ্গবন্ধুর মানস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে অসাধারণ কিছু কথা বলেছেন। ‘নেতৃত্বের উৎকৃষ্টতার বৈশিষ্ট্যগুলো কী, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হচ্ছি। কবিগুরু ১৯২১ সালে স্কটল্যান্ডের স্থপতি স্যার প্যাট্রিক গিডার্সকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি কোনো এক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ‘I do not have faith in any institutions, but in the people who think properly, feel lovely and act rightly.’ ‘কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার আস্থা নেই, তবে আস্থা আছে সেই মানুষগুলোর ওপরে, যাদের চিন্তা যথার্থ, অনুভব মহান এবং কর্ম সঠিক।’ এই বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু শুধু একজন আদর্শ নেতাই ছিলেন না, তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। কারণ তাঁর চিন্তা ছিল যথার্থ, অনুভব ছিল মহান, আর কাজ ছিল সঠিক।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হতে থাকে। এ কথা আজ সবাই জানে, তিনি তাঁর স্কুলজীবনেই স্কুলের সমস্যা নিয়ে অবিভক্ত বাংলার শ্রমমন্ত্রী (পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর উপস্থাপনভঙ্গি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো নেতাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তা না হলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবকে কলকাতায় গেলে দেখা করার কথা বলতেন না। কতটুকুই বা তাঁর বয়স তখন। কথায় বলে সকালের উদীয়মান সূর্যই বলে দেয় দিনটি কেমন হবে। বালক বঙ্গবন্ধুর ভেতর সেই তেজোদীপ্ততা ছিল আলোর বিচ্ছুরণের মতো।

কলেজজীবনেও আমরা দেখতে পাই তাঁর ভেতরের নেতৃত্বগুণ ও সম্মোহনী শক্তি ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৯৪১ সালে বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় গিয়ে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। কলেজে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই সময় ইসলামিয়া কলেজ ছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। তিনি সেখানে এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁর মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কলেজে কেউ ইলেকশন করত না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশন হতো। তিনি ছাত্রনেতাদের নিয়ে আলোচনা করে যাদের ঠিক করে দিতেন তারাই নমিনেশন দাখিল করত। কারণ সবাই জানত তাঁর মতের বিরুদ্ধে কারো জেতার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সাধারণ ছাত্ররা ছিল শেখ মুজিবের অন্ধ ভক্ত। 'মুজিব ভাই' যা বলবেন তাতেই তাদের সমর্থন থাকবে, এ রকম একটা ব্যাপার ছিল।

১৯২০ সালে টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ১৯৭১ সালে এসে পাকিস্তানিদের জন্য তৈরি করেছিলেন দাবানল। যে দাবানলে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষমতার তক্তপোশ। মাঝখানের সময়গুলো খুব সহজ-সরল কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে তাঁকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে। কতখানি ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা আর নেতৃত্বের সঠিকতা থাকলে সেটা সম্ভব, ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে।

সহকর্মী ও সহপাঠীদের জন্য ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ১৯৩৮ সালে ছাত্রাবস্থায় প্রথম কারাবরণ করেন। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর সহপাঠী আবদুল মালেককে হিন্দু মহাসভার লোকজন ধরে নিয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে যান। তৈরি হয় হাঙ্গামা। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে যান। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল। কোথাও কোনো অন্যায় দেখলে সবার আগে তিনি প্রতিবাদ করতেন। সারা জীবন তা-ই করেছেন। মানুষকে অসম্ভব ভালোবাসতেন বঙ্গবন্ধু। সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে তিনি বলেছিলেন তাঁর যোগ্যতা হচ্ছে তিনি 'মানুষকে ভালোবাসেন', তাঁর অযোগ্যতা হচ্ছে তিনি 'মানুষকে বেশি ভালোবাসেন'। কতখানি আবেগপ্রবণ মানুষ হলে মানুষের প্রতি এমন ভালোবাসা থাকতে পারে, তা শুধু অনুধাবন করার বিষয়।

বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালি। অসীম সাহসী আর দূরদর্শী। বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও আমি বলব আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান–একবার মরে দুইবার মরে না।' পাকিস্তানে বন্দি

থাকা অবস্থায় কারাগারে তাঁর কক্ষের কাছে কবর খোঁড়া দেখেও বিচলিত হননি এই বীর বাঙালি মহাপুরুষ। শুধু বলেছিলেন, আমি মারা গেলে আমার লাশটা আমার দেশের মাটিতে পাঠিয়ে দিও। তাঁর সাহস আর মনোবল দেখে উল্টো ভড়কে গিয়েছিল পাকিস্তানি জান্তারা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের প্রতিটি বাঁকে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরপরই তিনি মনস্থির করতে সক্ষম হয়েছিলেন পাকিস্তানের সাথে আমাদের বনিবনা হবে না। তাঁর চিন্তার প্রখরতা এত বেশি ছিল যে তিনি তখন থেকেই স্বাধীনতার কথা ভেবে বসে আছেন। তিনি তখনো ঢাকায় আসেননি, কলকাতার বেকার হোস্টেলে অবস্থান করছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গীসাথিদের নিয়ে বেকার হোস্টেলে একটি সভা করছিলেন। সেই সভায় তিনি বলেছিলেন, এই পাকিস্তান বাঙালির অধিকার রক্ষা করবে না। তাঁর মুখে উচ্চারিত চিরাচরিত কথ্য বাংলায় বললেন, 'মাউরাদের সাথে আমাদের হবে না'। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার আগেই কলকাতার সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকার অফিসে এক আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে বাংলা। কারণ বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা।

বঙ্গবন্ধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এগোচ্ছিলেন ১৯৪৭ সাল থেকেই। সেই লক্ষ্য ছিল বাঙালির স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন আবাসভূমি। তিনি তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। '৬৬-র ছয় দফা আন্দোলনে একটি পরিষ্কার গাইডলাইন ছিল স্বাধীনতার। পাকিস্তানি শাসকরা বুঝেতে পেরেছিল তাঁর লক্ষ্য। তারা ষড়যন্ত্র তৈরি করল। সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দিলেন বঙ্গবন্ধু। উত্তাল গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে বের হয়ে এলেন কারাগার থেকে। ১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি বলেছিলেন আজ থেকে এই দেশের নাম হবে 'বাংলাদেশ'। '৪৭ থেকে '৬৯। এই সময়কালে তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বগুণে বাংলার মানুষের মনে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

মাত্র আঠারো মিনিটের ভাষণ। উত্তাল মার্চ একাত্তর। কী মন্ত্র ছিল সেই ভাষণে! মন্ত্রমুগ্ধের মতো সম্মোহিত হয়ে গেল পুরো জাতি। এক আঙুলের ইশারায় উঠে এলো সহস্র বছরের ইতিহাস। শৃঙ্খল ভাঙার দৃঢ়প্রত্যয়। ভাষণ দেওয়ার এই ভঙ্গি, কথা বলার এই কাব্যিক উপস্থাপনা বিশ্বের আর কোনো নেতার মধ্যে আমি দেখিনি। প্রবল ব্যক্তিত্ব চেহারার সাথে বক্তব্যের প্রতিটি স্বর প্রক্ষেপণ

যেন বাঘের মতো গর্জন করছিল। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ ছিল একেকটি কবিতার চরণ। তাই তো তিনি 'রাজনীতির কবি'। ছিল বৈষম্যের ইতিহাস, ছিল দিকনির্দেশনা। পুরো বাঙালি জাতি এক আঙুলের ইশারায় একতাবদ্ধ হয়ে গেল। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নজির নেই।

বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন দেশকে, দেশের মানুষকে। কত প্রবল আত্মবিশ্বাস থাকলে বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন 'কী চাস তোরা'। তাঁর বিশ্বাসের মাত্রা এত প্রবল ছিল যে তিনি কখনো ভাবতেই পারেননি যে কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করার কথা চিন্তা করতে পারে। কিন্তু সেই কুলাঙ্গারগুলো যে পাকিস্তানের প্রেতাত্মা, সেটা বুঝতে বুঝতে তিনি চলে গেলেন এই জগৎসংসার ছেড়ে। বাঙালির এই ক্ষতি আরও হাজার বছরেও পূরণ হবে না, হওয়ার নয়। বঙ্গবন্ধুর মতো সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন নেতা হাজার বছরেও একজন জন্মায় কি না সন্দেহ আছে।

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

ডলফিন সংরক্ষণে সরকারের উদ্যোগের সাথে প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা

দীপংকর বর

বাংলাদেশের নদ-নদীতে হঠাৎ করে এক ধরনের বড়ো সাইজের জলজ প্রাণীকে ভেসে উঠে আবার ডুবে যেতে দেখা যায়। অনেকে মাছ বলে ভুল করলেও এটি আসলে এক ধরনের সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। এটি বিশ্বব্যাপী ডলফিন নামে পরিচিত হলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক এটিকে শুশুক নামে জানে। সুন্দরবন এলাকায় এটিকে শিশু, ঠুস, সিরাজগঞ্জে শিশুক, সিলেটে শিশু, রাজশাহীতে শুশু, চট্টগ্রামে হোচ্চুম ইত্যাদিসহ বিভিন্ন নামে এটি পরিচিত। বিশ্বব্যাপী ৪০টি প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে সাত প্রজাতির ডলফিন দেখা গেলেও গাঙ্গেয় ডলফিন ও ইরাবতী ডলফিনই বেশি দেখা যায়। ডলফিন দৈর্ঘ্যে সাধারণত ৪ ফুট হতে ৩০ ফুট পর্যন্ত এবং ওজনে ৪০ কেজি হতে ১০ টন পর্যন্ত হতে পারে। ডলফিন পর্যায়ক্রমে মস্তিষ্কের এক অংশ বন্ধ করে, বিশ্রাম দেয় এবং পরে আরেকটি অংশকে বিশ্রাম দেয়। তাই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এরা ঘুমায় কখন। এদের মাছের মতো ফুলকা নেই, তাই অক্সিজেন গ্রহণের জন্য মাঝে মাঝে পানির ওপরে ভেসে ওঠে। অক্সিজেন নিয়ে আবার তলিয়ে যায়।

পানির খাদ্যশৃঙ্খল বজায় রাখতে ডলফিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিদিন একটি প্রাপ্তবয়স্ক ডলফিনের ৩০ কেজি পর্যন্ত খাবার প্রয়োজন। এরা নদীর ছোটো ছোটো মাছ ও দুর্বল মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে এবং মাছের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ডলফিন না থাকলে মাছের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, ফলে মাছের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের প্রচুর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আর দুর্বল মাছের মধ্যে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় ফলে ওই নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়ে। ডলফিন না থাকলে পানির খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ে। এও দেখা গিয়েছে, ডলফিন নদীর বা পানির অনেক দূষণ নিজের শরীরের মধ্যে শোষণ করে নদী বা পানিকে দূষণমুক্ত রাখে। কোনো নদীতে ডলফিন থাকলে বোঝা যায় ওই নদীর পানি ও ইকোসিস্টেম ভালো আছে। বুদ্ধিমান এ প্রাণী স্বভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং

খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার অধিকারী, তাই অনেক দেশে ডলফিনকে খেলা দেখানো এবং সামরিক কাজসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

বর্তমানে গাঙ্গেয় ডলফিন সুন্দরবন এলাকায় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া রাজশাহী-গোদাগাড়ী, পদ্মা-যমুনার সংযোগস্থল, চিলমারী- ভূরুঙ্গামারী, পানখালী-রূপসা-ভৈরব, ভৈরব-মেঘনা, হালদা-কর্ণফুলী-সাঙ্গু ইত্যাদি অঞ্চল ও নদীতে দেখতে পাওয়া যায়। ইরাবতী ডলফিন সুন্দরবন, উপকূলীয় অঞ্চল ও সাগরে পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে ডলফিন ভালো অবস্থায় নেই। নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়া, যত্রতত্র জাল দিয়ে মাছ ধরা, অবৈধ জাল ব্যবহার করা, মাছ ধরার জালে আটকে গিয়ে পানির নিচে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাওয়া, ডলফিনের আবাসস্থল সংকুচিত হওয়া, বিষ দিয়ে মাছ ধরা, অতিরিক্ত মাছ আহরণের ফলে মাছ কমে যাওয়ায় তাদের খাদ্যসংকট হওয়া ইত্যাদি কারণে ডলফিন কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া নদীতে মিষ্টি পানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া, অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণকাজ (বাঁধ ইত্যাদি) বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পানির গতিপথ পরিবর্তন হওয়া, বিভিন্ন কলকারখানার আবর্জনা ও মলমূত্র দ্বারা পানি দূষিত হওয়া, পলি পড়ে নদীর গভীরতা কমে যাওয়া, ডলফিনের গুরুত্ব সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি কারণেও ডলফিন কমে যাচ্ছে। অনেকে কুসংস্কারবশত বাতের ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য এবং মাছ ধরতে এটার তেল আকর্ষক হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে এগুলোকে হত্যা করে। বাংলাদেশ সরকার ডলফিনসহ সকল বন্য প্রাণী সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর বিধায় জীববৈচিত্র সংরক্ষণের বিষয়টি সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ডলফিন রক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। ডলফিন সংরক্ষণে নানা ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকলেও এই প্রাণীগুলো এখনো হুমকির মুখে রয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের দিকনির্দেশনায় বন অধিদপ্তর ডলফিন সংরক্ষণে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, দেশের সর্ববৃহৎ ডলফিনের আবাসস্থল সুন্দরবন এলাকায় অনেকগুলো হটস্পট চিহ্নিত করে সেগুলোর মধ্য হতে পানখালী, শিবসা আর দুধমুখীতে বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু সুন্দরবনেই এ মুহূর্তে ডলফিনের জন্য ছয়টি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে। এ ছাড়া পাবনায় তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা

করা হয়েছে। সুন্দরবনের ডলফিন অভয়ারণ্যের ওপর নির্ভরশীল এক হাজার পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে সেলফ হেল্প দল গঠন করে সুন্দরবনে অবৈধভাবে মাছ ধরা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের কর্মীদের মধ্যে ডলফিন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ডলফিন অভয়ারণ্যে স্মার্ট প্যাট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ডলফিন হত্যা করলেই আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। নদী এবং উপকূলীয় এলাকায় ডলফিনের সংখ্যা হ্রাস প্রতিরোধে এবং ডলফিনের আবাসস্থল রক্ষায় 'ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যান' প্রণয়ন করা হয়েছে। শীতকালে গাঙ্গেয় ও ইরাবতী ডলফিন দেশের যে সকল স্থানে দেখতে পাওয়া যায় তা জানতে 'ডলফিন অ্যাটলাস ইন বাংলাদেশ' প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুন্দরবনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সাতটি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে, যারা বনকর্মীদের সাথে ডলফিন সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি দলকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা এফডিআর করে রাখা হয়েছে। ডলফিন কনজারভেশন টিম যাতে সরকার প্রদত্ত অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রম দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে পারে এ জন্য 'ফান্ড ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন' প্রণয়ন করা হয়েছে। হালদা নদীর ডলফিন সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডলফিনও এর আবাসস্থল সংরক্ষণ ছাড়াও ডলফিন সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের সহায়ক হিসেবে 'ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ফর দ্য গ্যাঙ্গেজ রিভার ডলফিন ইন হালদা রিভার' প্রণয়ন করা হয়েছে। ডলফিনের রিসার্চ গ্যাপ অ্যানালাইসিস করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক ভবিষ্যতে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। সুফল প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

অচিরেই দেশের ডলফিন অধ্যুষিত এলাকা যেমন–পাবনা, রাজশাহী, ভৈরব, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য এলাকায় আলোচনাসভা, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে শুশুক মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে জেলেদের ডলফিন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো, নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারে অনুৎসাহিত করা, বিষ দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করা, বন্য প্রাণী আইন সম্পর্কে অবহিত করা, জালে ডলফিন আটকে গেলে কীভাবে নিরাপদে ডলফিনকে অবমুক্ত করা যায় তার প্রশিক্ষণ

দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ডলফিনের তেল ঔষধ হিসেবে ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সুন্দরবনের আদলে অন্যান্য ডলফিন বসবাসকারী এলাকায় স্থানীয় যুবাদের নিয়ে ডলফিন কনজারভেশন টিম গড়ে তোলা হবে, যাতে করে ডলফিন সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করতে পারে।

দেশব্যাপী ডলফিনের হটস্পট চিহ্নিত করে রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ডলফিন সংক্রান্ত বেশ কিছু পলিসি দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে ডলফিন সংরক্ষণ কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সরকার 'বাংলাদেশ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২'-এর আওতায় ডলফিনসহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী রক্ষার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালের অক্টোবরে 'দ্য সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া' প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই এটি এসডিজি গোল ১৪-এর আওতায় জলজ প্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

দেশের নদ-নদীর পানি ও ইকোসিস্টেম ভালো রাখতে ডলফিন সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে ডলফিনকে শুধু একটি সাধারণ জলজপ্রাণী হিসেবে সংরক্ষণের জন্য কাজ করলে এটির সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট নদী ও উপকূলীয় এলাকা সংরক্ষণের আওতায় আনতে হবে। আর সে জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। ডলফিন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সোশ্যাল, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা আবশ্যক। সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসলেই দেশের ডলফিন সংরক্ষণে সফলতা পাওয়া সম্ভব হবে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সুন্দরবনের ঐতিহ্য রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য

মোতাহার হোসেন

পৃথিবীর দেশে দেশে প্রকৃতি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র রক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষক, লেখক, গণমাধ্যমকর্মী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদে সোচ্চার হন মাঠে-ময়দানে, লেখালেখিতে। কারণ পরিবেশ প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্যের সাথে মানুষের জীবনের, অর্থনীতির, পর্যটন প্রভৃতির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। সে কারণে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বৈরিতায় শেষমেষ ক্ষতি হয় মানুষেরই। আমাদের প্রাণপ্রবাহকে সচল রাখতে উপকূলের মানুষের জীবন, অর্থনীতি, সম্পদকে রক্ষায় ইউনেস্কো ঘোষিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে পত্রিকায় একটি খবর প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ার পর প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যার দাবি রাখে। শুরুতেই বলা সংগত যে আমরা আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র রক্ষায় বিশ্বের উন্নত সমৃদ্ধ দেশ থেকে যোজন যোজন দূরে রয়েছি। পরিণামে প্রকৃতিও আমাদের ওপর সেই প্রতিশোধ নিচ্ছে বিভিন্ন সময়ে।

পরিবেশ, প্রতিবেশ রক্ষায় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। ইকুয়েডরে ম্যানগ্রোভ কেটে চিংড়ি চাষ করার প্রতিবাদে ১৯৯৮ সালের ২৬ জুলাই আয়োজিত সমাবেশে মৃত্যু হয় একজন অংশগ্রহণকারীর। সেই থেকে তাঁর স্মরণে ২৬ জুলাই দিনটি বেসরকারিভাবে আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ইউনেস্কোর আহ্বানে ২০১৫ সাল থেকে এই দিনটিকে ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এর লক্ষ্য ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। বিশেষ ও দুর্বল বাস্তুসংস্থানে ম্যানগ্রোভের টেকসই পরিচালনা, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য।

বিশ্বের মধ্যে একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, যা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। প্রাকৃতিক নানা কারণ ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ হুমকির মুখোমুখি। সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, সুন্দরবনে নোনার মাত্রা বেড়েছে।

স্বাদু ও নোনা পানির একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় যে প্রতিবেশব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকেই ম্যানগ্রোভ ইকোলজি (বাস্তুতন্ত্র) বলা হয়। এখানকার পানিকে ব্রাকিশ ওয়াটার বলা হয়। এ কারণে এই পানির প্রভাবাধীন এলাকাকে ব্রাকিশ ওয়াটার জোন বলে। এই প্রতিবেশব্যবস্থার অন্যতম বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি দ্রুত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে জীববৈচিত্র্যের আধার। ম্যানগ্রোভ বা বিশাল পরিমাণের বনের কারণে উদ্ভিদের পাতা পানির সঙ্গে মিশে জলজ প্রাণী, বিশেষত মাছের খাবার জোগান দেয়। এখানকার মাছ এ কারণে অনন্য স্বাদের। সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনে মিষ্টি পানির প্রবাহ কমেছে; বিশেষত উজান থেকে মিষ্টি পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় এই সংকট তৈরি হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে জোয়ারের পানি, অর্থাৎ সাগরের লবণাক্ত পানির চাপ বেড়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার দত্ত এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ‘আমাদের মিষ্টি পানির উৎস হচ্ছে পাহাড়বাহিত নদী ও বৃষ্টির পানি। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টি না হওয়া এবং উজানের নদীগুলো থেকে একেবারেই পানি না আসায় জোয়ারের চাপে সাগরের পানি বেশি চলে আসায় নোনার আধিক্য ধরা পড়ে, যা বৃষ্টি হলেই কমে যায়। উজানের নদীগুলোর পানি নানাভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আমাদের এখানে মিষ্টি পানির সংকট দেখা দেয়। বছরের বেশির ভাগ সময়ই এখন লবণাক্ত পানির দাপট বেশি থাকে। উপরন্তু পশ্চিমাংশে বিদ্যাধরী নদীর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মিষ্টি পানির জোগান প্রায় বন্ধ। ফলে নোনার তেজ বেড়েছে। মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার বাড়বাড়ন্তে অনেক প্রজাতির গাছ একেবারেই হচ্ছে না অথবা সাংঘাতিকভাবে এর বৃদ্ধি কমে গেছে। যেমন–সুন্দরী, গোলপাতা। শুষ্ক মৌসুমে নোনার পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক গুণ বেশি বৃদ্ধি পায়।’

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদরাজি বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয়। এতে পরিবেশের দূষণ কমে। কার্বন ডাই-অক্সাইডকে খাদ্যে রূপান্তর করে লবণাক্ত পানির এই উদ্ভিদরাজি বেড়ে ওঠে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনে ৩৪ প্রজাতির গাছ আছে। এর মধ্যে কেওড়াগাছ সর্বাধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড তার শিকড়, কাণ্ড, ডালপালা ও পাতায় আটকে রাখতে পারে। এক হেক্টর কেওড়াবন বছরে ১৭০ টন পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড আটকে রাখতে পারে। বাইনের ক্ষেত্রে তা ১১৫ টন, গোড়ান তা ২৩ টন। গাছের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই ক্ষমতা কমতে থাকে।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে মোটামুটি ৬৬২ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড আটকে রাখে সেই সাথে প্রতিবছর আরও ৩৮ লাখ টন যোগ হচ্ছে। এই বনের মৎস্যসম্পদের (মাছ ও চিংড়ি, কাঁকড়া, কুঁচে প্রভৃতি) ওপর এখনো বিপুল সংখ্যায় মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। বিশেষত ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত থেকে সুন্দরবন মানুষের জীবন,সম্পদ ও জনপদকে রক্ষা করে চলেছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় থেকে শুরু করে সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধসহ সাম্প্রতিককালে আঘাত হানা আম্ফান, ইয়াসেও সুন্দরবন বুক উঁচিয়ে রক্ষা করেছে। অবশ্য নদীগর্ভে অধিক হারে পলি জমছে। এতে নদীগুলোর গভীরতা কমে যাচ্ছে। এ কারণে ইয়াসে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনের প্রায় পুরো এলাকা তিন থেকে চার দিন ডুবে ছিল। বনের মধ্যকার মিষ্টি পানির পুকুরগুলো নোনাক্রান্ত হয়। এতে প্রাণিকুল সুপেয় পানির সংকটে পড়ে। এ ছাড়া আরও দুবার সুন্দরবনের ঘষিয়া খালি নদীতে তৈলবাহী ট্যাংকার ফেটে ট্যাংকারের সব তেল, মবিল নদীকে ভীষণভাবে দূষণ করে। প্রসঙ্গক্রমে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের এক অধ্যাপকের মন্তব্য হচ্ছে, 'প্রাকৃতিক কারণেই সুন্দরবনের নানা পরিবর্তন ঘটছে। দৃশ্যমানভাবে আমরা জানতে পারছি যে অনেক গাছ, প্রাণী, পাখি হারিয়ে গেছে। অন্যদিকে সুন্দরবনের সামুদ্রিক পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়েছে, মিষ্টি পানির প্রবাহ কমেছে। এই অতিরিক্ত লবণাক্ততাই সুন্দরবনের জন্য এখন মারাত্মক সমস্যা। তবে শত বছরেরও বেশি আগের ১৯০৩ সালের ডকুমেন্ট বলছে, এই অঞ্চলে মিষ্টি পানির প্রবাহ কমছে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হচ্ছে সুন্দরবন। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে এর আয়তন ১০ হাজার ২৩০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ছয় হাজার ৩০ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশে। বাকিটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। কাজেই প্রকৃতি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র বিশেষ করে উপকূলীয় মানুষের জীবন, জীবিকা, সম্পদ রক্ষার স্বার্থেই সুন্দরবনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। দরকার সম্মিলিত উদ্যোগ।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

দারিদ্র্যমোচনে উত্তরাঞ্চলের সমতল ভূমিতে চা চাষ

মো. জাহাঙ্গীর আলম

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার উপজেলার কৃষক আব্দুর রহমান বছর ছয়েক আগে তিন একর জমিতে অর্গানিক চা চাষ শুরু করেন। এর আগে তাঁর ওই জমিতে মৌসুমি ফসলসহ কৃষিপণ্যের চাষাবাদ করতেন। তাঁর জমির কিছু অংশ অনাবাদিও ছিল। ধান, আলু ও শাকসবজি চাষাবাদ করে কাঙ্ক্ষিত লাভ না হওয়াতে তিনি ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ শুরু করেন। তিনি গত বছর তিন একর জমিতে চা চাষ করে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার সবুজ চা-পাতা বিক্রয় করেছেন। এতে করে তাঁর প্রায় তিন লাখ টাকা লাভ হয়েছে। এই উপজেলার চা চাষি রিপন বিশ্বাস দুই একর জমিতে চা চাষ করে দেড় লাখ টাকা লাভ করেছেন। অন্যদিকে ওই উপজেলার বাসিন্দা রাজিয়া বেগম তাঁর বসতবাড়ি ও এর চারপাশে দেড় একর জমিতে চা চাষ করে সোয়া লাখ টাকার অধিক লাভ করেছেন। কৃষক আব্দুর রহমান, রিপন বিশ্বাস ও রাজিয়া বেগমের মতো কয়েক শত অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষক প্রচলিত কৃষিপণ্য চাষাবাদ বাদ রেখে অর্গানিক চা চাষে বেশি মনোযোগী হচ্ছে। এ অঞ্চলে বাগানভিত্তিক চা চাষ ছাড়াও ক্ষুদ্রায়তন ও ক্ষুদ্র চা চাষিরা নিজেরাই তাদের জমিতে চা-বাগান করেছে। চা চাষে বেশি লাভ হয়, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কম বা নাই বললেই চলে। চা চাষ করে উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলা পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাটের মানুষ এখন সচ্ছল, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে, দারিদ্র্যমোচন করে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করে এ জনপদের মানুষ চা চাষে সফল হয়েছে।

চা বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত নগরায়ণের ফলেও জনগণের শহরমুখিতার কারণে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমে বাড়ছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলেও চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছে। বিগত প্রায় চার দশক ধরে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। অনেক আগে থেকেই দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জিডিপিতে চায়ের অবদান প্রায় দশমিক ৮১ শতাংশ। দেশে চায়ের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে। লন্ডনভিত্তিক ‘ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি’ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, চা উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দশম। অনেক আগে থেকেই চা এ দেশে একটি কৃষিভিত্তিক শ্রমঘন শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, আমদানি বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের

সৃষ্টিতে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে চা চাষ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সিলেট ও চট্টগ্রামের প্রচলিত বৃহত্তাকার 'টি এস্টেট' বা 'চা-বাগান'-এর বাইরে এসে দেশের উত্তরের জনপদের পাঁচ জেলায় ক্ষুদ্রায়তন ও ক্ষুদ্র চা চাষিরা নিজেরাই তাদের জমিতে অর্গানিক চা-বাগান করেছে। উত্তরের এই জনপদের মানুষের সমতল ভূমিতে চা চাষের সফলতা এলাকার দারিদ্র্যমোচন, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ সৃষ্টি করেছে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান। একদিকে দরিদ্র পরিবারগুলোর আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হয়েছে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

সমতল ভূমিতে চা চাষ বদলে দিয়েছে হাজার হাজার কৃষক-শ্রমিক ও বেকার তরুণ-তরুণীর ভাগ্য। চা বোর্ডের হিসেবে অনুযায়ী, উত্তরাঞ্চলে চা-বাগান, প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও প্যাকেটজাতকরণ ছোটো কারখানাগুলোতে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রায় অর্ধেকই নারী। চা-বাগান ও কারখানাগুলোতে কাজ করে এখন অনেকেরই জীবনমানের পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারে এসেছে সচ্ছলতা। তাছাড়া চা-শিল্প থেকে প্রতিবছর সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে তৎকালীন পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এখানে পরীক্ষামূলকভাবে চা চাষ শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালের দিকে বাণিজ্যিকভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয়। সীমান্তঘেরা ভারতের গড়ে তোলা চা-বাগান এবং দেশের পরীক্ষামূলক চা চাষে অনুপ্রাণিত হয় চাষিরা। বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় এগিয়ে আসে স্থানীয় ক্ষুদ্র চা চাষিরা। বাংলাদেশ চা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে উত্তরের এই অঞ্চলে পাঁচ জেলায় নিবন্ধিত ১ হাজার ৭৪৫টি এবং ৮ হাজার ৬৭টি অনিবন্ধিত ক্ষুদ্রায়তন চা-বাগান (২৫ একর পর্যন্ত) রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের এই পাঁচটি জেলায় বর্তমানে নিবন্ধিত ৯টি ও অনিবন্ধিত ২১টি বড়ো চা-বাগান (২৫ একরের ওপরে) রয়েছে। এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১১ হাজার ৪৩৪ একর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশে মোট ১৬৭টি চা-বাগান, যা বাংলাদেশ চা বোর্ড থেকে নিবন্ধনকৃত। এ মধ্যে ১২৯টি স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত টি এস্টেট, ৩১টি স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত চা-বাগান এবং ৭টি অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত চা-বাগান। ২০২০ সালে দেশের ১৬৭টি চা-বাগান এবং ক্ষুদ্রায়তন চা-বাগান থেকে মোট ৮ কোটি ৬৩ লাখ ৯ হাজার কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলার চা-বাগানসমূহ থেকে ২০২০

সালে প্রায় ৫ কোটি ১৩ লাখ কেজি সবুজ চা-পাতা উত্তোলন করা হয়েছে, যা থেকে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়ের ১৮টি চলমান চা কারখানায় প্রায় ১ কোটি ৩ লাখ কেজি চা উৎপন্ন হয়েছে, যা প্রায় মোট চা উৎপাদনের ১০ শতাংশ। বিগত বছরের তুলনায় ২০২০ সালে ১ হাজার ৪৯০ একর চা আবাদি বৃদ্ধি পেয়েছে ও ৭.১১ লাখ কেজি চা বেশি উৎপন্ন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলের ১২ বছরের (২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত) উত্তরের পাঁচ জেলায় চা আবাদির পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০ হাজার ১৭০ একর (৪১১৭) হেক্টরে উন্নীত হয়েছে এবং চায়ের উৎপাদন প্রায় ষোলো গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৩ লাখ কেজি তৈরি চায়ের উন্নীত হয়েছে, যা এযাবৎকালে উত্তরের জনপদের চা-শিল্পের সর্বোচ্চ রেকর্ড। পঞ্চগড় জেলায় যেসব জমিতে এখন চা আবাদ হচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশই পূর্বে অনাবাদি এবং চারণভূমি ছিল। পঞ্চগড়ে চা চাষের ফলে অত্র এলাকার সরাসরি প্রায় ২০ হাজার জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তরের পাঁচ জেলার পর এবার বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেরপুর ও নেত্রকোনা জেলার কিছু অংশে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয়েছে। গারো হিলস টি কোম্পানি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গারো পাহাড় অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্যমোচনে চা-বাগানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ অঞ্চলের আগ্রহী চাষিদের মাঝে চা চাষের প্রশিক্ষণ ও চারা বিতরণের মাধ্যমে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের ধারণা, চা একটি অর্থকরী ফসল, ক্ষুদ্রায়ত ও ক্ষুদ্র চাষিরা চা উৎপাদনের মাধ্যমে গারো পাহাড়ি জনপদের জনগোষ্ঠীরা দারিদ্র্যমোচন ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি উৎপাদিত চা এ জেলাসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

দেশে চা আবাদ বৃদ্ধি করে চায়ের উৎপাদন বাড়িয়ে নিজস্ব চাহিদা মেটানো এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে সরকার নানা কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সরকার ক্ষুদ্রায়তন চা-বাগান সম্প্রসারণ এবং দারিদ্র্যমোচনে আর্থসামাজিক উন্নয়নে পাঁচ বছর মেয়াদি তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে– এক. এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চিটাগাং হিলট্র্যাকটস; দুই. এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ এবং তিন. ইরাডিকেশন অব রুরাল প্রভারটি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট। দেশের চা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে চায়ের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে পঞ্চগড়সহ উত্তরের পাঁচ জেলায় এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ নামে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি

প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা বোর্ড। এই প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের জুনের মধ্যে পাঁচ জেলা পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাটে এক হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে নতুন করে চা চাষ করা হবে। অন্যদিকে উত্তরের একটি জেলায় 'ইরাডিকেশন অব রুরাল প্রভারটি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট' কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের জুনের মধ্যে লালমনিরহাটে ১০০ হেক্টর জমিতে চা চাষাবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যমোচন করা হবে। এছাড়া এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চিটাগাং হিলট্র্যাক্টস্ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের জুনের মধ্যে পার্বত্য এলাকায় ৩০০ হেক্টর জমিতে নতুন করে চা চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

জাতীয় চা নীতিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণ সম্পর্ক বলা হয়েছে, উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলায় সমতল ভূমিতে, পার্বত্য জেলাসমূহ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ শুরু হয়েছে। জাতীয় চা নীতি অনুযায়ী, এ সকল এলাকার চা চাষিদের চা চাষের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ, ভর্তুকি এবং চা চারা প্রদান করা হচ্ছে। এ নীতিতে আরও বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র চা চাষিদের আয়বর্ধনের জন্য সাথি ফসলের চাষ করতে হবে। স্বল্পকালীন ও ভূমির জৈব উপাদান সমৃদ্ধ করে এরূপ ফসল সাথি হিসেবে চাষ করতে হবে। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা করবে এবং লব্দজ্ঞান ক্ষুদ্র চা চাষিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। এছাড়া ক্ষুদ্রায়তন নিবিড় চা চাষের জন্য ও চা এলাকা সম্প্রসারণের জন্য বিটিআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রেসক্রাইভড ক্লোনস, বাই-ক্লোনাল ও পলি-ক্লোনাল চা-বীজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দেশের সমতল ভূমিতে চা চাষের জন্য উত্তরের জেলাগুলো অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এলাকা। সরকার চায়ের চাষ সম্প্রসারণের জন্য চাষিদের বিভিন্ন সহায়তার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করছে। কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমতল ভূমিতে চা চাষ কার্যক্রম বাড়াচ্ছে। সমতল ভূমিতে চা চাষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। চায়ের উৎপাদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে উত্তরাঞ্চলের সমতল ভূমির এই চা চাষ।

লেখক : সিনিয়র সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আমরাই গড়ব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

সাঈদ হাসান

যে কঠিন মূল্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তার সোনালি ফসল আজ ঘরে তুলছে বাংলাদেশ। আমাদের গর্ব-উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশ। তলাবিহীন ঝুড়ির অপমানের অপচেষ্টাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বের বুকে নিজের অবস্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ভাবনা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। যা ছিল একসময় কল্পনা তাই বাস্তবে পরিণত করে একের পর এক মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন এবং এ দেশের মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও স্বপ্ন দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন ২০২২-২৩ হবে বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাইলফলক বছর।

পদ্মা সেতু : দেশি-বিদেশি সকল ষড়যন্ত্রকে দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করে ২০১৩ সালের ৪ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হবে। তখন দেশি-বিদেশি তথাকথিত এক শ্রেণির বিশেষজ্ঞ নানারকম সংশয়ের কথা বলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ এবং ৩৮ নম্বর পিলারে প্রথম স্প্যান বসানোর মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় সেতুর অবকাঠামো। এরপর নানারকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর ৪২টি পিলারে ৪১টি ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের স্প্যান বসানোর মাধ্যমে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হয়। সেতুর সকল কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব আর জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় অন্য সব মেগা প্রকল্প থেকে এগিয়ে। এ সেতুর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৯ জেলার ৩ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হবে। সেতুটি চালু হলে ১.২৩ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ২.৩ শতাংশ হারে। দারিদ্র্য কমবে ১.৯ শতাংশ হারে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।

মেট্রোরেল : ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ১২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তা হিসেবে জাইকা দিচ্ছে ১৬ হাজার ৫৯৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। ২০১৬ সালের ২৬ জুন এমআরটি-৬ প্রকল্পের নির্মাণকাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমআরটি-৬-এর নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৭ সালের ২ আগস্ট। এমআরটি-৬ লাইনটি উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিলের বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। এ রুটের মোট দূরত্ব ২১ কিলোমিটার এবং স্টেশন রয়েছে মোট ১৬টি। ট্রেন চালানোর জন্য প্রতি ঘণ্টায় বিদ্যুৎ খরচ হবে ১৩.৪৭ মেগাওয়াট। প্রতি ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী মেট্রোরেল ব্যবহার করে চলাচল করতে পারবেন। এমআরটি-৬-এর উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৯ সালের ১৫ অক্টোবর এমআরটি-১ এবং এমআরটি-৫ লাইন দুটির নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এমআরটি-১ বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর ও নতুনবাজার হয়ে পূর্বাচল পর্যন্ত মোট ৩১.২৪ কিলোমিটার পথে মেট্রোরেল নির্মিত হবে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ৫২ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা। ২০২৬ সালে এটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে। এটি চালু হলে দৈনিক আট লাখ যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করতে পারবেন।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র : দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে তৈরি হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। রাশিয়ার সহযোগিতায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প থেকে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এ প্রকল্পে রাশিয়া দিচ্ছে ৯১ হাজার ৪০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি পুরোদমে চালু হলে কর্মসংস্থান হবে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের। ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ নম্বর ইউনিটের প্রথম কংক্রিটের ঢালাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্লাবে যুক্ত হলো। ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিটটি আগামী বছরের শেষ নাগাদ চালু করা সম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু টানেল : কর্ণফুলী নদীর তলদেশে চলছে দেশের প্রথম দুই টিউববিশিষ্ট বহুলেনের সড়ক নির্মাণকাজ। এ কাজটি করা হচ্ছে শিল্ড ড্রাইভেন মেথড পদ্ধতিতে। এ ট্যানেলটি চট্টগ্রাম মহানগরীর পতেঙ্গা ও দক্ষিণের

আনোয়ারা প্রান্তকে সংযুক্ত করবে। ১০ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু ট্যানেল নির্মিত হচ্ছে। ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ টানেলের উদ্বোধন করেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু টানেল জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এ টানেল চালু হলে প্রতিষ্ঠিত হবে বহুমুখী যোগাযোগব্যবস্থা। শিল্পকারখানা এবং পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ টানেল।

মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট: জাপান সরকারের অর্থায়নে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৫১ হাজার ৮৫৪.৮৮কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০২৪ সালের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহেশখালী দ্বীপের অবকাঠামো উন্নয়নসহ এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণ : কক্সবাজারের বর্তমান বিমানবন্দরের ৯ হাজার ফুট দৈর্ঘ্যের রানওয়ে বাড়িয়ে ১০ হাজার ৭০০ ফুটে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১ হাজার ৫৬৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ের ১ হাজার ৩০০ ফুট থাকবে সমুদ্রের মধ্যে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নতুন প্রজন্মের বিমান বোয়িং ৭৭-৩০০ ইআর, ৭৪৭-৪০০ ও এয়ারবাসের মতো উড়োজাহাজ সহজেই ওঠানামা করতে পারবে।

পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ : পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। দোতলা এ সেতুর নীচ দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলবে রেল। ৩৯ হাজার ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৪ সালের জুনে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড়ো উন্নয়ন প্রকল্প।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রামের কুতুবখালী পর্যন্ত মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রতিদিন ৮০ হাজারের ও বেশি যানবাহন এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করতে পারবে। এতে যোগাযোগব্যবস্থা অনেক সহজ হবে এবং দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

রামপাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প : রামপাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বাগেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত। ২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে পশুর নদীর তীরঘেঁষা এই প্রকল্পে ১৮৩৪ একর জমির সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। ডিসেম্বরে দুই ইউনিটের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটিতে উৎপাদন শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আশা করছেন।

দোহাজারী-রামু-ঘুমধুম ডুয়েল গেজ ট্রাক : চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজারের রামু হয়ে ঘুমধুম পর্যন্ত প্রায় ১৮৮ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ১৮ হাজার ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৬৯ ভাগ কাজ শেষ, ২৩ সালের জুনে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাবে ট্রেন। করোনা মহামারি ও বিভিন্ন কারণে কাজের অগ্রগতি যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হয়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে পর্যটননগরী কক্সবাজারের। আমূল পরিবর্তন হবে যোগাযোগ, পর্যটন, কৃষি, মৎস ও লবণ শিল্পের।

এসব প্রকল্প ছাড়াও আরও বেশ কিছু মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমারই গড়ব–এটা কোনো স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।

লেখক : উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম

দেশে ক্যান্সার চিকিৎসায় সরকারের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ

মো. মাইদুল ইসলাম প্রধান

একটি পরিবারে ক্যান্সার আক্রান্ত একজন রোগী থাকা মানেই সেই গোটা পরিবারটিরই চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করতে করতে দরিদ্র পরিবারের কাতারে চলে যাওয়া। অনেক ভালো চিকিৎসার পরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তিটি শেষমেশ মারাই যান। আর আক্রান্ত পরিবারটি একদিকে সীমাহীন পারিবারিক কষ্টে থাকে, অন্যদিকে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে গোটা পরিবারটিই দিশেহারা ও বেসামাল হয়ে পড়ে।

সত্যিকার অর্থেই চিকিৎসাক্ষেত্রে ক্যান্সার একটি মরনব্যাধি রোগের নাম। এই রোগটি শরীরে বাসা বাঁধলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যায়ে ধরা পড়ে। একেবারে শেষ পর্যায়ে ধরা পড়ার কারণে বেশিরভাগ রোগীই মারা যায়। অথচ আক্রান্ত হওয়ার শুরুতেই যদি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব হয় তাহলে খুব অল্প খরচে অধিকাংশ রোগীই সুস্থ হতে পারে।

বড়ো একটি সমস্যা হচ্ছে, দেশে মোটামুটি ভালোমানের ক্যান্সার চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়, এ রকম হাসপাতাল আছে হাতে গোনা। এই হাসপাতালগুলোর অধিকাংশই ঢাকাকেন্দ্রিক হওয়ায় দিন দিন রোগীর চাপ বেশি হচ্ছে এবং রোগীরা ক্যান্সার চিকিৎসা করতে বিদেশমুখী হয়ে অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। দেশে বেসরকারি কিছু হাসপাতালে মানসম্মত ক্যান্সার চিকিৎসা দেওয়া হলেও তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় দেশের অধিকাংশ মানুষ এসব হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে পারে না।

অন্যদিকে পরিসংখ্যান বলছে, দিন যতই যাচ্ছে দেশে ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা ততই বেড়ে চলেছে। প্রতিবছর গড়ে দেড় থেকে দুই লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে এবং এদের মধ্যে এক থেকে দেড় লাখ আক্রান্ত মানুষই এই রোগে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে। অন্যদিকে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে বছরে বছরে এই বিরাটসংখ্যক পরিবারগুলি নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সারের (আইএআরসি) সাম্প্রতিক প্রকাশিত অনুমিত হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে

প্রতিবছর এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষ নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে মারা যায় এক লাখ আট হাজার এবং এই সংখ্যা প্রতিবছর বেড়েই চলছে। এই সংস্থার মতে, বাংলাদেশে ক্যান্সার আক্রান্তের হার প্রতি লাখে ১০৫.৭ এবং মৃত্যুহার প্রতি লাখে ৭৭.১।

অনানুষ্ঠানিক অন্য এক জরিপে দেখা গছে, এই অনুমিত ক্যান্সার রোগীদের এক-তৃতীয়াংশ দেশের স্বীকৃত চিকিৎসাসেবার আওতায় আসে। বাকিদের একটা বড়ো অংশ বিদেশে চিকিৎসা নিচ্ছে কিংবা নানা অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসাসেবার বাইরে থেকে যাচ্ছে বিপুলসংখ্যক রোগী। গত দুই দশকে দেশে সরকারি খাতে ক্যান্সার চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটেছে লক্ষণীয়ভাব। ঢাকার মহাখালীর জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা প্রথমে ৫০ থেকে ৩০০-তে উন্নীত করা হয়েছে এবং এর পর আরও ৫০০ শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেখানে রেডিওথেরাপির আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও ঢাকার বাইরে বগুড়াতে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেডিওথেরাপির সর্বাধুনিক লিনিয়ার এক্সিলারেটর মেশিন সংযুক্ত করা হয়েছে। পুরাতন ৮টি বিভাগীয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গভাবে সবগুলিতে ক্যান্সার বিকিরণ চিকিৎসা, কেমোথেরাপির ব্যবস্থা চালু নেই। বেসরকারি খাতে কয়েকটি বড়ো হাসপাতালে রেডিওথেরাপিসহ ক্যান্সার চিকিৎসা চালু হয়েছে, যেখানে অনেক সচ্ছল রোগী চিকিৎসা নিতে পারছে, যা সাধারণ মানুষের চিকিৎসাপ্রাপ্তির নাগালে বাইরেই রয়ে গেছে। একমাত্র জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ছাড়া সরকারি-বেসরকারি কোনো বিশেষায়িত ক্যান্সার সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। এখন পর্যন্ত ক্যান্সার চিকিৎসাব্যবস্থা রাজধানীকেন্দ্রিক। তাই সরকারিভাবে চিকিৎসার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকতে হয়। উপরন্তু ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী সামর্থ্য না থাকলেও বাধ্য হয়ে বিদেশি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধা রাজধানীকেন্দ্রিক হওয়ায় এবং ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা, অসচেতনতায় রোগ নির্ণয় বিলম্বিত হয়, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব হয় না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যান্সার নির্ণয়ের এক বছরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ রোগী মারা যায়, কিংবা ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়। এমতাবস্থায় দেশের অধিকাংশ মানুষের ভৌগোলিক ও আর্থিক অবস্থার নাগালের মধ্যে ক্যান্সার সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ প্রয়োজন। ক্যান্সার রোগীর সঠিক পরিসংখ্যান এবং জনগোষ্ঠীভিত্তিক বা পপুলেশনভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রির মাধ্যমে ক্যান্সারে আক্রান্তের হার, মৃত্যুহারসহ গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত পাওয়া সম্ভব, যা সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। ২০০৪ সালে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ও ১৯টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ক্যান্সার নিবন্ধন কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু হয়েছে। কিন্তু জনগোষ্ঠীভিত্তিক ক্যান্সার নিবন্ধনের উদ্যোগ নেওয়া ছাড়া উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া সম্ভব নয়।

ক্রমান্বয়ে ক্যান্সার চিকিৎসায় একদিকে ঢাকার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমানোর তাগিদ, অন্যদিকে এই ক্যান্সার চিকিৎসায় সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে দরিদ্র হয়ে যাওয়া ঠেকানোর বিষয়টি সরকারের মাথাব্যাথা হয়ে দেখা দেয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জাহিদ মালেক ২০১৮ সালে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তুলে ধরলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্যান্সার চিকিৎসায় দেশব্যাপী চিকিৎসাসেবা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেন। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উঠে পড়ে লাগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ক্যান্সার চিকিৎসায় গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের ৮টি বিভাগেই ৮টি ১৫ তলাবিশিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ক্যান্সারের পাশাপাশি সেখানে কিডনি, লিভার এবং ডায়ালাইসিস সুবিধা রাখার জন্যও আলাদা ব্যবস্থা রাখার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্যান্সার চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবশেষে জুলাই, ২০১৯ থেকে প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন করতে কাজ শুরু হয়। কাজ শেষ করা বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময় নির্ধারণ করা হয় জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটি গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ১১ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, সারা দেশে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত বিশাল জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসাসেবার আওতায় আনা; সূচনাতেই ক্যান্সার রোগ নির্ণয় এবং সময়মতো ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা; ক্যান্সার চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসাসেবার আওতায় আনা; ক্যান্সার চিকিৎসাসেবায় বৈদেশিক নির্ভরতা কমিয়ে আনা, পক্ষান্তরে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা; ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে Out of Pocket Expenditure দেশে ক্যান্সার চিকিৎসাসেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা।

সর্বোপরি আট বিভাগে ৮টি উন্নত মানের ক্যান্সার, কিডনি, লিভার চিকিৎসা হাসপাতাল নির্মাণ নিঃসন্দেহে সরকারের একটি সুদূরপ্রসারী ও ফলপ্রসূ চিন্তার ফসল হয়ে দেখা দেবে বলে দেশের বিজ্ঞজনরা মনে করছেন। হাসপাতালগুলির নির্মাণকাজের অগ্রগতি এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আজ ৯ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাসপাতালগুলির ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেছেন। আশা করা যাচ্ছে, নির্ধারিত সময়েই হাসপাতালগুলি কার্যক্ষম হয়ে উঠবে। হাসপাতালগুলির প্রতিটিতেই প্রথম অবস্থায় অন্তত ১০০টি করে ক্যান্সার শয্যার মাধ্যমে চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা থাকবে। এর পাশাপাশি সমহারে কিডনি, লিভার চিকিৎসার জন্যও শয্যা থাকবে। এগুলি প্রস্তুত হয়ে গেলে ক্যান্সার চিকিৎসায় ঢাকার ওপর চাপ অনেকাংশেই কমে যাবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। সাধারণ মানুষজন ঢাকায় এসে চিকিৎসা করাতে অতিরিক্ত টাকা খরচ করার পাশাপাশি চিকিৎসাসংক্রান্ত ভোগান্তির হাত থেকেও বেঁচে যাবে। হাসপাতালগুলি চালু হলে একদিকে দ্রুততার সাথে রোগটিকে প্রথম পর্যায়েই নির্ণয় করা যেমন সহজ হবে, অন্যদিকে চিকিৎসাসেবায় জটিল ও ভীতির এই রোগটির চিকিৎসায় দেশের প্রান্তিক মানুষ অনেকটাই স্বস্তির শ্বাস নিতে শুরু করবে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বেবি ব্লুজ

ডা. সুমাইয়া বিনতে ঋতু

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে রুনা, দুই ভাই আর মা-বাবা নিয়ে তাদের সংসার। বাবা ব্যবসায়ী আর মা গৃহিণী, বড়ো ভাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর ছোটোভাই সবে এস এস সি পাস করে কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরই মধ্যে রুনার বিয়ের প্রস্তাব আসে। রুনা মাত্র অনার্স প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে, মা-বাবার কাছে প্রস্তাবটি মনপুত হওয়ায় কম্পিউটার ব্যবসায়ী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় রুমার। ভালোই কাটছিলো তাদের জীবন। বাবার বাড়ি, শশুর বাড়ি দুই জায়গাতেই থেকে সবকিছু সমন্বয় করে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলো রুনা। বছর দেড়েক পরে তার বাচ্চার জন্ম হলো। বাচ্চা জন্মের সময় কিছুটা জটিলতা হয়েছিল। যদিও স্বামী, শশুর- শাশুড়ী, মা-বাবাসহ সবাই সব সময় টেক কেয়ার করেছে। নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক পুরো সময় পার করেছে। সন্তান জন্মের পর রুনা ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। রাতে ঘুম না হওয়া, হটাৎ হঠাৎ কান্না পাওয়া, সব সময় মন খারাপ থাকা ইত্যাদি রুনার অসুস্থতার কারণ হিসেবে দেখা দিল। রুনার পরিবার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো। ডাক্তার রুনার কেইস হিস্ট্রি শুনে প্রাথমিকভাবে এটিকে ‘বেবি ব্লুজ’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পূর্বে কয়েকটি টেস্ট করার জন্য পরামর্শ দেন। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ঐদিনই টেস্টগুলো করে ডাক্তারকে রিপোর্ট দেখানো হলো। ডাক্তার এটাকে বেবি ব্লুজ নিশ্চিত করলেন। তিনি রুনা এবং তার পরিবারের সদস্যদের অভয় দিয়ে বল্লেন ভয়ের কিছু নেই। এটা নিরাময়যোগ্য অসুখ। নিয়মিত ওষুধ সেবন এবং পরামর্শ মোতাবেক চললে কোনো সমস্যা হবে না। এরপর পরিবারের সবাইকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন।

আমাদের দেশে এখনো অধিকাংশ মা-বাবা দ্রুতই মেয়েদের বিয়ে দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে। অধিকাংশ পরিবারের মায়েদের গর্ভে সন্তান আসা থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম দেওয়া এবং এর পরবর্তী একমাস অত্যান্ত কঠিন সময়ের মধ্যে পার করতে হয়। এই পুরো সময় মায়েদের মতামতের সবচেয়ে বেশি

গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন হলেও দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এমনিতেই মায়েদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আর এ সময়ে মায়েরা আরও বেশি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এসময় পরিবারের সকলের সাহায্য করা দরকার। নতুন মায়েদের জন্য এটা আরও বেশি দরকার। সন্তান জন্ম গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যে নবজাতকের মা বা বাবা অথবা মা-বাবা উভয়েরই মনমরা বা খিটখিটে মেজাজ দেখা দিতে পারে। খুব সাধারণ কারণে হঠাৎ করে কান্নাও পেতে পারে। এ লক্ষণ গুলোকে বেবি ব্লুজ বলে। নবজাতক সন্তানকে কোলে নেওয়ার পর সাধারণত কয়েক দিনের মধ্যেই এ অনুভূতিগুলো এমনিতেই আর দেখা যায় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে অবহেলা না করে দ্রুতচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। অন্যথায় ভয়াবহ মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পুরুষের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। সন্তান জন্ম দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে প্রতি দশজন মেয়ের আট জনের মধ্যে এধরনের মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এসময়ে মন মরা ও খারাপ লাগা ছাড়াও আরও অনেক রকম অনুভূতি হতে পারে। এরমধ্যে শিশু পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকার পরও অহেতুক শিশুর স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ পেয়ে বসা। কোনো কিছুতে মন না বসা। সবসময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকা। মানসিক অবসাদের মধ্যে দিন অতিবাহিত করা। বেবি ব্লুজের একটা অন্যতম কারণ হলো সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর মায়ের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। এরমধ্যে হরমোনজনিত প্রভাব বেশি কাজ করে। এড্রিনাল নামক গ্রন্থি থেকে গর্ভকালীন অবস্থায় যে পরিমাণ হরমোন নিঃসৃত হতো তা হঠাৎ করে কমে যায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এটাই বেবি ব্লুজের প্রাথমিক কারণ। এছাড়াও মায়েদের বুকের দুধ উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে গর্ভকালীন অবস্থায় যে পরিমাণ হরমোন শরীরের মধ্যে ছিল সেগুলো ধীরে ধীরে বের হয়ে যেতে থাকে। খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। মায়েদের এসময় শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তনও হয়ে থাকে। নবজাতকের কারণে মায়েদের মধ্যে এক ধরনের দায়িত্ববোধ জন্মে, সেটাও একটা মানসিক চাপ হিসেবে দেখা দেয়। একজন মা তার শিশু জন্ম দেওয়ার পর হাসপাতাল থেকে বাসায় এসে কয়েক দিন নবজাতকের সাথে অতিবাহিত না করার আগে তার মধ্যে যে মানসিক পরিবর্তনগুলো ঘটে তা কখনো কল্পনা করা যায় না। মা হওয়া যে আনন্দের অনুভূতি তা অনেক মা শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না, তাদের জন্য এটা মানসিক

চাপ হিসেবে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বড়ো একটা সমস্যা হলো একজন মা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর যে পরিমাণ উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা তার মধ্যে ছিল, সেগুলো কমতে থাকে এবং মা তখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। মা তখন দিনে এমনকি রাতেও ভালোভাবে ঘুমতে পারে না। বাচ্চা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনও মার মধ্যে দুশ্চিন্তা কাজ করে,ঘুম আসে না।

বাবাদের মাঝেও সন্তান জন্ম নেওয়া পর নানারকম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে নতুন বাবাদের ক্ষেত্রে শতকরা দশভাগ এই সমস্যায় ভোগেন। এটাকে বলা হয় Male Postpartum Crisis or Daddy Blues. সমীক্ষায় দেখা গেছে বাবা হওয়ার পর শিশুর প্রথম ৫ বছরে এই সমস্যা শতকরা ৬৮ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে যায়। যারা কম বয়সে বাবা হয় তাদের এ সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। মায়েরা যত তাড়াতাড়ি সন্তানের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন, বাবারা তত তাড়াতাড়ি পারেন না। এছাড়াও সন্তানের ভরণপোষণ যত্ন নেওয়া থেকে বড়ো করে তোলা,তার ভবিষ্যতের বিষয়গুলো নতুন মা-বাবারে জন্য সবসময়ই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয় যা তাদের মানসিক চাপ হিসেবে কাজ করে। এসময় নতুন বাবারা নিজেদেরকে অনেক সময় বাইরের লোক মনে করে। তাছাড়া বেশি কান্নাকাটি করা শিশু, বেশি দায়দায়িত্ব থাকা, স্ত্রীকে ঠিকমতো বুঝতে না পারা এসবই বাবাদের জন্য মানসিক চাপ হিসেবে কাজ করে। এসময় বাবাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, স্ত্রী সন্তান থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা, নেশা করা,অকারণে মন খারাপ হওয়া, ঠিকমতো ঘুম না হওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। এধরনের সমস্যা দীর্ঘ মেয়াদে দেখা দিলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এটা কোনো জটিল অসুখ না,সময়মতো চিকিৎসা করলে সহজেই এ ধরনের মানসিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

নবজাতকের জন্মের সাথে সাথে নতুন মা-বাবারও জন্ম হয়। সন্তান জন্ম দিতে একজন প্রসূতি মাকে প্রচুর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। ফলে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর তার মন স্বাভাবিকের চেয়ে কোমল ও স্পর্শকাতর থাকে। সন্তান জন্ম দেওয়ার আনন্দদায়ক অনুভূতি উপভোগ করার জন্য সকল মা-বাবাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। এজন্য পরিবারের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আগামীদিনের ভবিষ্যতকে আমাদের সকলের সহোযোগিতায় গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি নতুন মা-বাবাকেও সুস্থ জীবনযাপন করতে হবে।

লেখক : চিকিৎসক

বর্তমান সরকারের সাফল্য

জাহিদুল ইসলাম ফারুক

এক সময়ে বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আজ বিশ্বের বিশ্বয় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক খাতে বিশ্বয়কর উত্থান ও অগ্রযাত্রা এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আর এসবই সম্ভব হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগের ফলে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ’ খাত দশ প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। রূপকল্প-২১ সামনে রেখে এসব প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিলো। এ সব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আর্থসামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক রচিত হবে। একই সঙ্গে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর হওয়ার স্বপ্নপূরণ হবে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে-একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, শিক্ষা সহায়তা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে নেয়া এই দশ কর্মসূচিকে ব্র্যান্ডিং করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে দারিদ্র্যমোচনে দক্ষতা অর্জনে আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে নেয়া একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পকে এগিয়ে নেয়া এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিনিয়োগ বিকাশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন।

এছাড়া দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিনিয়োগ বিকাশ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের ফলে দেশে বিনিয়োগের খরা কাটবে বলেও সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। ‘বিনিয়োগ বিকাশ’ বহির্বিশ্বে এমনভাবে ব্র্যান্ডিং করা হবে যাতে বিদেশিরা এদেশে বিনিয়োগ এগিয়ে আসেন। এছাড়া দেশি উদ্যোক্তাদেরও আস্থা ফিরিয়ে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

এদিকে, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ইতোমধ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিনিয়োগের প্রধান বাধাগুলো কী তা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এসব বাধা দূর করে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো চেষ্টা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতিও বিনিয়োগবান্ধব করা হয়েছে। এছাড়া ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার বিনিয়োগ বাড়াতে ওই দেশগুলোর জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল সংরক্ষণ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে সরকার ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। শুধু তাই নয়, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে আগামী পনের বছরে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এর ফলে দেশের রফতানি আয় বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রায় ১ কোটি মানুষের।

প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহে এই দশ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। এই কর্মসূচি দ্রুতবাস্তবায়ন ও ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সমন্বয় করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন খাতে যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো উদ্যোগই প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা-প্রসূত, যা ইতোমধ্যে 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে এবং হচ্ছে।

দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর এবং এসডিজি অর্জনে এসব খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) মূল ভাবনার সঙ্গে সরকারের সার্বজনীন মানব উন্নয়ন চিন্তার ব্যাপক মিল রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন ভাবনা কার্যকরভাবে উপস্থাপন করে সকল কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন স্তরের নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

চলমান মেগা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু, মেট্রোরেল, পায়রা সমুদ্রবন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং এলএনজি টার্মিনাল ইত্যাদি।

পদ্মা বহুমুখী সেতু : বর্তমান সরকারের চ্যালেঞ্জ বহুল প্রত্যাশিত এ প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির পর গত ২৫ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেতু টি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উদ্বোধন করেছেন।পদ্মা সেতু রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলের সরাসরি সংযোগ সৃষ্টি করছে। এর ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৯ ভাগ বা ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার ২১ জেলার ৩ কোটিরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে এ সেতুর মাধ্যমে ।

পদ্মা রেলসেতু সংযোগ: দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্প ২০২২ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সরকারের। ১৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেলপথ নির্মাণের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-খুলনা পথে ২১২, ঢাকা-যশোর পথে ১৮৪ এবং ঢাকা-দর্শনা পথে দূরত্ব কমবে ৪৪ কিলোমিটার। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৫৮.৫ শতাংশের বেশি। (মে/২২ পর্যন্ত)

দোহাজারি-রামু-কক্সবাজার গুনদুম রেলপথ: পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে গৃহীত প্রকল্পটির ব্যয় ১৮ হাজার ৩০৪ কোটি টাকা। দোহাজারী রামু কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্প কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৭১ শতাংশের বেশি। আগামী ২৩ সালের জুনে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাজধানী ঢাকা থেকে সরাসরি ট্রেনে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কক্সবাজার যাওয়া যাবে।

বঙ্গবন্ধু (কর্ণফুলী) টানেল: আগামী ডিসেম্বরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৮৬ শতাংশের বেশি।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ হবে। তবে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে তেজগাঁও রেলগেট পর্যন্ত আগামী ডিসেম্বরে উন্মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৭৮.৮৯ শতাংশ।

মেট্রোরেল: মেগা প্রকল্পগুলোর অন্যতম এ প্রকল্পে ব্যয় ধরা আছে ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা। সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্পে ৫ হাজার ৩৯০ কোটি

টাকা ও জাপান ১৬ হাজার ৫৯৮ কোটি টাকা যোগান দেবে। ২০২৪ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। সার্বিক কাজের অগ্রগতি শতকরা ৭৫ শতাংশের বেশি। তবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের কাজের অগ্রগতি ৯২ শতাংশের বেশি। উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আগামী ডিসেম্বরে উন্মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

পায়রা সমুদ্রবন্দর: দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের অনগ্রসরতা, আমদানি বৃদ্ধি এবং বন্দরের ভবিষ্যৎ ধারণ ক্ষমতা বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। দেশের তৃতীয় এ বন্দর নির্মাণে ২০১৩ সালের নভেম্বরে জাতীয় সংসদে 'পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন' নামের একটি আইন পাস হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার রাবনাবাদ চ্যানেলে পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১ হাজার ১৪৪ কোটি টাকার ২০২৩ সালের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৬৫ শতাংশের বেশি।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ: বাংলাদশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পাবনার ঈশ্বরদীতে ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি ৯১ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রাশিয়া প্রকল্প ব্যয়ের ৯০ শতাংশ ঋণ হিসেবে বাংলাদেশকে দিচ্ছে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ জোগান দেবে বাংলাদেশ। ২ হাজার ৪ শত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এ প্রকল্প থেকে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫০ শতাংশ। প্রথম ইউনিটের কাজের অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ। এ ইউনিট হতে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় গ্রিডে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র : কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা ইউনিয়নে ৬০০ মেগাওয়াট করে দুটি কেন্দ্রের মাধ্য মোট ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে এ প্রকল্প নেওয়া। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে জাপান দেবে ২৮ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা। পাওয়ার প্ল্যান্টের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭৬.৯০ শতাংশ। প্রথম ইউনিট জানুয়ারি ২০২৪ এবং দ্বিতীয় ইউনিট জুলাই ২০২৪ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসবে। কাজের অগ্রগতি ৫১ শতাংশের বেশি।

মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র: ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বাগেরহাটের রামপালে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৪ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি ইউনিটের মাধ্যমে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এই প্রকল্পে।

সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর: দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপে। বন্দরটি হলে তা প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য ব্যবহার করতে পারবে। সরকার মনে করে, বন্দরটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রে পরিণত হবে।

এলএনজি টার্মিনাল: সাংগু গ্যাস ক্ষেত্র শেষ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্যাসসংকট বিরাজ করছে। এ সংকট নিরসনে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির লক্ষ্যে মহেশখালী উপকূলে দৈনিক ৫০ কোটি ঘনফুট গ্যাসসরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি টার্মিনাল নির্মান করা হয়েছে। টার্মিনাল থেকে মূল ভূখণ্ডে গ্যাস আনতে ৯১ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ টার্মিনালের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয় ১৯ আগস্ট ২০১৮ থেকে। ৩০ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ ৪১৪,২৯৭.৪৭ এমএমএস সিএফ।

কাউকে পিছনে ফেলে নয়,সকলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার - দর্শনটি আজ বাংলাদেশের অগ্রগতির অভিযাত্রায় অন্তর্ভুক্তমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল হিসেবে সমাদৃত, যা আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারাকে নবপল্লবে বিকশিত করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথকে সুগম করেছে। সকল সমস্যা মোকাবিলা করে ২০৩০ সালে এসডিজি এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠন করাই এখন সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ।

লেখক : ফ্রিল্যান্সার ও সমাজকর্মী

পুষ্টি বৈষম্য

ডা. তাসনুভা আহমেদ খান

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। এছাড়াও সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জন স্বাস্থ্যের উন্নয়নসাধনকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দেশের সকল নাগরিকের কর্মক্ষম সুস্থ জীবনযাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের সাথে মিল রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবসান (এসডিজি -১), ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান (এসডিজি -২) অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের প্রথমেই জানা দরকার অপুষ্টি কি? অপুষ্টি হলো ম্যাক্রো অথবা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সেবনে ঘাটতি, নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় গ্রহণ বা ভারসাম্যহীনতার সাথে সম্পর্কিত একটি অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুষ্টি স্বল্পতা ও স্থূলতা এদুটোই অপুষ্টির ধরন। শিশু খর্বকায় বা শীর্ণকায় হওয়া এদুটোই পুষ্টি স্বল্পতার নির্দেশক। অপুষ্টির সাথে আরও কতগুলো বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়,যেমন ক্ষুধা, পরিমিত খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা ও তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। খাবার থেকে পর্যাপ্ত শক্তি না পাওয়ার কারণে সৃষ্ট একটি অস্বস্তিকর বা বেদনাদায়ক অনুভূতি। পরিমিত খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা হলো খাদ্য প্রাপ্তির সক্ষমতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, খাবার থেকে বাদ পড়ার বা খাবার শেষ হতে দেখার ঝুঁকি, পুষ্টিগতমান অথবা খাদ্য গ্রহণের পরিমাণের সাথে আপস করতে বাধ্য করা। তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হলো খাদ্য শেষ হয়ে যাওয়া, ক্ষুধা অনুভব করা, একেবারে চরম অবস্থায় কোনো কোনো খাবার না খেয়েই এক বা একাধিক দিন পার করা।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতাবিধি, শিক্ষা এবং শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে দুর্দান্ত অগ্রগতি অর্জন করছে। এগুলো বিশ্বের

কাছে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এসডিজির মূলনীতি হলো কেউ পিছিয়ে থাকবে না, তার আলোকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যারা পিছিয়ে আছে তাদের চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার দেশের পুষ্টি বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসকল পদক্ষেপের ফলে পরিবারের গড় আকার কমে ৪.৩ এ দাঁড়িয়েছে,গড় প্রজনন হার ২.৩,স্তন্যপান করা শিশুর সংখ্যা ৯৮.৫,প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় শতভাগ শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের হার বেড়েছে। মাঝারি ধরনের ও মারাত্মক পর্যায়ের খর্বকায় শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে। বছরে দুই বার ৬-৫৯ মাস বয়সি শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে,এতে রাতকানা রোগ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সাধিত হয়েছে। প্রায় সব পরিবারের ক্ষেত্রেই খাবার পানির সংগ্রহের উৎসের উন্নতি হয়েছে। গ্রামীণ ও শহরের পরিবারগুলোর মধ্যে এক্ষেত্রে পার্থক্য খুব সামান্য। এর মধ্যে ৪৩ শতাংশেরও বেশি জনগোষ্ঠী এমন এলাকায় বসবাস করে যেখানে তাদের আবাসস্থলেই পানির উৎস রয়েছে। তবে অনেক জায়গায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নতি হয়নি। সেসব জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকার সচেতন ভাবে সেগুলো নিয়ে কাজ করছে। শিশুদের সাথে সহিংস আচরণের হার আশঙ্কাজনকভাবে রয়ে গেছে। ১-৪ বছর বয়সি শিশুদের প্রায় ৮৮ শতাংশই তাদের লালন-পালনকারীদের কাছ থেকেই সহিংস আচরণের শিকার হয়। বাল্যবিয়ে আমাদের সমাজে এখনো ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। যদিও সরকারের নানামুখী কার্যক্রমের ফলে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তারপরও এটা গ্রহণযোগ্য মাত্রা থেকে অনেক বেশি। ৫-১৭ বছরের শিশুদের মধ্যে ৬ শতাংশের বেশি শিশু শ্রমের সাথে জড়িত। স্কুলে যাওয়া শিশুদের তুলনায় স্কুলে না যাওয়া শিশুদের মধ্যে এ হার অনেক বেশি। ৩৬-৫৯ মাস বয়সি শিশুদের মধ্যে শৈশবকালীন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া শিশুর সংখ্যা কম। জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয় এমন শিশুর সংখ্যা এখনো কম। স্বাস্থ্যকর আচারণের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট সচেতন থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস কমই রয়ে গেছে।

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাকার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে ন্যশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস) শীর্ষক ২৯ টি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য অপুষ্টিজনিত

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুষ্টি সেবা প্রদান। দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে কাজ করা। এছাড়াও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক,মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে পুষ্টিহীনতা নিয়ন্ত্রণ, সম্পূরক পুষ্টির প্রবর্তন এবং মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এর মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষধখাত এবং চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুইশত পঞ্চাশটিরও বেশি মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি সেবাকেন্দ্র এবং চাশতটিরও বেশি শিশু বয়স কালের সমন্বিত সেবা কর্নার ও পুষ্টি কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সমাজে পুষ্টি বৈষম্যতা রয়েছে। ঢাকা বিভাগের দারিদ্র্যের হার কম,অপরদিকে রংপুর বিভাগের দারিদ্র্যের হার বেশি। খুলনা,বরিশাল ও সিলেট বিভাগে পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহর অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার বেশি। হাওয়া, নদী ভাঙা,পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশি। এসব অঞ্চলের মানুষের আয় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈচিত্রপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয় না। ফলে পুষ্টি বৈষম্য দেখা যায়। জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগের সুষম খাবারের ঘটিত রয়েছে, যেখানে ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম,জিংক এবং আয়রনের অভাব উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অপুষ্টি এড়াতে না পারলে স্থূলতা ও অসংক্রামক রোগের প্রবণতা বাড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এসব কারণ সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে না পারলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বাংলাদেশের অগ্রগতি হুমকির মধ্যে পড়বে।

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। জাতীয় মাথাপিছু ক্যালরি প্রাপ্তির নিরিখে আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের কারণে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগও আমাদের বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান আয় এবং নগরায়ণের ফলে খাদ্য তালিকায় কিছু বৈচিত্র ঘটেছে। করোনা অতিমারিকালে অব্যাহতভাবে

সারা বিশ্বে খাদ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতার কারণে খাদ্য সংকট বা বিতরণ ব্যবস্থায় কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। ২০৩০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৮ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে কিছু নেতিবাচক প্রবণতা যেমন ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই কৃষির প্রসার,আয় বৈষম্য, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি মোকাবিলা করতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতাই আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। আমাদের দেশের মানুষ কখনো পরাজিত হয়নি। তাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের পুষ্টি বৈষম্য দূর করে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

লেখক : চিকিৎসক

জনসংখ্যা উন্নয়নে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ

সেলিনা আক্তার

আমাদের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও অমিত সম্ভাবনা রয়েছে যা এ দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য চাই বৈশ্বিক ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময়োপযোগী সুদূরপ্রসারী সঠিক পরিকল্পনা ও তার যথার্থ বাস্তবায়ন। ১১ জুলাই ছিল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ, বেকারত্ব, চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতা ইত্যাদি সমস্যার মূলে রয়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা। মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৮৯ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এবারও বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো- “A world of 8 billion: Towards a resilient future for all- Harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all” যার ভাবার্থ করা হয়েছে-৮০০ কোটির পৃথিবী: সকলের সুযোগ, পছন্দ ও অধিকার নিশ্চিত করে প্রাণবন্ত ভবিষ্যৎ গড়ি’। ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে উন্নীত হয়। এর ফলে ইউএনডিপি’র গভর্ন্যান্স কাউন্সিল প্রতিবছর দিনটিকে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

একটি রাষ্ট্রের যে কয়েকটি মৌলিক উপাদান রয়েছে তার মধ্যে জনসংখ্যা অন্যতম। আর এ জনসংখ্যা কোনো দেশের জন্য সম্পদ আবার কোনো দেশের জন্য বোঝা। কোনো কোনো দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা না করে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে প্রযুক্তি ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা দক্ষ করতে পারলে তা সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় অপুষ্টি, পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব, চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতার মূলে রয়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা। আর এসব বিষয়কে সামনে রেখে জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যাগুলো

সবাইকে অবহিত করা এবং তা গুরুত্ব সহকারে সমাধানের প্রচেষ্টা করাই হলো দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের আয়তনের দিক দিয়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা জনগণের এই মৌলিক চাহিদাগুলো রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন চাহিদা ও উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে প্রতিনিয়ত ভূমি, পানিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মাত্রারিক্ত চাপ পড়ছে। যার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জানমালের ক্ষতিসহ উন্নয়ন ও অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর ধ্বংসস্তুপ থেকেই দেশটির পথচলা শুরু। ছিল না অবকাঠামো, ছিল না কোনো প্রতিষ্ঠানও। স্বাধীনতার পর থেকে অজস্র বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। একসময় বিশ্বে দুর্ভিক্ষে জর্জরিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয় ছিল, যা এখন ইতিহাস। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। সামাজিক উন্নয়ন সূচকগুলোতে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশের। যেমন শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার বেড়েছে অনেক। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় প্রকৃত অর্থে তিনগুণ বেড়েছে, আর গড় আয়ু ১৯৭১-১৯৭২ সালের ৪৭ বছর থেকে ২০২১ সালে ৭২.০৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে এটা দারুণ খবর। আমাদের সার্বিক উন্নতি হচ্ছে তারই ফল গড় আয়ু বেড়েছে।

তিনি বলেন, গড় আয়ু, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। জনবহুল দেশ হওয়ার পরও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আছে। একজন মা এখন গড়ে দুটি সন্তানের জন্ম দেন। এখন থেকে ৫০ বছর পেছনে তাকালে দেখা যাবে তখন একজন মা গড়ে ছয়টি সন্তানের জন্ম দিতেন। আমাদের দেশের মানুষ এখন শিক্ষিত হয়েছে, সচেতনতা বেড়েছে।

আমাদের দেশে মোট প্রজনন হার ২ দশমিক ০৪ শতাংশ, প্রতি হাজারে মাতৃমৃত্যু হার ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ, ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৭৫ দশমিক ৬ শতাংশ, ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৭৫ দশমিক ২ শতাংশ, ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব নারী শিক্ষার হার ৭২ দশমিক ৯ শতাংশ। এছাড়া দেশের ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং নারী ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

জনসংখ্যার বিচারে আমাদের দেশ অষ্টমস্থানে রয়েছে। কোথাও কোথাও আবার নবমও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অভ স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) এর হিসেবে আমাদের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি এবং বিশ্বের জনসংখ্যা ৭৮০ কোটি। আমাদের দেশের সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন (ডবিউএইচও)-এর হিসাবমতে, প্রতি মিনিটে ২৫০টি শিশু জন্মগ্রহণ করে আর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে ১০টি শিশু। এক জরিপে দেখা গেছে যে, বর্তমানে জন্মগ্রহণকারী ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৯৭ জন জন্মগ্রহণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। এমনিতেই দেশগুলো অধিক জনসংখ্যার দেশ। সেদিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশকে এখন রোল মডেল বলে মনে করে। বাংলাদেশ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জিডিপি অর্জনকারী দেশ। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৭ দশমিক ২ শতাংশ। করোনা সংকটে বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। বিবিএস'র হিসেবে এরই মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ।

বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে জনশক্তিকে আরও দক্ষ করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তরুণ যুব বেকারদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে তাদের কাজে লাগাতে হবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সিংহভাগ অঞ্চলের মাটিই উর্বর ও আবাদযোগ্য। তাই আমাদের কৃষিক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা আমাদের জন্য সহজ। কৃষি, খাদ্য এবং জন্মনিরোধে বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কৃষিকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি বলা হচ্ছে। দেশে কম বেশি ৮০০ থেকে ৯০০ কোম্পানি নিজস্ব উদ্যোগে সফটওয়্যার তৈরি করে রফতানি করছে। পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল ও সুযোগ-সুবিধা

পেলে সফটওয়্যার রফতানিও তৈরি পোশাকের মতো বেকারত্ব দূর করে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়। এ মুহূর্তে বাংলাদেশে ১৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সের মানুষ বেশি, যারা কর্মক্ষম। দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, জনশক্তি রফতানির প্রক্রিয়া সহজিকরণসহ সহজশর্তে ঋণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। যার জন্য দরকার সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে রয়েছে উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবার পরিকল্পনা একটি প্রযুক্তি, যেখানে উন্নয়নের পূর্বশর্তকে বিবেচনায় রেখে সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে এটি মানবতার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কায়রো সম্মেলনে (১৯৯৪) জনসংখ্যা ও স্থিতিযোগ্য উন্নয়নের অব্যাহত ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচিতে উন্নয়নধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে- যার মধ্যে আছে স্বাস্থ্য, চাকুরি এবং জনগণের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান।

বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেন। সে আলোকে ১৯৭৬ সালে প্রণীত হয় জাতীয় জনসংখ্যানীতি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের বাণীতে বলেন, "ভবিষ্যতের তরুণ সম্প্রদায়কে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা তরুণ সম্প্রদায়ের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের পরিচর্যা নিশ্চিত করতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। প্রতি মাসে ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছে"। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জনসংখ্যা সমস্যা থেকে উত্তরণে আমরা সচেতন।

পরিবার পরিকল্পনা খাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সেবাসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন তথা গ্রাম পর্যায়ে সর্বত্র এখন ডিজিটাল সেবার আওতাধীন। পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে

ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ এবং সকল উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য একটি মৌলিক ও মূখ্য এজেন্ডা।

কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। আর সেই জন্যই আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে জনসংখ্যা জনসম্পদে রূপান্তর করা সহজ হবে। আর তাই টেকসই উন্নয়নে পরিকল্পিত ও দক্ষ জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি-বেসরকারিভাবে আমরা যদি উন্নয়নের স্বার্থে সুপরিকল্পিতভাবে সুসংবদ্ধ, সুসংকল্পবদ্ধ, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও কঠোর পরিশ্রমী হতে পারি তবে জনশক্তি দিয়েই আমাদের সাফল্য নিশ্চিত।

লেখক : সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পরিকল্পিত ঢাকার জন্য ড্যাপ

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

নগর এলাকা একটি দশেরে অর্থনৈতকি চালিকাশক্তি। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি গতিশীল হওয়ার পাশাপাশি দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। কিন্তু পরিকল্পিত নগরায়ণ না হলে সেটি নাগরিক জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। বাংলাদেশের নগরায়ণের যে চিত্র তার সিংহভাগই ঢাকা কেন্দ্রিক। স্বাধীনতার পরে দেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকার জনসংখ্যা খুবই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রসপেক্ট ২০১৪ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা ২৭.৩৭ মিলিয়ন হবে বলে ভবিষদ বাণী করা হয়েছে এবং সে সময় ঢাকা হবে পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম মেগাসিটি। ঢাকার এই অত্যধিক জনসংখ্যার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যান্য সকল অঞ্চলের তুলনায় ঢাকায় অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য বহু আধুনিক সুযোগ-সুবিধার পর্যাপ্ততা। অর্থনৈতিক সুবিধা এবং উন্নত জীবনের আশায় গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষ শহরমুখী হবেই, এটাই বাস্তবতা।

বিপুল জনসংখার এ মেগাসিটির জন্য মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী যে ধরনের পরিকল্পিত উন্নয়ন হবার প্রয়োজন ছিল উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সম্পদের সীমাবদ্ধতাসহ নানাবিধ কারণে সে ধরনের উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয় নাই। সে সময়ের ডিআইটি তথা বর্তমানের রাজউক কর্তৃক ১৯৫৯ সালে প্রণীত মাস্টার প্ল্যান যে জনবসতির ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সুবিধাদি দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছিল একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী ও তার বিপুল জনবসতির জন্য তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। পরবর্তীতে এ বাস্তবতার আলোকে ১৯৯৫ সালে ঢাকা মহানগরীর জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট মহাপরিকল্পনা Dhaka Metropolitan Development Plan, DMDP (1995-2015) প্রণয়ন করা হয়, যার মধ্যে প্রথম দু'টি স্তর যথাক্রমে Dhaka Structure Plan(1995-2015) I Dhaka Urban Area Plan(1995-2005) ১৯৯৭ সালে সরকার র্কতৃক অনুমোদিত ও গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় স্তর র্অথাৎ Dhaka Detailed Area Plan, DAP(2010-2015) ২২ জুন, ২০১০ সালে সরকাররে অনুমোদনক্রমে গেজেট

আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত প্রস্তাবনার আলোকেই বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর সকল উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে Dhaka Metropolitan Development Plan (DMDP) এর অধীন ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনার (Dhaka Structure Plan 1995-2015) মেয়াদে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত থাকায় এবং উক্ত পরিকল্পনাকে যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করণের উদ্দেশে খসড়া 'ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৬-২০৩৫' প্রণীত হয়, যা একটি ঊর্ধ্বতন নীতিনির্ধারণী পরিকল্পনা (Higher level policy plan) এবং উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার মেয়াদ ২০৩৫ সাল পর্যন্ত। বিদ্যমান Dhaka Detailed Area Plan, DAP (2010-2015) এর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা ও নীতি প্রস্তাবনা পর্যালোচনা, খসড়া ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৬-২০৩৫ এর নীতিমালা এবং সরকাররে অন্যান্য পরিকল্পনা, আইন ও বিধিবিধান পর্যালোচনার আলোকেই খসড়া ঢাকা ডিটেইল্ড এরয়িা প্ল্যান (ড্যাপ, ২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় শহররে সংজ্ঞা এবং এর মূল পরিচয় মানুষের বসতি ও আশ্রয়। আশ্রয় অর্থ যেখানে মানুষ বাস করে, কাজ করে এবং জীবনের সুযোগ ও সম্ভাবনাগুলোকে উপভোগ করে। শহররে অন্য ভূমকিা আর পরিচয়গুলোকে এখানে কোনোভাবইে অস্বীকার করা হয়নি, যেমন এর অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক বা প্রযোজ্য অন্য যে কোনো ভূমকিা। শুধু অগ্রাধিকারে একটু পরিবর্তন আনা হয়েছে। শহররে প্রধান পরিচয় যখন মানুষরে আশ্রয়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তার প্রধান কাজ নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চত করা। বাকি সবকিছু, যেমন অর্থনীতি, প্রশাসন, অবকাঠামো সবকিছুর লক্ষ্য এই মূলকাজের সর্বোচ্চ সহায়ক ভূকিকা পালন করা।

ন্যায়সঙ্গত বা অর্ন্তভুক্তমিূলক (Inclusive) পরিকল্পনা ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সর্ম্পক পুনঃস্থাপন এই দুইটি মূলনীতিকে সামনে রেখেই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছ। পরিকল্পনার নীতিগুলোর প্রধান লক্ষ্য মানুষরে জীবন ও জীবনমানের উন্নয়ন। তাই নীতিগত সিদ্ধান্ত, অবকাঠামোর পরিকল্পনা, প্রস্তাব সবই এই লক্ষ্যকে অর্জনের জন্যই প্রণীত হয়েছে। একইসঙ্গে শহরের উন্নয়নের সূচকগুলোর (Development indicator) লক্ষ্য হলো মানুষরে জীবনে ও জীবনমানে আসলে কী গুণগত উন্নতি হলো তার পরিমাপ করা। এ পথ ধরইে সম্ভব নাগরিকের জন্য এক মানবকি শহররে পরিকল্পনা তৈরি করা। তার প্রেক্ষিতে এই মহাপরিকল্পনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে

যেমনঃ নিয়ন্ত্রিত মিশ্র ভূমি ব্যবহার (Guided Mixed Use) উৎসাহকরণ , জনঘনত্ব বিন্যাস পরিকল্পনা (Density Zoning), জলাশয় চিহ্নিতকরণ এবং নৌপথের সমন্বয়ে ব্লু-নেটওয়ার্ক (Blue Network) প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামোর সার্বিক রূপান্তরে ‘নগর জীবনরখো’র (Urban Lifeline) প্রতিষ্ঠা, নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আবাসনের বিধান পুনর্নির্ধারণ, ব্লকভিত্তিক আবাসন পদ্ধতি, সড়ক ও গনপরিবহণ (Public Transport) ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি। ভবিষ্যতের এ সকল উন্নয়নে পর্যাপ্ত সবুজের সমারোহ, পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা সর্বোপরি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রেখে এবং যানজট নিরসনের আধুনিক ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা থাকবে। এসকল উদ্যোগ ও প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পরিকল্পিত নগরায়ণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

যে কোনো মহানগরীর পরিকল্পিত নগরায়ণ নিশ্চিত করবার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে একটি বাস্তবসম্মত, গ্রহণযোগ্য ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যে কোনো, যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নরে প্রথম ধাপই হলো বিদ্যমান সকল পরিকল্পনা ও বিধিবিধান পর্যালোচনা। তার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক সকল পরিকল্পনা যেমন, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ২০১০, ডিএমডিপি কৌশলগত পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০১৫), ডিএমডিপি আরবান এরয়িা প্ল্যান (১৯৯৫-২০০৫), ঢাকা কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫), ডিসিটিএ কর্তৃক প্রণীত কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা ২০০৬ এবং ২০১৫-২০৩৫, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ড্রেনেজ এবং সুয়্যারেজ মাস্টার প্ল্যান, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটিকর্পোরেশন অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান, Flood Action Plan প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, খসড়া আরবান সেক্টর পলিসি ২০১১ সহ আরও অন্যান্য পরিকল্পনা, আইন এবং নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনাটি প্রণয়নে মোট পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে প্রারম্ভিক ধাপ (Inception Phase), জরিপকার্য (Survey Phase), অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ (Interim Phase), খসড়া পরিকল্পনা ধাপ (Draft Plan Phase), ও চূড়ান্ত পরিকল্পনা ধাপ (Final Plan Phase) - যা র্বতমানে চলমান। প্রতিটি ধাপে খসড়া প্রতিবেদন তৈরির পর তা সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনরে সমন্বয়ে গঠতি ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি ব্যবস্থাপনা কমিটির (Technical Management Committee/TMC) সামনে

উপস্থাপন ও তাদরে মতামতের ভিত্তিতে পরামর্শক্রমের পর চূড়ান্ত করা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনাটি কমিটিতে উপস্থাপন ও সদস্যদের লিখিত মতামতের ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়।

এছাড়াও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণরে লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে ০৩ জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত জনসাধারণরে মতামত, আপত্তি ও পরামর্শের জন্যে খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার উপর গণশুনানি অনুষ্ঠতি হয়। খসড়া বিশদ পরিকল্পনার উপর গণশুনানি থেকে প্রাপ্ত মতামত, বিভিন্ন পেশাজীবী ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে মতবনিমিয় সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনটি হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।

অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শী নগরায়ণের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর কৌশল নির্ধারণের পাশাপাশি সকলকে সচেতন হতে হবে। নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরায়ণের সাথে সাথে পরিকল্পিত নগরী নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায় নিরাপদ ও বাসযোগ্য ঢাকা শহর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি সংস্থা ইতোমধ্যেই নানাবিধ উদ্যোগ/কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে, সরকারের এই ধারাবাহিকতার সুফল দেশবাসী পেতে শুরু করেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধ করে সকল সমস্যা থেকে নগরবাসীকে মুক্ত করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই যানজট, জলাবদ্ধতা, নদী দূষণ, আবাসন সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা দূরীকরণসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনে এবং নাগরিক সুযোগসুবিধার প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। আর এই উন্নয়নের সুফল বহুলাংশে উপভোগ করছে ঢাকাবাসী।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানপূর্বক আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলা সম্ভব। তাই ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

শ্যাডো প্যানডেমিক

মুনিয়া খান

শ্যাডো প্যানডামিক বা ছায়া মহামারি হলো করোনাকালে নারীর প্রতি সংহিতা। বিশ্বব্যাপী উন্নত -অনুন্নত সব দেশের বেশিরভাগ নারীরাই পরিবারে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে, সেখানে নারীর অবদান সর্বাধিক। বর্তমানে পোশাকশিল্পসহ অন্যান্য উৎপাদন খাত ও সেবা খাতেও নারীর অবদান অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত না। বরং সামাজিক জীবনে নারী এখনো চরমভাবে অবহেলিত, উপেক্ষিত ও নির্যাতিত। অতীতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা কম থাকায় নারী নির্যাতন যে একটা অপরাধ এটা মানুষ জানত না। এখন সময় পাল্টাচ্ছে। মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে, সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে সব জায়গায়। তারপরও নারী নির্যাতন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমেনি। বরং নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে চলছে। নিত্যনতুন কৌশলে ও পন্থায় নারীর প্রতি পাশবিকতা এবং নির্যতনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলছে।

আমাদের জানা দরকার সহিংসতা কী? সহিংসতা সাধারণত কতরকম হতে পারে। সহিংসতা বলতে আমরা বুঝি অত্যাচার,নির্যাতন, নিপীড়ন, অতিরিক্ত শাসন, যৌন হয়রানি ইত্যাদি। আমাদের সমাজে অনেক রকম সহিংসতা হয়। এর মধ্যে শারীরিক,মানসিক, যৌন, পারিবারিক, আর্থিক, সাইবার, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার অন্যতম। শারীরিক সহিংসতা বলতে মারামারি বা অন্য কোনো শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করা বা আঘাতের চেষ্টা করা, যার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তির আঘাত পাওয়া, ক্ষতি হওয়া, জীবনের ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে। মানসিক সহিংসতা হলো অপমান, গালিগালাজ, হুমকি বা এমন কোনো কথা যা শুনে কেউ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত যে কোনো শারীরিক স্পর্শ, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, মৌখিক হয়রানি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি হলো যৌন

সহিংসতা। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যৌন নির্যাতনের শিকার নারীদের মধ্যে শতকরা ২৯ শতাংশ নারী যৌন নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেন। এরমধ্যে শুধু শতকরা একভাগ নারী আইনের আশ্রয় নেন। পরিবারের সদস্য বা সদস্য দ্বারা যে কোনো শারীরিক মানসিক অনাচারকে পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশের বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় শতকরা ৮০ শতাংশের বেশি নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়। আর্থিক সহিংসতা হলো, কোনো ব্যক্তিকে তার আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, সাইবার সহিংসতা হলো ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারও শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা বা করার চেষ্টা করা। বাল্যবিবাহ এমন বিবাহ যেখানে পাত্র - পাত্রী দুজনই বা যে কোনো একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক (পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছরের কম বয়সি এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম হলে)। কম বয়সি মেয়েরা বিশেষ করে স্বামী ও শশুরবাড়ির পক্ষ থেকে মানসিক, শারীরিক সহিংসতা ও মৌখিক হয়রানির শিকার হওয়ায় ঝুঁকির মধ্যে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় শতকরা ৮৯ ভাগ বাল্যবিবাহের কারণ ইভটিজিং এবং শতকরা ৮২ ক্ষেত্রেই অভিভাবক ভীত হয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে দ্রুত বিয়ে দেয় বা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। মানব পাচার হলো কোনো ব্যক্তিকে অনিচ্ছাকৃত যৌনকর্ম বা নিপীড়ন, শ্রম শোষণ বা অন্য যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়া। মানব পাচার বাংলাদেশের ভেতরে বা বাইরে যেকোন জায়গায় হতে পারে।

প্রাচীন আমলের বিভিন্ন কুসংস্কার ও লোকলজ্জার ভয় কাটিয়ে নারী এখন পুরুষের পাশাপাশি পথ চলতে শুরু করেছে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখায়। তাপরও দেখা যায় পথেঘাটে, বাসে-ট্রেনে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমনকি কর্মস্থলে ও নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। যৌতুক,বাল্যবিবাহ,বহুবিবাহ, ধর্ষণ, হত্যা এগুলো পত্রিকার নিত্যদিনের খবর। করোনাকালে নারীর প্রতি সহিংসতা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা অতিমারিতে মানুষের আয় হ্রাস পেয়েছে, অনেকে কর্মসংস্থান হারিয়েছে,হঠাৎ নেমে আসা অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, খুবই সীমিত চলাচল, ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ,পুরুষের অতিরিক্ত ঘরে অবস্থান সর্বোপরি একটি অনিশ্চয়তা নারীর প্রতি সহিংসতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

২০২১ সালে করেনাকালে ১৩ টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগাল এইড উপপরিষদের প্রতিবেদনে নারী নির্যাতনের একটি ধারণা পাওয়া যায়। ২০২১ সালে ৩ হাজার ৭০৩ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১ হাজার ২৩৫ জন,যেখানে ৬২৯ জন কন্যশিশু। ২০২০ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল ৩ হাজার ৪৪০ টি। ২০২১ সালে যৌতুকের কারণে নির্যাতিত হয়েছে ১৩৮ জন, ৪৫ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে। এ সময়ে বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটে ৩২৭ টি। এর মধ্যে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে ৪৩ টি। ৬৩ জন সাইবার অপরাধের শিকার হয়েছেন। অপহরণের শিকার হয়েছেন ১৮০ জন। রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে ৪২৭ জনের। এ চিত্র থেকে নির্যাতনের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

বিশ্বেব্যাপী প্রতি তিন জনের একজন নারী পরিবারে শারীরিক বা মানসিক সহিংসতার শিকার হন। শতকরা ৩৫ শতাংশ নারী জীবনে কোনো না কোনো সময়ে তার নিকটতম সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। বিশ্বে এসময়ে নারী নির্যাতন শতকরা ২০ ভাগ বেড়েছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। আমদের দেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর কারণে সমাজে নারীরা অধস্তন অবস্থায় আছে। দায়িত্বের জায়গা সবসময় নারীদের ওপর দেওয়া হলেও অধিকারের জায়গায় বৈষম্য করা হয় অর্থাৎ নারীর অধিকারকে অধিকাংশ জায়গায় স্বীকৃত না। আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ নারীর প্রতি সহিংসতার সবচেয়ে বড়ো জায়গা। সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারপরও এটা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এর বড়ো কারণ নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সচেতন করা যাচ্ছে না। বাল্যবিবাহ সমাজের জন্য কেন ক্ষতির কারণ তা তারা জানে কিন্তু মানে না। করোনাকালে ২০২১ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার একটি মাদরাসার ২৬০ জন ছাত্রীর বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। চিনতে হবে সহিংসতা, জানতে হবে অধিকার এবং প্রতিকারের জন্য জানাতে হবে সঠিক মানুষ বা সংস্থাকে। আমাদের সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। নারী বা শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটলে জরুরি সহায়তার জন্য হেল্প লাইন ১০৯ অথবা ৯৯৯ এ ফোন করে জানতে

হবে। এছাড়াও ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে শিশু সহায়তা কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ আছে। ১৬৪৩০ নম্বরে ফোন করে বিনা খরচায় সরকারি আইন সহায়তা নেওয়া যাবে। পুলিশের নারী বিষয়ক সাইবার সহায়তা নম্বর ০১৩২০০০০৮৮৮। সাইবার সহিংসতার শিকার হলে cybersupport.women@police.gov.bd তে ই-মেইল করে সহায়তা নেওয়ার সুযোগ আছে। কেউ ধর্ষণের শিকার হলে ভুক্তভোগী এবং তার কাছের মানুষগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। লোকলজ্জার ভয়সহ নানারকম চাপে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে, বুঝতে পারে না কি করা উচিত আর কি করা উচিত না। অধিকাংশ সময়ই ঘটনার আকর্ষিকতায় তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে দ্রুত হেল্পলাইন ১০৯ অথবা ৯৯৯ এ ফোন করে জানতে হবে এবং তাদের সহায়তা নিতে হবে। দ্রুত মামলা করতে হবে। থানা মামলা নিতে না চাইলে হেল্পলাইনে ফোন করে সহায়তা নিতে হবে। আদালতের বাইরে কোনো মিমাংসার চেষ্টা বা মিমাংসা করা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। আলামত সংগ্রহ করতে হবে। মনে রাখতে হবে কাপড় ও চুল অপরাধী শনাক্তকরণের শক্তিশালী প্রমাণ। এগুলো নষ্ট করা যাবে না। যিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর আগে যেন গোসল না করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। ভিকটিমকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। যৌন সহিংসতা যে কোনো শারীরিক আঘাতের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা শুধু আইনের কঠোর প্রয়োগ বা সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ দিয়ে বন্ধ করা যাবে না। তবে আইনের কঠোর প্রয়োগ অবশ্যই থাকতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি নারীকে মানুষ ভাবার শিক্ষা এবং নারীর অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সহিংসতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। তা-না হলে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অর্জন অর্থহীন হয়ে যাবে।

লেখক : উন্নয়নকর্মী

ডিজিটাল সংযুক্তি ডিজিটাল বাংলাদেশঃ বিনির্মাণের অন্যতম ভিত্তি

ম. শেফায়েত হোসেন

ডিজিটাল সংযুক্তি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম ভিত্তি। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির গৌরবোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা গত ১৩ বছরে বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে ইংল্যান্ড, ভারত, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের দেশে দেশে উদ্ভাসিত ও অনুকরণীয় হচ্ছে। অতীতের সকল পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ আজ নেতৃত্বের যে সক্ষমতা অর্জন করেছে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ- এর দিকনির্দেশনায় মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার-এর সময়োচিত উদ্যোগের ফলে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির অভাবনীয় এই সফলতা অর্জিত হয়েছে- এ কথা স্বীকার করতেই হবে ।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্বভার গ্রহণকালে বাংলাদেশের টেলিডেনসিটি ছিল ৩০ শতাংশ। বর্তমানে এই হার প্রায় শতভাগে উন্নীত হয়েছে। ২০০৮ সালে যেখানে মোবাইল গ্রাহক ছিল ০৪ কোটি ৪৬ লাখ, বর্তমানে তা ১৮ কোটি ২০ লাখ অতিক্রম করেছে। এই সময়ে দেশে ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ, বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৯১ লাখ। ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার যেখানে ছিল ৭ দশমিক ৫ জিবিপিএস বর্তমানে তা ২৭শত জিবিপিএস অতিক্রম করেছে। ২০০৮ সালে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত লাইসেন্স ছিল ৬০৮টি, বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এ সংখ্যা ৩,৩৯৬টি। ২০০৮ সালে এক এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ চার্জ ছিলো ২৭০০০/ টাকা যা ২০১৮ সালের পর সর্বনিম্ন ২৮০ টাকা নির্ধারিত হয়। এক দেশ এক রেট কর্মসূচির আওতায় প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেটের মাসিক তা ১০০ টাকায় নির্ধারিত হয়। ২০০৮ সালে ২-জি নেটওয়ার্ক যুগ থেকে বর্তমানে বাংলাদেশ ফাইভ-জি যুগে প্রবেশ করেছে।

২০১৮ সালে বিশ্ব যখন ফাইভ-জি প্রযুক্তি নিয়ে ভাবছে বাংলাদেশ সেই বছরই এই প্রযুক্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। ২০১৮ সালের ২৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ দেশে ফাইভ-জির সফল এই পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এর আগে ২০১৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ফোর-জি বেতার তরঙ্গ নিলাম এবং একই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি মোবাইল অপারেটরদের ফোর-জি লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ফোর-জি সেবা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ ফাইভ-জি যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। ফাইভ-জি প্রযুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগসৃষ্টি করে দেওয়া এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো। ফাইভ-জি প্রযুক্তি হচ্ছে একটি শিল্প পণ্য। আগামী দিনের প্রযুক্তি এআই, রোবটিক্স, আইওটি, বিগডাটা কিংবা ব্লকচেইনের যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিংবা মৎস্য ও কৃষির জন্য ফাইভ জি অপরিহার্য। এমনকি শিল্পকারখানায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও ফাইভ-জি ছাড়া বিনিয়োগ করবে না। এজন্য প্রাথমিকভাবে দেশের পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ফাইভ-জি সংযোগ দেওয়ার জন্য বিটিসিএল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

১২ মে ২০১৮ তারিখ শনিবার রাত ২টা ১৪ মিনিটে বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-স্যাটেলাইট - ১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এরই মধ্যদিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশ অভিসিক্ত হলো ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের মর্যাদায়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সুবিধার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১ এর পর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী ২০২৩ সালের মধ্যে এটির কার্যক্রম চালু করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। দেশের প্রথম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্যাটেলাইট নির্ভর সম্প্রচার ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করে। অন্যান্য প্রকৃতি ও ধরনের স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২ উৎক্ষেপণ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তির সক্ষমতা তৈরি সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২ জাতীয় জীবনের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হতে যাচ্ছে।

কুয়াকাটায় দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের পর দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বহুল প্রত্যাশিত তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সি-মি-উই (SE-ME-WE)-৬ কনসোর্টিয়ামের সাথে কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইনটেনেন্স এগ্রিমেন্ট এবং কনসোর্টিয়ামের সরবরাহকারীগণের সাথে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার আনুষ্ঠানিক এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১৫০ টাকায় বিটিসিএল ল্যান্ড ফোনে যত খুশি তত কথা বলা চালু লাইনরেন্ট মওকুফ এবং ৫২ পয়সা মিনিটে অন্য অপারেটরে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৯ সালের৭ আগস্ট এই সেবাটি চালু করা হয়। বিনামূল্যে দেশের ৫৮৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্রিওয়াইফাই জোন স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় দ্বীপ, চর ও হাওর অঞ্চলসহ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি পৌঁছে দিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কাজ করার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থে ইতোমধ্যে দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৬শত ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ডিজিটাল শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই মধ্য দিয়ে দেশে ডিজিটাল শিক্ষা বিস্তারের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে চলেছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, হাওর, পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম পাহাড় উপকূলীয় ও দ্বীপ এলাকায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হচ্ছে।

২০২১ সালে আইএসপি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এরফলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সুযোগসৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেটের একদেশ একরেট নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ৬ জুন ২০২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে একদেশ একরেট চালু করা হয়। কোভিডকালে মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত শতভাগ টাওয়ার ফোরজি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। দেশ ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও রপ্তানি শুরু হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ার স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় বিপুল ব্যয়ের পাশাপাশি টাওয়ারের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা, ভূমি ও বিদ্যুতের সংকট ছাড়াও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে গত ২০১৮

সালের ১ নভেম্বর ৪টি কোম্পানিকে এ লাইসেন্স দেওয়া হয়। টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্সের ফলে মোবাইল টাওয়ার লাইসেন্স রোল আউটের উপর ভিত্তি করে মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো কোনো নতুন টাওয়ার স্থাপন করতে পারবে না। এছাড়া এক অপারেটর আরেক অপারেটরের কাছে আর টাওয়ার ভাড়া দিতে পারবে না। কিন্তু লাইসেন্স পাওয়া টাওয়ার কোম্পানির কাছে তাদের টাওয়ার বিক্রি করতে পারবে।

মোবাইল ফোন ও নেটওয়ার্ক এখন মানুষের জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রযুক্তিবান্ধব বিনিয়োগ নীতির ফলে দেশে বর্তমানে মোবাইল ফোনের চাহিদার শতকরা ৬৩ ভাগই বাংলাদেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। স্যামসাং ও শাওমিসহ দেশে ১৪টি মোবাইল কোম্পানি অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে মেড-ইন বাংলাদেশ ব্যান্ডের ফাইভ-জি মোবাইল রপ্তানি করছে। মোবাইল ফোন এবং এর বিভিন্ন অ্যাপস-এর ব্যবহার, উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ওভার দ্যা টপ (ওটিটি) অ্যাপস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্যাটেলাইটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি দেশের জনগণের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। ডিজিটাইজেশনের প্রসারের পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

সামাজিক যোগাযোগ নির্ভর কিছু গুজব রটানো অথবা সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিষয়টি একটি দিক মাত্র। লেনদেন, ব্যক্তিগত তথ্য থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু যখন ডিজিটাল তখন আমার তথ্যের নিরাপত্তা যদি দিতে না পারি, তাহলে ডিজিটাইজেশন তো উল্টো আমার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই অবস্থা উত্তরণে 'ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ২০১৮ সালের আইনের আওতায় যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, সেগুলো সরকার নিচ্ছে। স্যোসাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করেছি। সরকার ইচ্ছে করলে এখন ফেসবুকের ছবি বন্ধ করতে পারবে, ফেসবুকের ভিডিও বন্ধ করা সম্ভব। ইউটিউবের লাইভ ফেসবুকের লাইভ বন্ধ করাও সম্ভব।

টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত হাওর, দ্বীপ ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপনে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (এসওএফ) ১৫২৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ৫০৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয়ে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন,

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনে ৪৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা, টেলিটকের মাধ্যমে ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে ব্রডব্র্যাণ্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, বিটিসিএল এর মাধ্যমে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওর-বাওর ও প্রত্যন্ত ব্রডব্যান্ডড ওয়াই ফাই নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলছে।

২০৪১ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের বিশটি উন্নত দেশের কাতারে সামিল হবে। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের এ অভিযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিরন্তর এ পথ চলা আরও গতিময় হোক, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

লেখক : জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

প্লাস্টিকদূষণ: লাগাম টানার এক্ষণই সময়

মোছাঃ সাবিহা আক্তার লাকী

বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের স্বাস্থ্যকর অস্তিত্বের হুমকির আরেক নাম প্লাস্টিক দূষণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্যের প্রচলন মানব জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কিন্তু এই প্লাস্টিকপণ্যটি কখনও দ্রবীভূত হয়না বলে এর দূষণ জন্ম দিয়েছে গভীর উদ্বেগের। করোনাকালে অনলাইন শপিং ও অনলাইন ফুড ডেলিভারিতে ব্যবহৃত নানারকমের প্লাস্টিকের মোড়ক, ওয়ানটাইম চামচ, গ্লাস ইত্যাদি প্লাস্টিকদূষণের গতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আর এ দূষণ পরিবেশ, জীববৈচিত্র, অর্থনীতি ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য এক বিরাট হুমকি। সুন্দর এই ধরণীকে বাসযোগ্য করে তুলতে এক্ষণি সময় প্লাস্টিকদূষণের লাগাম টানার।

আমাদের প্রত্যাহিক জীবনে আমরা যা যা ব্যবহার করি, তার অধিকাংশই প্লাস্টিকের তৈরি। ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, গৃহস্থলির আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য বিপণন থেকে শুরু করে সর্বত্রই প্লাস্টিকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক ধাতব, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে তৈরি যে কোনো দ্রব্যের চেয়ে প্লাস্টিক সস্তা, ব্যবহারবান্ধব এবং দীর্ঘস্থায়ী। ফলে বিদ্যুৎগতিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং অবচেতন মনেই আমরা জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সবকিছুকে প্লাস্টিকদূষণে দূষিত করে ফেলেছি। প্লাস্টিকদূষণ আজ মানুষসহ সব জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে।

পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ কোটি টন প্লাস্টিকবর্জ্য জমা হয়েছে। প্রতিবছর উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ৩৮১ কোটি টন প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ হচ্ছে একবার ব্যবহারযোগ্য (সিঙ্গেল ইউজ)। শুধু শতকরা ৯ ভাগ পুর্ণব্যবহার করা হয়।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে মহাসাগরে প্লাস্টিকের পরিমাণ প্রায় ৭৫ থেকে ১৯৯ মিলিয়ন টন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছাড়া বাস্তুতন্ত্রের প্লাস্টিকবর্জ্য নির্গমণ ২০৪০ সালের মধ্যে প্রায় তিনগুণ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মূল্যায়ন অনুসারে ২০৩০

সালের মধ্যে এটি দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। এভাবে জমতে জমতে বড়ো বড়ো মহাসাগরে প্লাস্টিক বর্জ্য জমাকৃত এলাকা (প্যাচ) তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রশান্ত মহাসাগরে বর্তমানে প্লাস্টিকবর্জ্যের প্যাচের আয়তন প্রায় ১৬ লাখ বর্গকিলোমিটার। অনুরূপভাবে, প্লাস্টিকবর্জ্য জমাকৃত এলাকা তৈরি হচ্ছে অন্যান্য সাগর ও মহাসাগরেও।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্ট। মানুষের যাতায়াত নগন্য বললেই চলে। কিন্তু এই দুর্গম প্রকৃতিও রক্ষা পেলনা দূষণের হাত থেকে। এভারেস্টের শিখর থেকে মাত্র ৪০০ মিটার নিচেই এবার খোঁজ মিলল মাইক্রোপ্লাস্টিকের। প্লাইমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন গবেষক ইমোজেন ন্যাপারের এমন গবেষণার তথ্য প্রকাশ করেছে বিজ্ঞান পত্রিকা 'ওয়ান আর্থ'।

মানুষের শরীরে প্রথমবারের মতো মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে ৮০ শতাংশ মানুষের রক্তেই প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা খুঁজে পেয়েছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মলে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে ১০ গুণ বেশি। অন্যদিকে প্লাস্টিকের পাত্রে যেসব শিশুদের খাবার খাওয়ানো হয় তাদের শরীরে দিনে লাখ লাখ মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা প্রবেশ করে। নতুন একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এ তথ্য। এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে গবেষণার এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ মার্চ ২০২২ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে এ গবেষণার বিষয়ে জানিয়েছে।

দ্য গার্ডিয়ান সূত্রে আরও জানা যায়, সাম্প্রতিক আর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মাইক্রোপ্লাস্টিক লোহিত কণিকার বাইরে ঝিল্লিতে আটকে যেতে পারে। ফলে অক্সিজেন পরিবহণের তাদের ক্ষমতা কমে যাওয়ার ঝুকি থাকে। গর্ভবতী নারীদের প্লাসেন্টাতেও কণা পাওয়া গেছে। এমনকি গর্ভবতী ইঁদুরের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা যায়, কণাগুলো দ্রুত ফুসফুসের মাধ্যমে হৃৎপিন্ড, মস্তিস্ক ও ভ্রুণের অন্যান্য অঙ্গে প্রবেশ করে।

২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাংক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের প্লাস্টিক দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে। বিশ্বব্যাংকের এ পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশের শহর এলাকায় ১৫ বছরে মাথাপিছু তিনগুণ বেড়েছে প্লাস্টিকের ব্যবহার। ২০০৫ সালে মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিল ৩ কেজি। কিন্তু ২০২০ সালে সে পরিমাণ ৩ গুণ বেড়ে ৯ কেজি হয়েছে। ঢাকা শহরে এই পরিমাণ ২২ কেজি ৫০০ গ্রাম, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি। ২০০৫ সালে ঢাকায় মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিল ৯ কেজি ২০০ গ্রাম।

পরিসংখ্যানটি আরও বলছে, ঢাকায় প্রতিদিন ৬৪৬ টন প্লাস্টিকবর্জ্য তৈরি হয়। এর ৩১০ দশমিক ৭ টন ময়লা ভাগাড়ে, ৭৭ দশমিক ৫ টন খাল ও নদীতে, ১৭ দশমিক ৩ টন নর্দমায় ফেলা হয় এবং ২৪০ দশমিক ৫ টন রিসাইকেল করা হয়।

'প্রোলিফারেশন অব মাইক্রোপ্লাস্টিক ইন কমার্শিয়াল সি সল্টস ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড লংগেস সি বিচ অব বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণায় দেশের লবণে প্লাস্টিকের উদ্বেগজনক উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এ গবেষণায় দেখা যায় এ লবণের প্রতি কেজিতে প্রায় ২ হাজার ৬৭৬ টি মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে। সেখানে বলা হয়, দেশের মানুষ যে হারে লবণ গ্রহণ করে তাতে প্রতিবছর একজন মানুষ গড়ে প্রায় ১৩ হাজার ৮৮টি মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করে।

মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি এখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। লবণ থেকে শুরু করে মায়ের পেটেও এর উপস্থিতি মিলছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সমুদ্রের পানিতে পাঁচ ট্রিলিয়নের বেশি প্লাস্টিক ভেসে থাকে। ১৪ মিলিয়ন টনের বেশি প্লাস্টিক প্রতিবছর সমুদ্রে জমা হচ্ছে। প্লাস্টিক দূষণ সামুদ্রিক প্রাণির জন্য একক সর্বাধিক হুমকির মতো। সামদ্রিক কচ্ছপের মৃত্যু প্লাস্টিক দূষণের কারণে ঘটয়ে। সামদ্রিক তিমির পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। এছাড়া সামদ্রিক ছোটমাছের পাকস্থলীতেও প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। তাই প্লাস্টিক দূষণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির জন্য হুমকি স্বরুপ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, প্লাস্টিক মাটিতে মিশতে সময় লাগে প্রায় ৪০০ বছর। ফলে এতে একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে এটি পানির সঙ্গে মিশে পানিকে করছে দূষিত। এর মাধ্যমে এসব প্লাস্টিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের সাথে ধীরে ধীরে মিশছে মাইক্রোপ্লাস্টিক, যার প্রভাব পড়ছে গোটা প্রাণিজগতে। মাইক্রো প্লাস্টিকের কারণে ক্যান্সার, হরমোনের তারতম্য, প্রজনন প্রক্রিয়ায় বাধাসহ মারাত্মক সব ক্ষতি হচ্ছে। প্লাস্টিক মানুষের পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে প্রবেশ করে যকৃৎ, ফুসফুসসহ অন্যান্য অঙ্গে বৈকল্য তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি হজমে প্রতিবন্ধকতা, নারী ও পুরুষের বন্ধ্যত্বও তৈরি করতে পারে। কারণ প্লাস্টিক মানবদেহে হরমোনের ভারসাম্যকে বাধাগ্রস্ত করে।

প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব শুধু সামদ্রিক মাছের ওপর নয়, সামদ্রিক পাখির ওপরও রয়েছে। পাখিরা যখন প্লাস্টিকপদার্থ গ্রহণ করে, তখন তাদের পেটেও বিষাক্ত রাসায়নিক পলিক্লোরিনেটেড বায়োফেনল নির্গত হয়। এজন্য তাদের দেহের টিস্যু ধ্বংস হয়, তাদের দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ধীরে ধীরে পাখির

মৃত্যু হয়। শুধু উদ্ভিদ বা প্রাণি নয়, মানুষ প্লাস্টিক দূষণের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। থাইরয়েড হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য প্লাস্টিক দূষণ পরোক্ষভাবে দায়ী। সাধারণত প্লাস্টিক পদার্থে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক রঞ্জক মেশানো হয়। এসব রঞ্জক কারসিনজেন হিসেবে কাজ করে ও এন্ডোক্রিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বর্তমান বিশ্বে বিপুল পরিমাণে প্লাস্টিকসামগ্রী ব্যাবহার করা হচ্ছে। যা পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত জমছে। তাই বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিককে রিসাইকেল করে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায় কি না এ বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। সম্প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ৩০ শতাংশ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে রিসাইকেল করা প্লাস্টিকের অন্যতম ব্যবহারে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিকের দূষণ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে রাস্তা তৈরির কাজে প্লাস্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার বি কে রোডটি পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে প্লাস্টিক দিয়ে। ভারতের পর পাকিস্থানও প্লাস্টিকের রাস্তা বানিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে। দেশটির রাজধানী ইসলামাবাদের আতাতুর্ক অ্যাভিনিউয়ের রাস্তায় প্লাস্টিকের কার্পেটিং করা হয়েছে। রাস্তাটি তৈরি করতে তারা ব্যবহার করেছে প্রায় ১০ টন ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক যা মূলত সারাদেশ থেকে সংগ্রহ করা। ধীরে ধীরে পাকিস্তানের অন্যান্য সড়কগুলোও প্লাস্টিক দিয়ে রি-কার্পেটিং করা হবে বলে জানা যায়। বিষেজ্ঞদের মতে, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি সড়কগুলো সাধারণ সড়কের তুলনায় দ্বিগুণ দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রায় ৫১ শতাংশ বেশি শক্তিশালী হয়। ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে এ পদ্ধতিতে রাস্তা তৈরি হচ্ছে।

প্লাস্টিকপুন:ব্যবহারের নানান উপায় বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। এবারে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বোতল থেকেই তৈরি হবে সুগন্ধি ভ্যানিলা যা খাদ্য, প্রসাধনী, ঔষধ, ঘর ও আসবাবপত্র পরিষ্কার জিনিসপত্র এবং বিভিন্ন ভেষজনাশক তৈরির জন্য অন্যতম উপাদান। বর্জ্য প্লাস্টিককে এভাবে পরিবেশ থেকে সরিয়েও দেওয়া যাবে অনেক কম খরচে। ফলে পুকুর, নদী, সমুদ্র ও মহাসাগরে উত্তরোত্তর বেড়ে চলা বর্জ্য প্লাস্টিকের পরিমাণ নিয়ে যে গভীর উদ্বেগ এখন বিশ্বের সর্বত্র, এই আবিষ্কার আগামী দিনে তার থেকে রেহাই পাওয়ার আলো দেখাতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইন্দোনেশিয়ার বালি

দ্বীপে নদী পাস্টিকমুক্ত করতে গ্রহণ করা হয়েছে অভিনব উদ্যোগ। সেখানে নদীতে কি পরিমাণ প্লাস্টিকবর্জ্য রয়েছে তার তথ্য তারা বের করত গুগল ম্যাপ প্রযুক্তির মাধ্যমে‘রিভার ম্যাপিং’ নামের এক পরিভাষা ব্যবহার করে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বর্জ্যের অবস্থান নির্ণয় করে তা অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে এই বর্জ্য সমুদ্রে গিয়ে পড়েনা।

প্লাস্টিক দূষণরোধে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধের বিধান করেছিল। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশের পরও এই অগ্রগামি উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়নি। তাই, আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্লাস্টিক ব্যবহার সীমিত করতে হবে, পাট ও পাটজাতপণ্য ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে, প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণকে আরও বেশি সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক দ্রব্যের উপর অত্যধিক শুল্ক আরোপ করে পাটজাত দ্রব্যকে সুলভ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ব্যবস্থাগ্রহণ জরুরি। বর্জ্য রিসাইক্লিং এ গ্রহণ করতে হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। যেমন- প্লাস্টিকবোতল, স্ট্র, মোড়ক, ইনস্ট্যান্ট নুডলসের মোড়ক ইট তৈরি কিংবা এ জাতীয় দীর্ঘমেয়াদি সমাধানসূত্র বের করার জন্য ব্যাপক গবেষণা চালানো প্রয়োজন।

আজকের বিশ্ব যদি আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেওয়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির গল্প হয়, তাহলে একই সাথে তা প্রকৃতি, পরিবেশ আর মানবস্বাস্থ্যের ধ্বংসের গল্পও বটে। আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা সূচকে এগিয়েছি, অথচ নিজ শহরে ভয়াবহ প্লাস্টিক দূষণে প্রতিনিয়ত নিজেরাই অবদান রেখে চলেছি। এখনই সময় সচেতন হবার। আসুন ,পাতলা পলিথিনের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য কাপড় বা পাটের তৈরি ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাই, খাদ্যসরবরাহকারীকে নন-প্লাস্টিক প্যাকেজিং ব্যবহারে চাপ প্রয়োগ করি, পানির বোতল কেনা এড়িয়ে চলি, নিজের বোতল সাথে রাখি, প্লাস্টিক কাটলারি বর্জন করি। নিজেরা সুস্থভাবে বাঁচার জন্য, পররর্তী প্রজন্মকে একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেবার জন্য প্লাস্টিকবর্জন এবং দূষণ রোধের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করি।

লেখক :তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

অদৃশ্য সম্পদ দৃশ্যমান প্রভাবঃ ভূগর্ভস্থ পানি

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি এবং টেকসই উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জলবায়ু ও প্রকৃতি- যা আমাদের জীবন ও জীবিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তার স্বাভাবিক প্রবাহের জন্যও পানি অপরিহার্য। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশসহ সব ধরনের উন্নয়নের সাথে নদী ও পানি সম্পদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা প্রদানসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও পানি দূষণ কমাতে সক্ষম হবে। পানিসম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থাসমূহ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে ‘জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ এবং বাংলাদেশ ‘ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ এর মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সারা বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃতাধীন সরকারের আমলে এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বেড়েছে বহুগুণ; বৃদ্ধি পেয়েছে গুণগত মানও। পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দৃষ্টি ভঙ্গিতেও এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় কাজেও বেড়েছে গতিশীলতা। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করে দুর্নিতীমুক্তভাবে কাজ করা হচ্ছে। আগামী দিনের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পানি সংবেদনশীল টেকসই উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার ফসল ‘বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ এ বলা হয়েছে দেশে সেচ ব্যবস্থার ৮০ শতাংশ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। বাংলা হয়েছে ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ ২ হাজার ৫শ ৭৫ কোটি ঘনমিটার যার মধ্যে ১শ ৬৮

দশমিক ৬ কোটি ঘনমিটার উত্তোলনযোগ্য নহে। প্রতিবছর ভূগর্ভ থেকে ৩ শ ২ দশমিক ১ কোটি ঘন মি: পানি উত্তোলন করা হয়, যার ৮৬ শতাংশই ব্যবহৃত হয় কৃষির সেচ কাজে। এই মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খরা মৌসুমে সেচ কাজে ব্যবহৃত গভীর ও অগভীর নলকূপগুলো পানি সংকটের মুখে পড়ছে।

বাংলাদেশেভূ-উপরিস্থ পানির বিভিন্ন উৎসের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, হ্রদ ও জলা, হাওর, বাঁওড়, খাল, বিল, ঝিল, দীঘি, পুকুর, প্লাবিত কৃষিজমি, পরিত্যক্ত নদীখাত, শুকনো নদীপৃষ্ঠ, খাড়ি, ঝর্ণা ও গ্রোতজ বা গড়ান জলাভূমি। বাংলাদেশে এরূপ উৎস দেশের মোট ভূ-ভাগের প্রায় অর্ধেক। সামগ্রিক আয়তন বিচারে দেশের নদী এলাকা ৭ হাজার ৪শ ৯৭ বর্গ কি:মি:, খাড়িসমূহ ও গ্রোতজ গড়ান জলমগ্নভূমি ৬ হাজার ১শ২ বর্গ কি:মি:, বিল ও হাওর ১ হাজার ১শ ৪২ বর্গ কি:মি:, বন্যাপ্লাবিত প্লাবনভূমি ৫৪ হাজার ৮শ ৬৬ বর্গ কি:মি:, কাপ্তাই লেক ৬ শ ৮৮ বর্গ কি:মি:, পুকুর ১ হাজার ৪ শ ৬৯ বর্গ কি:মি:, বাঁওড় ৫৫ বর্গ কি:মি:, এবং অন্যান্য মিলিয়ে প্রায় ৭২ হাজার বর্গ কি:মি:। পাশাপাশি, সমগ্র বাংলাদেশে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ২ হাজার মি:মি: বা সাড়ে ৬ ফুট বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ভূ-উপরিস্থ এ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

একশ বছর ব্যাপী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি,পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা নিশ্চিত করবে। ডেল্টা প্ল্যানে পানি সম্পদ খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের ৬৪ জেলার ছোটোনদী, খাল ও জলাশয় পুন:খনন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ১০ টি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের উত্তরণ ঘটেছে। দেশের যে কোনো স্থানের মাটি ও ফসলের প্রকৃতি ভেদে কোন সার কী পরিমাণ লাগবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে কৃষকদের ‘সার সুপারিশ কার্ড’ দেওয়া হচ্ছে। সেচের পানির ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রযুক্তি-কৌশল খুঁজে বের করা সময়ের দাবি।

বাংলাদেশে সত্তরের দশকের শুরুতে কৃষিকাজের জন্য প্রথম ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার শুরু হয়, আশির দশকে যার ব্যাপকতা পায়। ষাটের দশকে ৫০ ফুট নীচ থেকে গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি উঠানো গেলেও এখন ১শ ৫০ ফুট নীচ থেকে পানি তুলতে হয়। শুধু বোরো মৌসুমে প্রতিবছর যে হারে পানি

সেচের জন্য ভূ-গর্ভ থেকে তোলা হয়, সে পরিমাণ পানি মাটির নীচে যায় না। ফলে পানির স্তর আরও নীচে নেমে যায়। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে আরও সুসংহত করতে দেশের ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমিতে বাড়াতে হবে শস্যের নিবিড়তা তথা আবাদের পরিমাণ। আবাদযোগ্য কিন্তু পতিত জমিকেও আনতে হবে আবাদের আওতায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হবে বাড়তি সেচ, বেড়ে যাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলন। এক্ষেত্রে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরত্ব দিতে হবে।

দেশের সবকটি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোটোনদী, খাল এবং জলাশয় পুন:খনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রায় ৪ হাজার ৪শ ৩৯ কি:মি: নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন করা হচ্ছে। ফলে ১শ টি ছোটোনদী, ৩শ ৯৬টি খাল ও ১৫ টি জলাশয় পুনরুজ্জীবিত হবে। জলাশয়, খাল ও নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হবে। শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য পানি ধরে রাখা সম্ভব হবে , নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আনুমানিক ৫ লাখ ২০ হাজার হেক্টর এলাকায় জলাবদ্ধতা, বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় হতে জনসাধারণের পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে বার্ষিক প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ে ২শ ১২টি ছোটোনদী, ২ হাজার ৪টি খাল ও ৯৯টি জলাশয় পুন:খনন করা হবে যার মোট দৈর্ঘ্য ১৩ হাজার ৮শ ৪৩ দশমিক ২৯ কি:মি:। দেশে ১শ ৩৭ টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৬৫ দশমিক ১২ লক্ষ হেক্টর জমিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এতে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১শ ১১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে।

দেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহে ড্রেজিং, সমন্বিত নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এটি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহের ফসল। ২০০৯-২০২১ মেয়াদে অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননসহ মোট ৩ হাজার ৮১ কি:মি: নদী ড্রেজিং সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫শ কি:মি: দৈর্ঘ্যের নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কার্যক্রম চলতি অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে। ড্রেজিং কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন সাইজের ৩৫ টি ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক জলযান এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রণীত প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশের উপকূলবর্তী ১৩ টি

জেলায় ১শ ৩৯ টি পোল্ডারের মধ্যে ৬১ টি পোল্ডারে বর্তমানে পুনর্বাসন কাজ চালু আছে। তন্মধ্যে, বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন “উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় ১০টি পোল্ডারের উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম চলমান আছে। “উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” এর আওতায় আরও ২০টি পোল্ডারের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে “আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নির্মাণ” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অস্থায়ী ভবনে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ-বছরে সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনো ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ১ হাজার ৯০টি স্কীমে ৮শ ১৯ কি:মি: ডুবন্ত বাঁধ পিআইসি’র দ্বারা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে বেশ কয়েকবার বিপর্যয় ব্যতিরেকে হাওড় এলাকায় বোরো ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছে। হাওর এলাকাকে আগাম বন্যামুক্ত রেখে বোরো ফসল রক্ষা করা হয়। বিগত অর্থবছর সমূহে সুনামগঞ্জ জেলায় এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় নদী ড্রেজিং করার ফলে হাওর এলাকায় প্রাক-মৌসুম আগাম আকস্মিক বন্যার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সুনামগঞ্জ এলাকায় ১ হাজার ৫শ ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪ টি নদী খননের মাধ্যমে হাওর এলাকাকে বন্যামুক্ত রাখার জন্য ১টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হাওর অঞ্চলেনৌ-চলাচলের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত কজওয়ে নির্মাণ প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাব থাকা সত্ত্বেও এ মন্ত্রণালয়ের মোট ৩৩ টি প্রকল্প জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১শ২২ টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ৫ শ ১১ কি:মি: নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ১শ ৮৫ কি:মি: সেচ খাল পুনঃখনন, ৯০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ, ১ হাজার ১শ ৭১ কি:মি: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৯২ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, ১শ ৯৪টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ এবং ৩শ ১৯টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত সমাপ্ত করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগরের জনসংখ্যার মোট পানির চাহিদার ৭৮ শতাংশই তোলা হচ্ছে মাটির নীচ থেকে। ঢাকা মহানগরে ওয়াসার বসানো গভীর নলকূপের সংখ্যা ৯শ পেরিয়েছে অনেক আগেই। আর বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন গভীর

নলকূপের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি। এই বিপুলসংখ্যক গভীর নলকূপ দিয়ে মাটির নীচ থেকে দিনরাত অবিরাম পানি তোলা হচ্ছে এবং পানির অপচয়ও হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটা দুই দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ, যার ফলে আমরা গুরুতর সংকটে পড়ে যেতে পারি। তা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে পানির স্তর নীচে নেমে যায়, এতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বা ইকোসিস্টেমে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হয়। প্রত্যক্ষভাবে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা হলো, পানির স্তর ক্রমাগত নেমে যাওয়ার ফলে পানি তোলার ব্যয় বেড়ে যায় এবং পানির প্রাপ্যতা কমে যায়, এমনকি ভূগর্ভস্থ পানিতে দূষণের ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে এবং ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়ে। সরকার ঢাকা শহরে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-পরিস্থ উৎস থেকে পানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পদ্মা নদী হতে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহের কার্যক্রম অচিরেই শুরু হবে। এর ফলে শহরের যে ৭৮ শতাংশ ভূগর্ভস্থ পানির চাহিদা ভূ-পরিস্থ উৎস থেকে পূরণ হবে।

আমাদের দেশে অদ্যাবধি পৃথকভাবে 'ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই নীতি' তৈরি করা হয়নি। তবে 'জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯'-এ ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহার, পানি সংকটাপন্ন এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর রক্ষার জন্য পানির উত্তোলন নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে; 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩' এর ধারা-১৯ এ 'ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন আহরণ সীমা নির্ধারণ ও ভূগর্ভস্থ পানি আহরণে বিধিনিষেধ' সম্পর্কে দিকনির্দেশনা রয়েছে। 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮'- এ ভূগর্ভস্থ পানির সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা রয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানির দূষণ যত কমাতে সক্ষম ও সচেতন হবো এর ব্যবহার তত বৃদ্ধি পাবে ফলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ হ্রাস পাবে। পানি সম্পকৃত সকল নীতি, আইন, বিধি'র যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অমূল্য ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

শ্রমিকের কল্যাণে এক'শ বছর পেরিয়ে শ্রম অধিদপ্তর

মো. আকতারুল ইসলাম

জ্ঞানীর জ্ঞান, বিজ্ঞানের অত্যাশ্চার্য আবিষ্কার, ধর্ম সাধকের আত্মোপলব্ধি, ধনীর ধন যোদ্ধার যুদ্ধে জয়লাভ সবকিছুই শ্রমলব্ধ। মানুষ জীবন ধারণের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাকে শ্রম বলে। শ্রমিকই হলো সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। শ্রমের চাহিদা চিরন্তন নিরলস শ্রম দিয়েই এই সভ্যতা তৈরি। শ্রমের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এ সমাজে যারা শ্রম দেন তারা কি যথাযথভাবে সে মূল্য পান? এ প্রশ্ন চিরন্তন। সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই শ্রমজীবীর বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই গেছে। শ্রমজীবীর যথাযথ প্রাপ্যতা এবং অধিকার নিশ্চিতে এ উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন আমলেই শ্রমদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বৃটেনসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতে হাজার বছর ধরে চলে আসা লোমহর্ষক এবং নিকৃষ্টতম নির্যাতন প্রথা কৃতদাস প্রথার দগদগে ক্ষত, ১৮৮৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক আটঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের আত্মত্যাগ, ফলশ্রুতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের উন্নতি, তাদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী ১৯১৯ সালের১১ এপ্রিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও গঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে ভারত উপমহাদেশে তেমন কোনো শ্রম অসন্তোষ না থাকলেও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে শ্রম সম্পর্কিত সুসম্পর্ক রক্ষা, শ্রম অধিকার এবং শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ভারত সরকার প্রাথমিকভাবে ১৯২০ সালে লেবার ব্যুরো গঠন করে। যা আজ শ্রম অধিদপ্তর হিসেবে পূর্ণতা পেয়েছে। এক'শ বছর পেরিয়ে এ অধিদপ্তর আজ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আশ্রয়স্থল, আস্থার জায়গা।

বৃটিশ শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে অবিভক্ত ভারতে শুধু শ্রমিকের কল্যাণার্থে শ্রম প্রশাসনের সূত্রপাত ঘটে। লেবার ব্যুরো থেকে ১৯৩১ সালে জেনারেল

ডিপার্টমেন্ট অভ লেবার নামকরণ করা হয়। ১৯৩৫ সালে নতুন সংবিধানের আওতায় লেবারডিপার্টমেন্টের সৃষ্টি ও শ্রম প্রশাসনের বিকাশ ঘটে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রম কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য বীমা, বার্ধক্যজনিত অবসর, ট্রেড ইউনিয়ন এসকল বিষয়গুলো শ্রম আইন প্রাদেশিক সরকারের অধিভুক্ত হয়। শিল্প শ্রমিক ও মহিলাদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে ভারত সরকার ১৯৪১ এবং ৪২ সালে শ্রমিক-মালিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে মালিক-শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধিত্বের মাধম্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সে অনুযায়ী ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শ্রম মন্ত্রীদের কনফারেন্সে শ্রম ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমআইন কেন্দ্রীয় সরকারের অধিভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শ্রম প্রশাসন কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত ছিল। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তা প্রাদেশিক বিষয়ে রূপান্তরিত হয় এবং লেবার কমিশনারের পদসহ তাঁর দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শ্রমনীতি এবং এয়ারভাইস মার্শাল নূর খানের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে লেবার এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই তিনভাগে ছিল শ্রম সম্পর্ক পরিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টারের অফিস। পরবর্তীতে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টারকে শ্রম পরিদপ্তরের সাথে একত্রিকরণ করা হয়। সব শেষে বর্তমান সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৭ সালে শ্রম পরিদপ্তরকে 'শ্রম অধিদপ্তর' করা হয়। সরকারের নানামুখি ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বেড়েছে বহুগুণ।

শ্রম অধিদপ্তরের গঠন, ক্রমবিকাশ, ব্যপ্তি সবমিলে দেখতে পাই এ অধিদপ্তরের প্রাণ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। আর শতবর্ষী এ প্রতিষ্ঠানের মূলকাজ হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে তাদের মুখে হাসি ফোটানো। শতবছর ধরে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রম অধিদপ্তর হয়ে উঠেছে শ্রমজীবীদের আশ্রয়স্থল। শ্রম অধিদপ্তর রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পেয়েছে সাহায্য-সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা, সাহস এবং সমর্থন। শ্রমজীবী মেহনতি এসব মানুষকে আপন করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতা আজীবন সংগ্রাম

করেছেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে, আর দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ১৯৭৫ সালের২৬ শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহান স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বঙ্গবন্ধু চাকরিজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আপনি চাকরি করেন আপনার মায়না দেয় ঐ গরিব কৃষক, আপনার মায়না দেয় ঐ গরীব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়, আমি গাড়ি চলি ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলুন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলুন, ওরাই মালিক' শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের প্রতি কতটা টান, কতটা দরদ, কতটা মমত্ববোধ থ াকলে একজন রাষ্ট্রনায়ক তাঁর দেশের গরিব শ্রমজীবীদের দেশের মালিক বলে ঘোষণা দিতে পারেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিক ভাইয়েরা, আমি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান করেছি। আপনাদের প্রতিনিধি ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, লেবার ডিপার্টমেন্টের শ্রমিক প্রতিনিধি বসে একটা প্ল্যান করতে হবে। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কি করে আমরা বাঁচতে পারি তার বন্দোবস্ত করতে হবে'। মহান স্বাধীনতা লাভের পরেই জাতির পিতা নবপ্রণীত সংবিধানে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকারের বিষয় সুদৃঢ়করণ করেন।

শুধু তাই নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ে ধর্মঘট ঘোষণা করলে সে আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করায় বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ বহিষ্কৃত হন। তিনি অন্যায়ের সাথে আপোশ করেননি এবং ছাত্রত্ব ফিরিয়ে নেননি। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য এমন ত্যাগ ইতিহাসে বিরল। ১৯৭২ সালে জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলসিতে ৬টি কোর-কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। আইএলও এর ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। এর আগেও বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালের১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম মন্ত্রীরই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতিহাসের দেদীপ্যমান এসব ঘটনা শ্রম অধিদপ্তরের অহংকারেরই এক একটি পালক।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শ্রম অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়ন এর গঠনতন্ত্র, নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন, ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলিলের সত্যায়িত কপি প্রদান, নিবন্ধনের প্রত্যয়ন কপি প্রদান, শিল্প,কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমুদ্র ও স্থল বন্দর, পরিবহণ সেক্টরসহ

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, সালিশকারক হিসেবে শিল্পে উৎপাদন অব্যাহত রাখা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বন্দরসমূহের কার্যক্রম এবং পরিবহণ সেক্টরের শৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ সার্বিক শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিল্প, কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন ও কার্যাবলি তত্ত্বাবধান, যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্ধারণ, ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে সকল সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশের দৈনিক শ্রম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা ও স্থানীয় প্রশাসন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে। শ্রম অধিদপ্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করে থাকে তা হচ্ছে অসৎ শ্রম আচরণ ও এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন বিষয়ে মালিক বা শ্রমিক অভিযোগ এবং শ্রম অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তি করা।

বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১৭ সালে শ্রম পরিদপ্তরকে 'শ্রম অধিদপ্তর' করার পর ডিজিটাল বাংলাদেশের বদৌলতে কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অনলাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবাসহজীকরণের জন্য 'শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন অংশীজনের অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) চালু করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৮ হাজার ৮১৪টি ট্রেড ইউনিয়ন, ৩৩টি জাতীয় ভিত্তিক ফেডারেশন, ১৮৭টি সেক্টরভিত্তিক ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ৬৯৯টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নকল্পে ১৪ হাজার ৪৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ, ৬২ হাজার ৯৯৪ জনকে বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৯১ জনকে বিনোদনমূলক সেবাপ্রদান করা হয়। করোনা প্রাদুর্ভাবকালীন শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসকদের মাধ্যমে৭৯ হাজার ৬৯৮ জন শ্রমিককে টেলিমেডিসিন সেবা এবং ১ লাখ ৩৯ হাজার ১৭৭ জন শ্রমিককে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ যাতে সহজে আদালতে আইনের আশ্রয় নিতে পারে সেজন্য সারাদেশে বিদ্যমান ৭টি শ্রম আদালতের সাথে আরও ০৩ টি শ্রম আদালত (সিলেট, বরিশাল ও রংপুর)

প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সব শেষ গত ৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য নারায়ণগঞ্জের বন্দর এবং চট্টগ্রামের কালুরঘাটে এক হাজার ৭'শ শয্যা বিশিষ্ট দুটি ডরমেটরি এবং ৬টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন।

বৃটিশ ভারতের লেবার ব্যুরো শতবছর পেরিয়ে আজ পূর্ণাঙ্গ অবয়বে শ্রম অধিদপ্তর। বেড়েছে কলেবর, কর্মপরিধি, গায়ে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। অধিদপ্তরটি পেয়েছে রাজধানীর বিজয় স্মরণীতে সুউচ্চ শ্রম ভবন। এ অধিদপ্তরের আগামী কয়েক বছরের পরিকল্পনায় রয়েছে গাজীপুরের টঙ্গীতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় শ্রম ইনস্টিটিউট, মতিঝিলে লেবারওয়েলফেয়ার টাওয়ার, তেজগাঁওয়ে ন্যাশনাল লেবার হাসপাতাল, দেশের বিভিন্ন জেলায় শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুবসমাজকে দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তর প্রকল্প। পরিকল্পনায় নেয়া এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শ্রম অধিদপ্তরের সেবার বদৌলতে শ্রমজীবী মানুষগুলো সমাজের অন্যদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশের পর্যায়ে নিতে বড়ো অবদান রাখতে পারবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্টেম (STEM) শিক্ষা ২০৪১-এর রূপকল্প উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণকে গতিশীল করবে

মোঃ রেজুয়ান খান

সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথমেটিকস এ চারটি বিষয়ের আদ্যক্ষর মিলিয়ে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে স্টেম (STEM)। বিশ্বজুড়ে বর্তমানে শিক্ষার যে ধরনটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে, সেটি হলো স্টেম এডুকেশন। উন্নত দেশগুলো মনে করছে, ভবিষ্যতে তাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ধরে রাখতে হলে স্টেম এডুকেশন অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। যেসব দেশ স্টেম এডুকেশনের ওপর জোর দিবে তারাই ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

স্টেম এডুকেশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং একুশ শতকের জন্য সুশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা। স্টেম শিক্ষা মানুষের মনের সৃজনশীলতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে টিম ওয়ার্ক, উন্নত যোগাযোগ, কোনো কিছু খুঁজে বের করার দক্ষতা, কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, যে কোনো সমস্যার সমাধান করা, সর্বোপরি ডিজিটাল জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলাই হচ্ছে -শিক্ষার মূল কাজ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, এবং গণিত STEM শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য অনন্যভাবে উপযুক্ত। STEM শিক্ষা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি করার জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত শিক্ষার্থী মানসম্পন্ন STEM শিক্ষা গ্রহণ করে, তারাই পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভাবক হয়ে ওঠে। STEM শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিখে, কীভাবে তাদের সময় পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে বড়ো প্রকল্পগুলিকে ছোটোছোটো ধাপে ভাগ করতে হয়। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যা তাদের সারাজীবন উন্নতির জন্য সাহায্য করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অভ কমার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টেম শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদের জন্য প্রতিবছর ১৭ শতাংশ হারে কাজের সুযোগ

বাড়ছে। আর অন্য ডিগ্রিধারীদের জন্য কর্মসংস্থান বাড়ছে প্রায় ১০ শতাংশ হারে। মানুষের মনে নানা জিজ্ঞাসা, কৌতূহল এবং অনুসন্ধান শুরু হয় মাধ্যমিক কাল থেকেই। শুধু পশ্চিমা দেশগুলোতেই নয়, ভারত ও চীনের মতো দেশগুলোও তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্টেম কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দনীয় তৃতীয় শিক্ষায় সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, গণিত ও প্রকৌশল ছাড়া সভ্যতা অচল। জীবন চলার পথে প্রতিটি স্তরে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রভাব। মানবসভ্যতায় প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ একটি জাতিকে বিকশিত করে।

স্টেম শিক্ষা একসময়কার সনাতনী নিয়মে পাঠ্যবই মুখস্থ করার প্রবণতাকে কমিয়ে এনেছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাঠ্যবই মুখস্ত করার প্রবণতা এখনও লক্ষ্য করা যায়। স্টেম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলে, এর প্রভাব অনেকটা কমে আসবে। যেমন- আমাদের দেশের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে এখনকার শিক্ষার্থীরা আগেকার সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আধুনিক শিক্ষার সুফল ভোগ করতে পারছে। স্টেম শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। স্টেম সৃজনশীল সমস্যাগুলোর সমাধান করে। স্টেম অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয়। স্টেম শিক্ষা একজনের সাথে অন্যজনের যোগাযোগ দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ জোগায় এবং অতিমাত্রা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি যৌক্তিক চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে।

বাংলাদেশের শিক্ষার মান আগের তুলনায় অধিকাংশে আধুনিকায়ন হয়েছে। ইনোভেশন কর্মসূচি, শিক্ষার নতুন নতুন প্রযুক্তি, গণমাধ্যমে শিক্ষা প্রদান কর্মসূচি, ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পরিচালনা এর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের স্টেম নিয়ে পড়াশুনার আগ্রহকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় স্তরের জন্য বিজ্ঞান গ্রুপে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বছরের পর বছর কমে আসছিল। কারণ হিসেবে দেখা গেলো শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান ও গণিত ভীতি। সরকার গণিত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের মাঝে আরও আকর্ষণীয় করতে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরিবেশ গড়ে তুলেছে। মেধাবি শিক্ষার্থীরা গণিত অলিম্পিয়াডে

অংশ নিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। প্রেক্ষিতে গণিত বিষয়ে ভালো গ্রেড পেতে গণিত শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীরা বেশিবেশি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এভাবে গণিতের প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভীতি অনেকটা কমে এসেছে। শিক্ষার্থীদের চিন্তা ভাবনা বিকশিত হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর নতুন উদ্ভাবনী শিক্ষাব্যবস্থা সহায়তা করছে।

বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের কাছে স্টেম এডুকেশন খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। বাংলাদেশে ৪৩৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ২১৬ টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে হাতে কলমে স্টেম শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিআইএসটি), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অভ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএসটি), সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অভ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (ঢাকা), বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অভ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, গোপালগঞ্জ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিসিএন ইউনিভার্সিটি অভ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কোটবাড়ি, কুমিল্লা, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অভ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (ইউএসটিসি), চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অভ সায়েন্স ট্রেড এন্ড টেকনোলজি (আইএসটিটি), ইউনিভার্সিটি অভ ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীরা স্টেম শিক্ষা গ্রহণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাচ্ছে।

বাংলাদেশ স্টেম ফাউন্ডেশন ২০২০ সালে সারাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে গবেষণা মূলক কনসেপ্ট ও প্রজেক্ট আহ্বান করে। এ আহ্বানে শতাধিক টিমের মধ্যে ২৩৮টি প্রজেক্ট জমা পড়ে। ২০৩০ সালের ১৭ টি গোলের মধ্যে ১৩টি গোল বা লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছিল ন্যাশনাল স্টেম কম্পিটিশন। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য,

পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানির অভাব, জলবায়ু সমস্যা সমাধান, শিল্পায়ন, পরিকল্পিত নগরায়ণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ক কনসেপ্ট পেপার ও প্রজেক্ট উপস্থাপন করে। বিজ্ঞানভিত্তিক আইডিয়াসহ প্রজেক্ট জমাদানকারীদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে বিজয়ী দল বুয়েট টিম, প্রথম রানার আপ রুয়েট টিম এবং দ্বিতীয় রানার আপ অর্জন করে চুয়েট টিম। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা স্টেম প্রতিযোগিতায় সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

স্টেম শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে ‘ফার্স্ট গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ’ নামের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান ২০১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ আকর্ষণীয় রোবটিক্স প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২০১৭ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশও অংশ নিয়ে আসছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ রোবটিক্স অলিম্পিকে সপ্তম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এবারই অতিমারি করোনাভাইরাসের কারণে ফার্স্ট গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রতিযোগিতাটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো এ রোবটিক্স প্রতিযোগিতায় এবার বাংলাদেশসহ ১৭৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে। আনন্দের বিষয় হলো বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রোবোটিক্সির অলিম্পিক হিসেবেখ্যাত আন্তর্জাতিক এ খেলায় ১৭৩টি দেশের নামকরা সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। বিশ্ব জনপ্রিয় এ রোবটিক্স অলিম্পিকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অবস্থানকে অনেক ঊর্ধ্বে দাঁড় করিয়েছে। সাবাস! বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বাংলাদেশে স্টেম এডুকেশনকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে আগের তুলনায় এখনকার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে ওঠছে। STEM শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক হয়ে উঠতে পারছে। STEM ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (4IR)-এর নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, STEM শিক্ষা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে বাস্তব রূপ দিতে আরও গতিশীল করবে।

লেখক :তথ্য অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন

এম জসীম উদ্দিন

সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবাপ্রদান পদ্ধতিকে অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ১ হাজার ১৯৭ কোটি ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত) এবং ১ হাজার ২১২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। প্রকল্প দু'টি ইতোমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প দুটির বাস্তবায়ন ২০২৫ সালের ৩০ জুনের মধ্যে শেষ হবে। আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধন অধিদফতর বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে প্রত্যাশিত সেবাগ্রহীতা ভূমি অফিসে না গিয়ে ঘরে বসে মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা পাবেন। হাতের মুঠোয় ভূমি সেবা দেওয়া প্রকল্প দুটির মূল লক্ষ্য। প্রকল্পটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতর বাস্তবায়ন করবে। জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্প কাজের অগ্রগতি ১৫.০৯ শতাংশ।

ভূমি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' গ্রাহকের ১৭ ধরনের সেবা নিশ্চিত করবে। এসব সেবা পেতে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমেই মিলবে সকল সেবা। সেবাগুলো হচ্ছে- ই-মিউটেশন, রিভিউ ও আপিল মামলা ব্যবস্থাপনা, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা, মিউটেটেড খতিয়ান, ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড, মৌজা ম্যাপ ডেলিভারি সিস্টেম , মিস মামলা ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা, দেওয়ানি মামলা তথ্য ব্যবস্থাপনা, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, বালুমহাল ব্যবস্থাপনা, চা-বাগান ব্যবস্থাপনা, ভিপি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ বাজেট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। 'ল্যাভ ইনফরমেশন সার্ভিসফ্রেমওয়ার্ক' সিস্টেম সফটওয়্যার-এর

মাধ্যমে একই কাঠামোয় নিয়ে এসে আন্ত-পরিচালনযোগ্য ডাটাবেজ তৈরি করে সরকারের অন্যান্য সব সেবার সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

এই প্রকল্পের প্রধান কাজ হবে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ১৭টি ধাপে সংস্কার আনা। সংস্কারগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার এবং নেটওয়ার্ক কেন্দ্র স্থাপন, প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য ৪৯৬টি মাইক্রো ডেটা সেন্টার স্থাপন ও জেলা ডেটা সেন্টারের সঙ্গে আন্তসংযোগ স্থাপন, প্রতিটি জেলায় একটি করে ডেটা সেন্টার, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি) সফটওয়্যার উন্নয়ন, নিবন্ধন অধিদফতর এবং এই সংশ্লিষ্ট সব অফিসের জন্য ভার্চ্যুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) স্থাপন, তহশিলদার; দলিল লেখক ও নকলনবিশদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম স্থাপন এবং রেকর্ড রুম স্বয়ংক্রিয়করণ এবং পুরোনো রেকর্ডগুলো ডিজিটাইজ করা।

তাছাড়া পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ভূমি সেবা প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমিব্যবস্থা অটোমেশন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্ল্যাটফর্ম জাতীয় ডিজিটাল সেবাই কোসিস্টেমের অন্যতম অংশ হিসেবে কাজ করবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নতুন ও চলমান সব প্রকল্প বস্তুত ভূমিব্যবস্থা অটোমেশন প্রকল্পকে সামনে রেখেই তৈরি ও হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য কেবল বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম ক্রমাগতভাবে কার্যকর সরকারি দপ্তর তথা ভূমি অফিসের সম্পদ পরিকল্পনা ডিজিটালাইজেশন করাই নয়; আইন, জরিপ, মানবসম্পদ ও অর্থের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী সংস্কার উদ্যোগের নির্দেশক হিসাবে কাজ করা। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় সব ক্ষেত্রেই জলবায়ু ও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারটিতে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিজমি ও বনভূমি সুরক্ষা জলবায়ুর ক্ষতিকর পরিবর্তন প্রতিরোধে অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া ভূমির গুণাগুণ অনুযায়ী, ভূমিকে প্লটওয়ারি কৃষি, আবাসন, বাণিজ্যিক, পর্যটন ও শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় তিনটি সিটি করপোরেশন, একটি পৌরসভা ও দুটি উপজেলায় ড্রোনের মাধ্যমে জমি জরিপ করা হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সহায়তায় সমীক্ষার পরে, একটি ডিজিটাল ডাটাবেস স্থাপন করা হবে যা সমস্ত জমি-সম্পর্কিত

বিষয় যেমন রেজিস্ট্রেশন, বিক্রয়, ক্রয় এবং মিউটেশন ডিজিটালভাবে রেকর্ড করার অনুমতি দেবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে প্রকৃত মালিকদের জমির অধিকার নিশ্চিত করা, জমি সংক্রান্ত বিরোধ কমানো, ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করা এবং সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বাড়ানো।

দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপনে কার্যকর ভূমিনীতি অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনবান্ধব ভূমিব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার প্রথম মেয়াদেই আজ থেকে ২০ বছর আগে ২৮টি মৌলিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ২০০১ সালের ২১ জুন 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১' গ্রহণ করেন। ডিজিটালাইজেশন, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করে এবং ভূমিনীতির কার্যকর ও দক্ষ প্রয়োগের সমন্বয়ে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর অন্যতম অংশ 'ভূমি ব্যবস্থাপনা'কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এ কর্মযজ্ঞ সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় অন্যতম নিয়ামক।

ইতোমধ্যে অনলাইনে খতিয়ান সরবরাহ, ই-নামজারি ও ই-সেটেলমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডিজিটাল ল্যান্ড ডেটা ব্যাংক ও ল্যান্ড জোনিং কার্যক্রমও হাতে নেওয়া হয়েছে। এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। ভূমি ব্যবহারে আধুনিকায়নের জন্য ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ভূমি জরিপ কার্যক্রমটি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল বিষয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন করতে সময় লেগেছে ২০-২৫ বছর। ভূমি তথ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন এ সময় সম্পন্ন করা জটিল। কারণ ভূমি তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশনের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার বিষয়টি একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ডিজিটালাইজেশনের আওতায় ভূমি অধিদফতরের সদর দফতর, খতিয়ান ও ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস, কেন্দ্রীয় রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (ম্যাপ ও খতিয়ান) কার্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার, স্ক্যানার, ল্যাপটপ সরবরাহসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অধিদফতরের হিসাব শাখা ও লাইব্রেরি অটোমেশন করা হয়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে মৌজা ম্যাপ এবং স্ক্যান করা প্রিন্ট কপি সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে। অধিদফতরের ওয়েব পোর্টাল চালু করা

হয়েছে। অধিদফতরে ওয়াই-ফাই চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০ হাজার মৌজার চার কোটিরও অধিক স্বত্বলিপি ডেটাবেইসে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ১ লাখ ১৫ হাজার মৌজা ম্যাপ স্ক্যান করতে পিডিএফ রূপে সার্ভারে সংরক্ষণসহ ডিজিটাল ব্যবহার চালু করা হয়েছে।

জমি সংক্রান্ত অপরাধ ঠেকতে আইন করছে সরকার। ইতোমধ্যে জমি সংক্রান্ত ২২ ধরনের অপরাধ চিহ্নিত করে আইনের খসড়া তৈরি করে- তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২১' শীর্ষক এ আইনের খসড়ায় অন্যের জমির মালিক হতে জাল দলিল তৈরির পাশাপাশি মালিকানার চেয়ে বেশি দলিল করা, অতিরিক্ত জমি লিখে নেওয়া, আগে বিক্রি বা হস্তান্তরের পরও গোপনে বিক্রি করা,

বায়না করা জমি পুনরায় বিক্রি করতে চুক্তিবদ্ধ হওয়া কিংবা ভুল বুঝিয়ে দানপত্র তৈরির মতো অপরাধগুলো কে আমলে এনে এর প্রতিকারের জন্য আইন করা হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ সুবিধা পাবে এবং ভূমি সংক্রান্ত অপরাধ ও মামলা কমে যাবে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করার বিষয়টি বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। এজন্য নেওয়া হয়েছে একাধিক প্রকল্প। কাজটি যতই চ্যালেঞ্জিং হোক, সরকার এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে বলে সকলেই বিশ্বাস করে।

লেখক:সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

মা ও শিশুমৃত্যুরোধে অভূতপূর্ব অর্জন বাংলাদেশের

তন্ময় সরকার

বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ। এ দেশের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু ছিল উন্নতির অন্তরায়। কিন্তু সরকারের কিছু আন্তরিক চেষ্টা এবং এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের ঐকান্তিক শ্রমে সমাধান হচ্ছে এই সমস্যার। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, টিকাদান অভূতপূর্ব অর্জন- সবই সরকারের ও জনগণের কৃতিত্ব। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ যেসব সূচকে পিছিয়ে ছিল, ২০১০ সালের পর তা অনেকখানি এগিয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা। শিশুমৃত্যুর হার কমানোর অর্জনে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ সেপ্টেম্বর ২০১০ জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেন। মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ এই সরকারের সাফল্যের মুকুটে অন্যতম পালক। ২০৩০-এর মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সার্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ (SDG) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। টেকসই অভিষ্ঠের ৩.২ "২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও ৫ বছর বয়সের নীচে শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুনাশ করা" এটি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে তথ্য মন্ত্রণালয়ও দায়িত্ব পালন করছে। এক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং করবে তা জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে সচেতন করা। এর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ এবং অংশিদারিত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সৃষ্টি হয়।

৫০ বছরে মা ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে। মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। ধারাবাহিক সাফল্যে দক্ষিণ এশিয়ার

শীর্ষে। ২০১৯ সালের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশের তথ্যমতে, ২০০৪ সালে প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুহার ছিলো ৩ দশমিক ২০ শতাংশ। বর্তমানে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মা ও শিশুমৃত্যুহার কমানোর কৌশলপত্রের তথ্যমতে, ২০০৯ সালে প্রতি লাখ সন্তান প্রসবে মাতৃমৃত্যুহার ছিলো ২৫৯ জন। সম্প্রতি সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬৫ জনে। গত ১০ বছরে মাতৃ মৃত্যুহার কমেছে প্রতি লাখ জীবিত জন্মে প্রায় ৯৪ জন। এদিকে শিশুমৃত্যুরহার কমেছে ৮৫ শতাংশ। এই অর্জনে সরকারের কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ আছে। নবজাতক মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে জন্মের সময় শ্বাসগ্রহণে সমস্যা ২৩ শতাংশ, কম ওজনের শিশু ২৮ শতাংশ, সংক্রমণ ৩৬ শতাংশ। কম জন্ম ওজনের শিশুকে পরিপূরক খাবারের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। নবজাতকের শ্বাসগ্রহণে সমস্যা কমাতে ‘হেল্পিং বেবিজ ব্রিদ’ নামের একটি কর্মসূচি উপজেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রতিটি হাসপাতালের শিশু বিভাগে চালু আছে। পাশাপাশি নবজাতক ইউনিটে ইনকিউবেটর ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মজুদ আছে। সংক্রমণ কমাতে মা ও শিশুকে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় টিটেনাসের টিকা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া কম জন্ম ওজনের শিশু যাতে মায়ের সংস্পর্শে তাপমাত্রা ও বুকের দুধ পায়, সে জন্য প্রতিটি উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে ‘ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার’ নামে একটি সেবাচালু হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সহায়তা দিচ্ছে ইউনিসেফ। শিশুমৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছে।

সুস্থ শিশুর জন্ম নিশ্চিতের লক্ষ্যে গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব (গর্ভকালীন), প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবাপ্রদান নিশ্চিতের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের অত্যাবশ্যকীয় সেবাপ্রদান এবং কোনো জটিলতা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব প্রসূতিকে জরুরি প্রসূতি সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালনা করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত গ্রামগুলোর মধ্যে থেকে মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে ‘কমিউনিটি গ্রুপ’ তৈরি করা হয়। এই কমিউনিটি গ্রুপ কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সমস্ত কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবাপ্রদান করা হয়ে থাকে এবং ৩০ প্রকার ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

টিকাদানের মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় এমন একটি সফল কর্মসূচির নাম হচ্ছে ইপিআই (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি)। এই কর্মসূচির আওতায় ১০টি রোগের বিরুদ্ধে ছয়টি টিকা দেওয়া হয় ০ থেকে ২৩ মাস বয়সি শিশুদের। এ কর্মসূচিতে সহায়তা করছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন। এ কর্মসূচিতে যে রোগগুলোর টিকা দেওয়া হচ্ছে তা হলো-যক্ষা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফলুয়েঞ্জা বি, হাম, রুবেলা, পোলিও ও নিউমোনিয়া। এ কর্মসূচির বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয়ভাবে টিকার হার ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ। এছাড়া সরকার রোগ নির্মূল ও শিশুমৃত্যুরোধে নির্দিষ্ট সময় পর পর সম্পূরক টিকাদান কর্মসূচি করে থাকে। বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে শতভাগ সফল কর্মসূচির নাম ইপিআই। এ সাফল্যের কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালের মার্চে বাংলাদেশকে পোলিও নির্মূল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'ভ্যাকসিন হিরো'র অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। পাশাপাশি এ কর্মসূচির আওতায় ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি প্রজননক্ষম নারীদেরও টিটি টিকার পাঁচটি ডোজ দেওয়া হচ্ছে।

২০১৯ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১.৭৩, যা ১৯৯০ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে প্রায় ৬ ছিল। এই মাতৃমৃত্যুর হার কমে আসার পেছনে অনেকগুলো ধাপ আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত নিয়ম গর্ভকালীন ও প্রসবপরবর্তী সেবাকমপক্ষে চারবার নিতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে জরুরি প্রসূতি সেবার লক্ষ্যে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যায় চিকিৎসকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা ইউনিসেফ ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের সহায়তায় সরকার পরিচালনা করে থাকে। মাতৃস্বাস্থ্য সেবা সবসময় চালু থাকছে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের কী কী করণীয় এবং তাদের পুষ্টি পরামর্শ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া সরকারি কেন্দ্রগুলোর একটি বড়ো কাজ।

গত ৫০ বছরে মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতিতে বাংলাদেশের অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। শূন্য থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরমৃত্যুহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যকে ইতোমধ্যে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) স্বীকৃতি দিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের টার্গেট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে

বাংলাদেশ। সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু প্রতি হাজারে ৫০ জনের নীচে নামিয়ে আনা। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে, ১৯৭২ সালে এক হাজার শিশু জন্ম নেয়ার পর বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ১৪১টি শিশু মারা যেতো। আর এখন মারা যায় ২১টি শিশু। পাকিস্তানে এখন শিশুমৃত্যুর হার ৫৫। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বছরে সংখ্যাটি ছিলো ১৩৯। পাকিস্তানের শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশের চেয়ে কম ছিল। জনস্বাস্থ্যবিদরা বলেন, স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে দেশের প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য মিলেছে। এ ক্ষেত্রে মা ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাসেও পিছিয়ে নেই। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভূমিকা রয়েছে দেশের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠকর্মীদের। তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা তৈরি, জরুরি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পরামর্শ প্রদান। এছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি অগ্রগতি, নারী শিক্ষার প্রসার, নিরাপদ মাতৃত্ব গ্রহণ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক সন্তান জন্মদান, সন্তান প্রসব পরবর্তী সেবাপ্রদান, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, ডায়রিয়াজনিত রোগনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, পুষ্টি কর্মসূচি শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া কৃমিনাশক, ভিটামিন 'এ' কর্মসূচি শিশুদের অবস্থার উন্নতি করেছে।

দেশের সংবিধানে, বিভিন্ন সময়ে নেয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যনীতি এবং সর্বশেষ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচিতে এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়। গত ৫০ বছরে ধারাবাহিককভাবে এসব কাজ হয়ে এসেছে। তার ধারাবাহিকতায় এখনো প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একদল দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে মা ও নবজাতকের সব সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি ঘটেছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন বার্ষিক গ্লোবাল চাইল্ডহুড রিপোর্ট ২০১৯ শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালে গত দুই দশকে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। চারটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছে, যেখানে ভুটানের শিশু মৃত্যুহার কমেছে ৬০ শতাংশ, নেপালে ৫৯ শতাংশ এবং ভারতের ৫৭ শতাংশ। আর বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়েছে ৬৩ শতাংশ। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ২৪ বছরে দেশে শিশু মৃত্যুহার ৭৩ শতাংশ কমেছে। এসডিজি অনুযায়ী, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য থেকে

এক মাস বয়সি শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১২ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা ২৮ জন। তবে, শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩৮ জন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, সরকার মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধে সকল সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করেছে। আর এই কারণেই দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু উভয়ই কমেছে। তিনি বলেন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমাদের ২০৩০ সালের মধ্যে প্রিম্যাচুউরড এ শিশুমৃত্যুহারের লক্ষ্যমাত্রা ১২ দেওয়া আছে। স্বাস্থ্যসেবাখাতের সবাই সঠিকভাবে সঠিক কাজটি করলে এই অপরিণত শিশুমৃত্যুহারের লক্ষ্যমাত্রা আগামী দুই বছরেই অর্জন করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে দেশের সব সরকারি হাসপাতালেই গর্ভবতী মায়েদের জন্য ২৪ ঘণ্টা ডেলিভারি সুবিধাও রাখা হবে।

এর সবই বর্তমান সরকারের সাফল্যের গল্প। এতে অবদান রয়েছে গণমানুষের সহযোগী মনোভাবেরও। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক দূর।

লেখক : ফ্রিল্যান্সার

উদ্বোধনের অপেক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

উদ্বোধনের অপেক্ষায় দৃষ্টিনন্দন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশান

উদ্বোধনের অপেক্ষায় মিরপুর বনানী ফ্লাইওভার

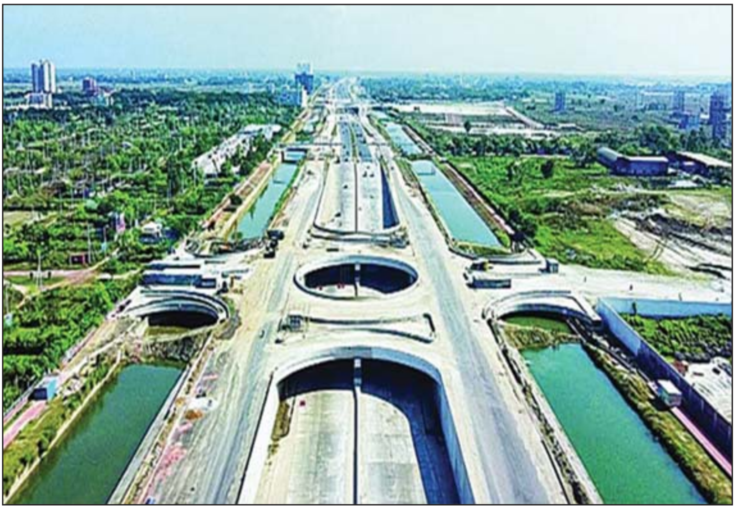

উদ্বোধনের অপেক্ষায় পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে

উদ্বোধনের অপেক্ষায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল

উদ্বোধনের অপেক্ষায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

উদ্বোধনের অপেক্ষায় রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

উদ্বোধনের অপেক্ষায় কক্সবাজার বিমান বন্দরের নবনির্মিত রানওয়ে

উদ্বোধনের অপেক্ষায় পদ্মাসেতুর রেল সংযোগ প্রকল্প

এ্যালেঙ্গা-রংপুর ১৯০ কি.মি. চার লেন প্রকল্প

মেট্রোরেলের যাত্রা শুরুর সংকেত দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ছুটে চলছে স্বপ্নের মেট্রোরেল

পায়রা সেতু

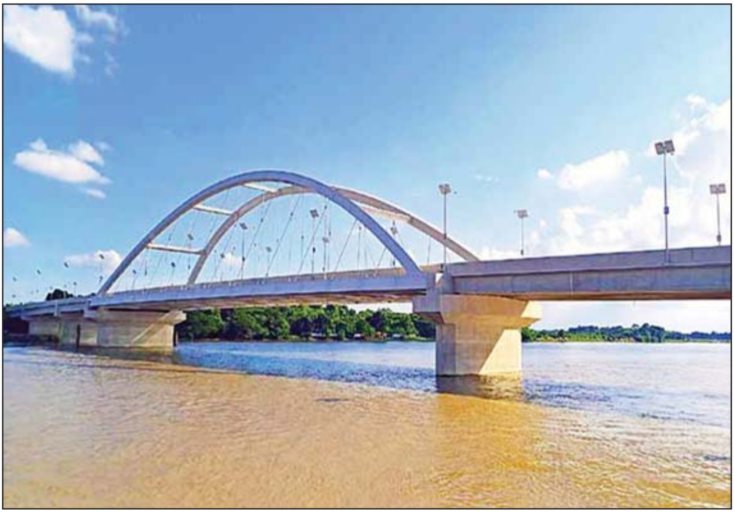

মধুমতী সেতু

নান্দনিক মহালছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়ক

ভারতীয় গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদের চট্টগ্রামের উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন